উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(Political Science)

সুব্রত গুপ্ত এম.এ. পি.-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা,

নিউ বুক এজেন্সী
১৮/বি.শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক :
শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস
১৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩নং মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক সংসদ কর্তৃক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পাঠ্যসূচী প্রণীত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া এই বইটি লিখিত হইয়াছে। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুইটি পত্র একই বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে ভারতের শাসনব্যবস্থার কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বইটি লেখার সময় ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলটি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় নাই। সেজন্য বইটির পরিশিষ্টে শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার নির্দেশ পাঠ্যসূচী নাই। এজন্য বইটির শেষে একটি পরিশিষ্টে রাজ্যপাল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা সংযোজন করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় ভারতের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই বইটি প্রণয়নকালে যে-সব প্রামাণ্য বই হইতে আমি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সেগুলি সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বইয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমার এই প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হইয়াছে তাহা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ. বিবেচনা করিবেন। এই বইটি প্রকাশনার কাজে নিউ বুক এজেন্সীর স্বত্তাধিকারী শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তৎপরতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

যদি এই বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

বিনীত
সুব্রত গুপ্ত

SYLLABUS IN POLITICAL SCIENCE

Full Marks—200

PAPER I (Full Marks—100)

1. What is Political Science ? Definition, Nature and Scope —Relation with other Social Sciences : History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.

2. The State—Definition of the State ; Characteristics of the State ; Theories of State Origin :

   (a) Divine Origin Theory.

   (b) Force Theory.

   (c) Social Contract Theory.

   (d) Evolutionary Theory.

   Sovereignty ; its characteristics.

3. Nationality, Nation and Nationalism ; Right of self-determination, Nationalism and Internationalism.

4. The United Nations—Objectives, structure and functions.

5. Law ; Definition of Law ; Sources of Law—Concept of Liberty ; Safeguards of Liberty—Law and Liberty.

6. Citizenship—Definition of a citizen—Acquisition and loss of citizenship ; Rights and Duties of a citizen—Civil and Political Rights , Fundamental Rights of an Indian Citizen—Economic and Social Rights ; Directive principles in the Indian Constitution.

PAPER II (Full Marks—100)

7. Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution ; Salient features of the Indian Constitution.

8. Forms of Government—Unitary and Federal : Nature of the Indian Federation—Presidential and Parliamentary ; Nature

of the Indian Government; Presidential or Parliamentary ?—Monarchy—Republic—India as a Republic.

9. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Conditions for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.

10. Organs of Government; Functions of the different Organs of Government—Theory of Separation of powers—Executive—Single—Plural—Union and State Executives in India—President of India; Powers and Position—Prime Minister; Powers and Position of the Prime Minister—Legislature; Unicameral and Bicameral—Union Legislature of India; Its composition and functions—West Bengal State Legislature, Its composition and functions—Processes of Law Making—Judiciary; Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary—Bureaucracy, Its importance and Functions.

11. Public Opinion; Its importance in a Democracy—Different Organs of Public Opinion—Party System—Functions of Political parties;—Merits and Demerits—One party, Bi-party and Multi-party System—Importance of the party system in Democracy.

12. Adult Franchise; Arguments for and against.

বিষয় সূচী

প্রথম খণ্ড ঃ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক
(Nature and Scope of Political Science,—Relation between Political Science and other Social Sciences)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Nature and Scope of Political Science) **:** রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) একটি শাখা। সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে রাজনৈতিক জীবন তাহা আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

সাম্প্রতিক ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র ছাড়াও যে সকল বিষয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১] রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত যোগাযোগ আছে মানব জীবনের এই জাতীয় কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করা চলে না। শুধু রাষ্ট্রই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইবে তাহা নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের সম্পর্ক, সবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান কালের কোন রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করিতে হইলে অথবা রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অতীত যুগের এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থারও আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা হইতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই নীতি-বহির্ভূত হইতে পারে না। দেশের পরিবর্তনশীল জনমত এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া রাষ্ট্রতত্ত্বগুলিকেও পুনর্মার্জিত করিতে হয়। সেই জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বিবর্তনশীল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কখনই স্থির থাকে না বলিয়া সমকালীন ধারা ও নীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে।

১। "Political Science concerns itself with the life of men in relation to organised States, we cannot omit from the field of relevant interest whatever may affect that life." —H. J. Laski. On Study of Politics

সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়া যে বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাহাকেই আমরা বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি, এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক্‌ অনুশীলন করে। ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্র কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতি এবং অনুসৃত কর্মসূচী, অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা ও তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। অতীতকে বাদ দিয়া বর্তমান সম্পর্কে তো কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়-ই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।[২] সেইজন্য ইতিহাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা দরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করিবার সময় আমাদের তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যথা—(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমান অবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি—অতীত ও বর্তমানের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কতিপয় আদর্শ এবং নীতির সহিত যুক্ত থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতি আলোচিত হয়। কোন অবলম্বিত নীতি ভাল অথবা মন্দ কিনা, কিংবা কিভাবে কোনও অনুসৃত নীতি আরও ভাল করা যাইতে পারে, কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক নীতি অথবা সিদ্ধান্ত আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে, ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনও ইহাদের কর্মসূচী মানুষকে কতটা সুখী করিতে পারিয়াছে তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মানবজাতির ভবিষ্যৎ বহুলাংশে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী ও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন আলোচনায় সেইগুলি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষ ব্যাপক হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারে।

২। **"One cannot properly grasp the meaning of the present—still less can one chart a course of action for the future—without dealing with the past" : Lipson The Great Issues of Politics.**

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি (Politics) শব্দটির উৎপত্তি গ্রীস দেশে। গ্রীক্ শব্দ "Polis" হইতে এরিস্টটল "Politics" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "Polis" শব্দটির অর্থ শহর। তখন প্রতিটি শহর একটি রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি রাষ্ট্রশাসনের রীতিনীতি। রাষ্ট্রনীতি আবার তত্ত্বগত (theoretical) অথবা ব্যবহারিক (Practical) হইতে পারে। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, মূলভিত্তি, প্রকৃত ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রের কাজ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা ছাড়াও কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানরূপে অভিহিত করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের শাসননীতি সম্পর্কিত আলোচনাও করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। রাষ্ট্রদর্শন এবং তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আবার, যেসব নীতি এই ভিত্তির মূলে থাকে সেইগুলির গবেষণা রাষ্ট্রদর্শনের অঙ্গীভূত। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি, ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন—সব কিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শনও (Political Philosophy) এক জিনিস নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিক হইতে রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা ব্যাপক। রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক আছে এই প্রকার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু রাষ্ট্রদর্শন বলিতে আমরা নিছক রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা বুঝিয়া থাকি। রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শও (Political ideologies) রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (Political ideal) এবং রাষ্ট্রতত্ত্বও (Political theories) এক জিনিস নয়।

রাষ্ট্রদর্শনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য

রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ; সেই ধারণাগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে। রাষ্ট্রদর্শনে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির দার্শনিক তাৎপর্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

ফরাসী চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত না করিয় অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি (Political Sciences) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় অনেকগুলি শাস্ত্র আছে ;—যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন (International Law) এবং শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (Constitutiona History) ইত্যাদি। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকগুলি শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? (Is Political Science a Science ?

যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ কতিপয় নীতি নির্ধারণে চেষ্টা করে সেইজন্য অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আমরা প্রকৃতই 'বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি কিনা এ বিষয়ে পূর্বে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এরিস্টটল রাষ্ট্রনীতিকে এক বিজ্ঞান মনে করিতেন। হব্‌স্ (Hobbes) এই মত পোষণ করিতেন যে রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রকৃতই বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু, কোন কোন লেখ "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" শব্দটি গ্রহণ করিতে এবং রাষ্ট্রসম্পর্কিত আলোচনাকে "বিজ্ঞানের" পর্যায় ভুক্ত করিতে চাহেন না। এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।[৩]

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি, কার্যক্র এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই একমত পোষণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতি এবং প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি যে সকল উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলির মধ্যে ধারাবাহিক তার অভাব আছে।

৩। কোমতে (Comte) নিম্নলিখিত তিনটি কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করেন ন

'...(1) there is no consensus of opinion among experts as to its metho principles and conclusions ; (2) it lacks continuity of development ; and (3) lacks the element which constitutes a basis of provision."-Quoted from Garner's boo "Political Science and Government." P. 10.

জি. মস্‌কা (G. Mosca) বলেন, **"A Science is the product of a system of observati made on a given order of phenomena, with special care, appropriate methods, a so co-ordinated as to raise them to the level of an indisputable truth n apprehensible by ordinary, superficial observation. We do not think th Political Science in its present condition has as yet genuinely entered upon t scientific stage. —Quoted from Garner's book, P.**

বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমেই আমরা সুশৃংখলভাবে বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করি। ঠিকভাবে যখন উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন আরম্ভ হয় সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। ইহার সাহায্যে আমাদের সুসম্বদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম অনুমান করিতে পারি। এই অর্জিত জ্ঞানকেই বলা হয় বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব উপকরণ তাঁহারা ঠিকভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনের নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু উপাদান হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহাকে বলবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার ন্যায় বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা চলে না।[৪] অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট (Professor Gilchrist) বলেন, যদিও পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার গবেষণা-পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায় না, তবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব একটি গবেষণা-পদ্ধতি আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের অধীনে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনশীল হইবেই। মানুষের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং সমাজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। উপকরণ যদি পরিবর্তনশীল হয় তবে সেই উপকরণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, তাহা পরিবর্তনশীল হইবেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে একটি বিজ্ঞান বলিয়া হয়ত অভিহিত করা যায় না। কিন্তু এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান (social science)। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল সামাজিক

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

৪। "However widely and carefully the materials may be gathered, their character makes it impossible that Political Science should ever become science in the sense of Mechanics or Chemistry or Botany in Sciences"—Bryce. Modern Democracies —Vol. I. P. 16.

বিজ্ঞান। বার্নার্ড শ-এর (Bernard Shaw) ভাষায় ইহা হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান যাহা দ্বারা শুধু সভ্যতাকে রক্ষা করা যাইতে পারে। (" the science by which alone civilization can be saved.")

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Political Science and other Social Sciences) :

● **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক** (Relation between Political Science and History) : ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। স্যর জন সিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞান হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি।[৫]

মানবসমাজের বিভিন্ন দিকের আলোচনা এবং ইহার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের কাহিনী ইতিহাসে আলোচিত হয়। রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে কালের স্বাক্ষর থাকে এবং তাহা আমরা ইতিহাস পাঠ হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা অপরিণত রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় তাহা হইতেই আমরা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি জানিতে পারি। শুধু, রাজনীতির ইতিহাসই নহে,— রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত জীবন তাহাও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি।

লিপসন (Lipson) মন্তব্য করিয়াছেন, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তনের সময়ানুক্রমিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।[৬]

আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার অবদান মোটেই সামান্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিবার সময় আমরা ইতিহাস হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি এবং সেইগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকর করিবার চেষ্টা করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় আমরা ইতিহাসের উপর নির্ভর করি। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের পরিণতি, কেন না ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

৫। "History without Political Science has no fruit while Political Science without History has no root."

৬। "With its chronological treatment, history offers to the student of Politics a sense of growth and development and thus affords insight into the processes of social change." Lipson.

হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং নীতি সম্পর্কিত অনুশীলন করি।

আবার ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে। ধর্মের ইতিহাস অথবা চারুকলার ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নাই। সেই প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় অথবা রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের সম্পর্ক হইতে মুক্ত।[৭] যেমন, ধরা যাক, হব্‌স্ সামাজিক চুক্তি (social contract) সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে একটির আলোচনা অপরটির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত।

৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political Science and Ethics): প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেন। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে রাজার সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি রাজার কর্তব্য অথবা রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য কতিপয় নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইটালীর প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক আদর্শের উপর স্থাপন না করিয়া সুবিধাবাদ আদর্শের উপর স্থাপন করেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা এবং সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করাই শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের বহির্জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে, তবে অনেক সময় ইহা নৈতিক নিয়মের অনুরূপ

৭। বার্কারের মতে, **'We must admit the possibility of a great and influential theory of Politics which has no definite basis in history."**

হইতে পারে। তাহা দেখা যাইবে শুধু মানুষের বাহ্যিক জীবন সম্পর্কিত নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে। মানুষকে হত্যা করা নীতিশাস্ত্রের মতে ঘোরতর অপরাধ,—আবার রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ীও ইহা মারাত্মক অপরাধ। আবার আমাদের দেশে কোন গাড়ী রাস্তার বাঁদিকে না যাইয়া ডান দিক দিয়া যাইলে ইহা বে-আইনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নীতিশাস্ত্র মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হয় না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্জীবনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।[৮] রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রীয় আইনের এবং ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

কিন্তু, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে। বিশেষতঃ উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অল্প, কারণ, উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। রাষ্ট্রের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশাস্ত্রের সংস্রব হইতে বিবর্জিত হইলে চলে না। আইভর ব্রাউনের[৯] মতে (Ivor Brown) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; মানুষ কোনো অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে একা বা নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। নৈতিক মূল্য এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া উঠে তাহা মানব সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। নীতিশাস্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political Science and Economics): প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের যুগ পর্যন্ত একটি ধারণা ছিল যে, অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি

৮। ম্যাক আইভারের মতে (Mac Iver)...'Law does not and cannot cover all the ground of morality. To turn all moral obligations into legal obligations would be to destroy morality.' Mac Iver, The Modern State.

৯। "Ethical Theory is incomplete without Political theory because man is an associated creature and cannot live fully in isolation; Political theory is idle without ethical theory because its study and its result depend fundamentally on our scheme of moral values, our conceptions of right and wrong."

—Ivor Brown. The Meaning of Democracy.

শাখা,—অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্র যখন মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের আইন শুধু ধনী শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং চাহিদাকেই বাস্তবে রূপায়িত করে।[১০] অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্রীয় নীতির মূল ভিত্ত হইতেছে অর্থনৈতিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানকালে অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা এবং পরিধি অনেক ব্যাপক হইতেছে। সামাজিক জীবনের মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদা থাকে। সেই অভাব দূরীকরণের জন্য উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (economic activity) বলা হয়। এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টনের উপর। সুতরাং ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পর্কিত মানুষের বিভিন্ন কাজ অনুশীলন করাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক জটিলতা বৃদ্ধির দরুণ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পৃথকীকরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রকে বর্তমানে আমরা একটি পৃথক শাস্ত্ররূপে মনে করি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করা। দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান বাড়াইয়া দেওয়া আধুনিককালের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের শান্তি ও শৃংখলা এবং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব খুবই বেশী। বর্তমানে বিশ্বে দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনীতি,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ

১০। "The State, as a legal order, is a mask behind which some dominant economic interest secures the benefit of political authority." Laski—Introduction to Politics.

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, দুইটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ Laissez Faire নীতিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে (Individualism) বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কোন দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান সেই দেশের সরকারের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগে "কল্যাণ-রাষ্ট্র" (Welfare State) বলিতে আমরা বুঝি, রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণের সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ , 'কল্যাণ রাষ্ট্র' অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণ জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত জয় করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জন্য সর্বাধিক অর্থ নৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অথ নৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বর্তমানে আমরা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা দেখিতে পাই,—ইহার অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থ নৈতিক উন্নতি অর্জন করা। সুতরাং রাষ্ট্র এবং মানুষের সম্পর্কের দিক হইতে চিন্তা করিয়াও বলা যাইতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political Science and Sociology) : সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি মৌলিক বিজ্ঞান। মানুষের সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ করা,– শুধু তাহাই নহে, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবজাতির জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। ইহার পরিধি সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ ব্যাপক নহে। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের শুধু একটি দিক আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার, মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান আমরা পাই সমাজবিজ্ঞান হইতে। রাজনৈতিক চেতনার পূর্বেই মানুষের সামাজিক চেতনার

সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়,—ইহা সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের একাংশের মধ্যে মনোবিজ্ঞান প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। ফ্রান্সের টারডে (Tarde) এবং লে বঁ (Le Bon), ইংলণ্ডের ম্যাগডুগাল (Mc Dougall), গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas) ও স্পেন্সার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ প্রয়োগ করা হয়। জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও বিশ্বাস যদি রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিতে প্রতিফলিত না হয় তবে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের উপর আস্থা হারাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ, দলীয় কর্মসূচী গঠন, জনমত সংগঠন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেনাবাহিনী নিয়োগ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, বিচারালয়ের ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অনেক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানেও মনোবিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ করা হয়। মানুষের মনস্তত্ত্ব (Human Psychology) সমাজের মনস্তত্ত্ব (Social Psychology) গঠনে সহায়ক, কিন্তু ইহাও ঠিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত ইহার ভিত্তিতেই বার্কার বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল রহিয়াছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে।[১১]

Exercise

1. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ ও পরিধি আলোচনা কর।
   [Discuss the nature and scope of Political Science.]

2. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান ?
   [Is Political Science, really speaking, a science ?]

3. "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাসের কোন পরিণতি নাই, আবার ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন মূল্য নাই"—উক্তিটি আলোচনা কর।
   ["History without Political Science has no fruit while Political Science without History has no root"—Discuss the statement.]

১১। "Political Science has its roots in Psychology."—Barker

4. (ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র, (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান, (গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্র এবং (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

[Discuss the relation between (a) Political Science and Ethics, (b) Political Science and Sociology, (c) Political Science and Economics and (d) Political Science and Psychology].

5. "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

[Define 'Political Science' and discuss the nature of its relation to History and Sociology].

6. "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।"

[Define 'Political Science' and point out its relation to History and Economics].

দ্বিতীয় অধ্যায় | রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (The State, and the Characteristics of the State)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের সহিত জড়িত। গ্রীক এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুঝাইতে যথাক্রমে "পোলিস্" এবং "সিভিটাস্" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'রাষ্ট্র' কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক 'রাষ্ট্র' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটলের মতে (যখন স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অনেক পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হইয়া একটি শাসনব্যবস্থার আওতায় আসে, তখনই ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।)

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন; নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হইল। (হল্যাণ্ডের (Holland) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে দলের ইচ্ছার উপরে স্থান দিতে পারিবে।)

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা

(উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে।[১])

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্তু উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ক্রটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডক্টর গার্ণার (Dr. Garner) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র হইতেছে অল্পসংখ্যক অথবা বহুসংখ্যক জনসমষ্টি, যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকারের নির্দেশ ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।[২]

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা

১। 'The state is a people, organised for law within a definite territory." —Wilson.

২। "The State as a concept of Political Science and Constitutional Law. is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience"—Garner.

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State) : অধ্যাপক গার্ণারের সংজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নোক্ত উপাদানগুলি আলোচনা করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধানতঃ চারিটি উপাদান ; যথা—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসন-প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা। বাস্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন-প্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমত্ব।

(১) **জনসমাজ** (Population) : জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, যেমন পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক (অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই) বিদেশী ও প্রজা। জনসমাজ রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু, একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এরিস্টটলের মতে একটি শহর-রাষ্ট্রে (City-state) যতজন লোক থাকা উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। রুশোর (Rousseau) মতে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা দশ হাজারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমানে জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। আমরা চীন, রাশিয়া এবং ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি অল্প-সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে উক্ত জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে।

(২) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Definite Territory) : স্যার জন সিলির (Sir John Seely) মতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তাঁহার মতে সরকারই হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ এবং ইহার মাধ্যমে একটি যাযাবর জাতিও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।[৩] কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহা সঠিকভাবে স্থির করা যায় না। রাষ্ট্রের আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

৩। **Seely—Introduction to Political Science, Pages 31—37.**

তবে সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে বার মাইল পর্যন্ত এবং উর্ধ্বেও কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্র-দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ অর্থ।

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকা এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। তাহা না হইলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভারসাম্যের অভাব হইতে নানাবিধ দুর্গতি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।)

(৩) **সরকার** (Government[৪]) : শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ একটি ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের একটি সুসংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই,—এই সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।) জনসমষ্টিরই কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, দেশে যাহাতে শান্তি ও শৃংখলা অব্যাহত থাকে সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারের। সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে—আইনসভা (legislature), শাসন বিভাগ (executive) এবং বিচার বিভাগ (judiciary) ; সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্তু সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং গঠন হইতে পারে না।

(৪) **সার্বভৌমত্ব** (Sovereignty) : রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র জনসমষ্টির নিকট হইতে একক এবং পূর্ণ আনুগত্য লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে না। যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথবা যে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্য করিতে পারে না ; ইহাকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব (internal sovereignty) বলা হয়।) আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি

৪। 'Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted.'—Garner. Political Science and Government, P. 93.

সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক প্রকাশ (external sovereignty)। **অধ্যাপক গার্ণারের** মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে **মুক্ত না হইলেও প্রায় মুক্ত হইলেই** (independent or nearly so, of external control) কোন দেশ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইবে।

রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমানাধিকার

রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেইগুলি হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (permanence and continuity) এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের **সমান মর্যাদা** (equality of status)।

বর্তমানকালের রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (international recognition)। বর্তমান পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রই পরস্পরের উপর **নির্ভরশীল**। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য যে কোন রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের সমুদয় সদস্য-রাষ্ট্রই সার্বভৌম। এইজন্য যে কোন নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্রই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়া বর্তমানকালে যে কোন রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন। তবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চীন সাধারণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে স্বীকৃত না হইবার পূর্বেও অনেক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সংজ্ঞাটির সহিত যদি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শর্তহিসাবে বিবেচিত হয় তবেই আমরা রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি ধারণা করিতে পারি।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কোন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রে পরিণত হইবার শর্ত (Condition for a territory to become a State) : আমাদের দেশের রাজ্যগুলিকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহাদের সকলের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও সার্বভৌমত্ব নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজ সহ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য (component State) হিসাবে এইগুলিকে ভদ্রতাসূচকভাবে রাজ্য (State) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন আমাদের দেশে বহু দেশীয় রাজ্য ছিল তখনও ইহাদিগকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ, তখনও ইহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না।

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গ-রাজ্য (component State) এবং ইহাকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা নাই।

যদিও সেখানে আমরা নির্দিষ্ট ভূভাগ, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বলা যায় না।

বর্তমানকালে, বিশেষতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (League of Nations) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জাতিসংঘ অথবা রাষ্ট্রসংঘ একটি রাষ্ট্র নহে। কারণ, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকেরই যে কোন সময়ে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নাই। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের জন্য নির্দিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের আইনগত কোন ক্ষমতা নাই। সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আনুগত্য জানাইবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) : তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও অধ্যাপক লাস্কি, জি. ডি. এইচ্. কোল প্রমুখ লেখকগণ বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং সরকারকে একই পর্যায়ে চিন্তা করিয়াছেন।[৫] কার্যক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেকেই রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য স্বীকার করিতে চাহেন না। তবুও তত্ত্বের দিকে হইতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :

(১) সরকার হইতেছে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। সুতরাং সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। অর্থাৎ, আইনসভার সদস্য, শাসন বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন বিচারক ও অন্যান্য কর্মীদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয়।

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল সরকার

৫। লাস্কি বলেন, "The state is, for the purpose of practical administration, the government". Laski—Grammar of Politics. P. 131.

জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole) বলেন, "A state is nothing more or less than the political machinery of government in a community."

G. D. H. Cole—Self-Government in Industries. P. 119.

গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠিত হয়। আবার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে যদি কখনও আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়।

(৩) রাষ্ট্র বলিতে প্রথমেই আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করি। কিন্তু সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের কর্মীদের একটি সমষ্টি বুঝায়।

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। সরকারের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম এবং সরকার শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে।

(৫) সব রাষ্ট্রেরই আমরা প্রধানতঃ চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, যথা,—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূভাগ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। কিন্তু, বিভিন্ন দেশে সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে; কোন দেশে হয়তো সরকার রাষ্ট্রপতি-চালিত, আবার কোন দেশে হয়তো দায়িত্বশীল সরকার। আবার, সরকার গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক হইতে পারে।

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট্র, সরকার নহে। সরকারের দায়িত্ব সেই অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকগণের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে,—কিন্তু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

(৭) রাষ্ট্র রূপহীন একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (The State and other Associations): একটি সংঘ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কতিপয় সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকদ্বয় ম্যাক আইভার এবং পেইজ (Mac Iver and Page) সংঘের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "a group organised for the pursuit of an interest or a group of interests in common."

রাষ্ট্রের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমরা অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই না। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্যান্য সংঘের নির্দিষ্ট ভূভাগের দরকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং সেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের বহির্জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘগুলি দুই একটি উদ্দেশ্য অথবা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে এবং তাহাতে মানুষের বহির্জীবনের সামগ্রিক উন্নতি হয় না। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পঞ্চমতঃ, মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা কোন সংঘেরই সভ্য না হইতে পারে। কিন্তু, তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে এবং সে একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না।

রাষ্ট্র নিজের কাজ সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। একটি সংঘের সহিত অপর কোন সংঘের কি সম্পর্ক হইবে, অথবা একটি সংঘের সহিত ইহার সদস্যদের কী সম্পর্ক হইবে, তাহাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।[৬]

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)ঃ রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে আমরা যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও তাহার একটি সাদৃশ্য আছে।[৭] রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই। কিন্তু, সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যক নহে। আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌমত্ব। সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইন প্রয়োগ করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখে। কিন্তু সমাজ

৬। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক বার্কারের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—'The state as a general and embracing scheme of life must necessarily adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own members."

Barker—Political Thought in England, P. 156.

৭। রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বার্কার বলিয়াছেন, "Society is indeed a contract...but the state ought not to be considered nothing better than a partnership agreement in a trade."

Barker—Reflections on the Revolution in France, Pages 105-106.

জীবনের কতিপয় উদ্দেশ্যকে (Purposes of life) কেন্দ্র করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। স্যাবাইনের (Sabine) মতে আইনগত, নৈতিক কিংবা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে বিবেচনা করিলেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র হইতেছে সমাজের একটি বিশেষ দিক, ইহার উপবিভাগ নহে। সর্বশেষে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষাও ব্যাপক। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, সমাজের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাংগীণ উন্নতি সাধন করা।

সমাজের মধ্যে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেইগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের দিক হইতেও ইহা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

Exercise

1. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান কর। (ক) রাষ্ট্র ও সরকার, (খ) রাষ্ট্র ও সমাজ এবং (গ) রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[Define the State. Distinguish between (a) the State and Government, (b) the State and Society and (c) the State and other Associations.]

2. "রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে।"—উক্তিটি আলোচনা কর।

["The State is a People organised for law within a definite territory." Discuss the statement.]

3. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

[What are the characteristics of the State ?]

4. নিম্নলিখিত কি রাষ্ট্র ? (ক) পশ্চিমবঙ্গ, (খ) নিউ ইয়র্ক, (গ) নেপাল, (ঘ) রাষ্ট্রসংঘ। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Are the following States ? (a) West Bengal, (b) New York, (c) Nepal, (d) U.N.O. Give reasons for your answer].

তৃতীয় অধ্যায় | রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব (Theory of State Origin)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্পষ্ট মতবাদগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; কতিপয় মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টি (origin) লইয়া আলোচনা করে এবং কতিপয় মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি (nature) লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু এমন কতিপয় তত্ত্ব আছে যেগুলি মূলতঃ রাষ্ট্রের সৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করে, যেমন ঐশ্বরিক মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ। তবুও এই মতবাদগুলি প্রধানতঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করে।

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State): রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের মতই প্রাচীন। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। প্রাচীনকালে ভারত, চীন, এবং মিশরে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতে অনেক গোঁড়া খৃষ্টান পোপকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে থাকায় এই মতবাদের বহুল প্রচার হয়। বাইবেলে বলা হইয়াছিল যে ঈশ্বরই সকল শক্তির একমাত্র উৎস। রাজার ক্ষমতারও উৎস হইতেছেন ঈশ্বর। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেন্টের যে বিবাদ হয় তাহার কারণ ছিল এই মতবাদ। স্টুয়ার্ট রাজারা মনে করিতেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা কোন পার্থিব শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন এবং প্রজাদেরও বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং শক্তিশালী করিবার জন্যই স্টুয়ার্ট রাজারা এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি সর্বেসর্বা

রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কিত ঐশ্বরিক মতবাদটি নিম্নলিখিত চারটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত :—(১) একমাত্র রাজতন্ত্রই হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি। কারণ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্য করেন। (২) রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন। (৩) রাজা তাহার কাজের জন্য জনসাধারণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি তাঁহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই মতবাদ

(৪) প্রজাদের উচিত বিনা বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

এই মতবাদটির প্রভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখা যায়। এমনকি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ,অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন।

সমালোচনা: রাষ্ট্রের সৃষ্টি-সম্পর্কিত ঐশ্বরিক মতবাদ অনেক সমলোচনার সম্মুখীন হইয়াছে।

মানুষের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি

প্রথমতঃ, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইতেছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই মতবাদ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে। ভগবান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না।

প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র এখন অল্প

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র অল্প দেখিতে পাই। কিন্তু কোন রাজাই বর্তমানে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন না। অবশ্য দালাই লামা বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসাবে পূজিত হন। এখনও অনেক দেশে নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রভৃতি যেখানে গৃহীত হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক সৃষ্টির মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃত সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় রূপ দেখিতে পাই এবং সেইগুলির উৎপত্তি বিচার উপরের মতবাদে সম্ভবপর নয়।

এই মতবাদ মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক

তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাজা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। বিশেষতঃ, যে রাজা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাঁহার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তিনি প্রজাদের পূর্ণ আনুগত্য পাইবার একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি প্রকৃতই রাজা নিজেকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা এবং নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রজাদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। কিন্তু উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী

শাসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। বরং অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অত্যাচারী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারের সমর্থক। এই মতবাদে রাজা যাহা খুসী তাহাই করিতে পারেন। স্বাধীনতাকামী মানুষ এই যুক্তি কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহা স্বৈরাচারিতার সমর্থক

চতুর্থতঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিক। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে মন চায় না। ঈশ্বর কখনও মানুষকে শাসন করিবার জন্য এক অত্যাচারী প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, এই ধারণা অযৌক্তিক। ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের কল্পনা করি; কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে টানিয়া আনা বিজ্ঞানসম্মত নহে। রুশো তাঁহার "Social Contract" বইয়ে বলিয়াছেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের কথা"। ("Voice of the people is the voice of God")। কিন্তু রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদে বলা হইয়াছিল, জনসাধারণের কথা ঈশ্বরের কথা নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথা—সভ্যযুগে এই মতবাদ একেবারে অচল।

ইহা অযৌক্তিক

তবে এই মতবাদটির একটি দিক আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মোটেই সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের একটি অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে জনসমাজকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেই জন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার ব্যাপারে তাঁহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, তবে শাসনব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়। এই মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য হইতেছে এই যে প্রাচীনকালের মানুষের নিকট মানুষের প্রণীত আইন অপেক্ষা ধর্মীয় বিধানের গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। এই মতবাদ রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষা দিয়াছিল। কেননা, রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এই ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মনে রাষ্ট্র সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই মতবাদের নৈতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত

দুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। ক্ষমতা প্রয়োগের বাসনা মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। এই মতবাদ শুধু বলবানের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টিই ব্যাখ্যা করে না, ইহা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতিও কিছু পরিমাণে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কিত বলপ্রয়োগ মতবাদের দুইটি তাৎপর্য বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়, তাহা হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কোন্ জিনিস ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহার নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা উপজাতি যথাক্রমে দুর্বল লোক অথবা দুর্বল গোষ্ঠী বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন মানবসমাজে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভেদ দেখিয়াছি। গোষ্ঠী, উপজাতি এবং জাতির মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির পরিণতিই হইল দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য। এইরূপে কোন দলপতি যখন তাঁহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টির অন্যতম উপাদান।

বলপ্রয়োগ হইতেছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি

বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the theory of Force): বলপ্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে জনগণের সাধারণ ইচ্ছাকে (General will) উপেক্ষা করে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের যে ভূমিকা নাই তাহা নহে, অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্যও বলপ্রয়োগ যে কম গুরুত্বপূর্ণ তাহাও নহে। কিন্তু এইজন্য সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয়। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথবা সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক সদাসতর্ক এবং সচেতন জনমতেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণ ইচ্ছা। সুসংগঠিত এবং সচেতন জনমত অপেক্ষা বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ বলপ্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরাক্রান্ত রাজারাও সাম্রাজ্যের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ মতবাদ গ্রহণ করিতেন। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় নহে; রাষ্ট্র মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের আইন তাহার স্বাধীনতা

রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা।

রক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যন্তই সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। রুশো বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুবল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসকের প্রতি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন। শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিন্ন যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে যেমন বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী, অপরদিকে তেমনি ইহা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিবর্তন উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ, সামরিক শক্তির সমাপ্তি একদিন হইবেই ; তখন এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু "জোর যার মুল্লুক তার" এই মতবাদে কোন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না।

বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্রবিরোধী ; ইহা রাষ্ট্রের বিবর্তনকে উপেক্ষা করে

এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই

তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এইজন্য পশুবলই রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণ নহে। গ্রীণ তাঁহার "Principles of Political Obligations" বইয়ে লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়"। ("Will and not Force, is the basis of the State") রাষ্ট্রের ক্ষমতা শর্তাধীনে প্রদত্ত,—ইহা সর্বদাই অছি স্বরূপ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। জনসাধারণের শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইলেও, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। জনগণ যে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহার কারণ সর্বদাই বলপ্রয়োগ নহে। জনগণ

রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বদাই অছি স্বরূপ

কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে না।

বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে সর্বদাই থাকে। কিন্তু জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করাই প্রকৃত সমস্যা। রাষ্ট্রকে যখন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তখন গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হয় জনগণকে একটি বিশেষ আইন গ্রহণ করার জন্য সাফল্যজনকভাবে প্রণোদিত করা।

জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলপ্রয়োগ নহে

বর্তমানকালে প্রণোদনই (persuasion) জনগণের আনুগত্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত রাখিতে পারে, বলপ্রয়োগ নহে।[1] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রভাবে বিশ্বজনমত বর্তমানে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের উপর বলপ্রয়োগের বিপক্ষে খুবই সচেতন। যদি কোন রাষ্ট্র অনর্থক বলপ্রয়োগ করে তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল, হিটলার ও মুসোলিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা। পৃথিবীতে যেখানেই অবাঞ্ছিত বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অনিবার্য হইয়াছে। অতীতে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বলপ্রয়োগের মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির প্রতিবন্ধক

গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ইংলণ্ডের "গৌরবময় বিপ্লব", ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছে যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory): রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, সেইগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তবুও ইহা সর্বাংশে গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর নয়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখায় এবং ভারতীয়

১। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় **"The State always acts in an atmosphere of contingency, successful to coerce, it must know how to persuade successfully."**

Laski—An introduction to Politics. Ch. 2

দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টি-সম্পর্কিত মতবাদগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন-হব্‌স্ (Hobbes), লক্ (Locke) এবং রুশো (Rousseau)। তাঁহারা এই বিষয়ে এক মত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) ছিল এবং সেখানে কোন সুসংগঠিত সমাজ ছিল না। তবে, প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। এই তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি চুক্তি সম্পন্ন করে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ করে। এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের সহিত জনগণের মধ্যে। তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা হব্‌স, লক্ এবং রুশোর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই।

হব্‌স্-এর (১৫৮৮-১৬৭৯) অভিমত (Views of Hobbes): "লেভিয়াথান" নামক পুস্তকে হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌স্-এর মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল দুর্বিষহ। মানুষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির পরিবেশে খুবই "দীন, নিঃসঙ্গ, কদর্য, পশুসুলভ এবং স্বল্পায়ু" ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী একজনকে শাসক নির্বাচিত করে। হব্‌সের মত অনুযায়ী শাসক এই চুক্তির একটি পক্ষ নহে। তিনি সর্বদাই চুক্তির উর্ধ্বে। শাসকের হস্তে জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা বিনা শর্তে অর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন; কিন্তু নিজের কাজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি দায়ী থাকিতেন না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিত না। হব্‌স্-এর মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না; তিনি রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই "লেভিয়াথান" (Leviathan) পুস্তকে গণশক্তিকে অস্বীকার করেন। লেভিয়াথান নামক সুবৃহৎ সামুদ্রিক জীবের ক্ষমতা যেমন অবাধ, এবং অপরিমেয়, তেমনি "লেভিয়াথান" পুস্তকে হব্‌স্ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে

হব্‌স্ গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে চাহিয়াছিলেন

করিয়াছেন। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে এই মতবাদ অনুযায়ী সর্বশক্তিমান রাজশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে একটি চুক্তি অথবা ইচ্ছার ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলতঃ হব্‌স্‌ ছিলেন আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (Legal Sovereignty) বিশ্বাসী।

লক্‌-এর (১৬৩২-১৭০৪) অভিমত (Views of Locke): জন্‌ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচারক ছিলেন। লক্‌-এর সহিত হব্‌স্‌-এর সাদৃশ্য ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা: (১) মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত, (২) জীবনযাপনের জন্য তাহাদের একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের ও সুসংগঠিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং (৩) তাহারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা অথবা শাসক নির্বাচন করিত ও এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। কিন্তু হব্‌স্‌-এর সহিত লক্‌-এর পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখিতে পাই:

লক্‌-এর মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশুসুলভ এবং নিঃসঙ্গ ছিল না। এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে সাম্যভাবও বিদ্যমান ছিল। তবে এই অবস্থা ছিল প্রাক্‌-রাজনৈতিক অবস্থা। প্রাক্‌-রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সুন্দর। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট সরকারের অভাবে সেই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবনযাত্রার অনেক অসুবিধা ছিল এবং সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্যই একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়।

লক্‌-এর মতে প্রকৃতির রাজত্ব পশুসুলভ এবং কদর্য ছিল না

দ্বিতীয়তঃ, লক্‌-এর মতে রাজা অথবা শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ এবং সামাজিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার কাজের জন্য দায়ী। রাজাকে অবাধ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়া হয় না। কারণ, রাজা যদি চুক্তি ভঙ্গ করেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকে।

লক্‌-এর মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর অন্য একটি রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। হব্‌স্‌-এর ন্যায় লক্‌ আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (Legal Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (Political Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন

লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন

রুশোর (১৭১২-'৭৮) অভিমত (Views of Rousseau) **:** হব্‌স্ এবং লক্-এর মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২] ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে "Contract Social" বইয়ে রুশো তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌স্ এবং লক্-এর মতবাদের সঙ্গে তাঁহার মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। তিনিও মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে একটি প্রাকৃতিক রাজত্ব ছিল। কিন্তু হব্‌স্-এর ন্যায় তিনি সেই প্রকৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুর্বিষহ বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। রুশোর মতে তাহা ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। লক্-এর ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে সেই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যভাব। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতে প্রকৃতির রাজত্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হইতে লাগিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক নির্বাচিত করিল। হব্‌স্-এর মত রুশোও মনে করিতেন যে, শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল। কিন্তু হব্‌স্ মনে করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার হাতে। রুশো বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছার (General Will) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে—ইহাই ছিল রুশোর অভিমত। রুশোর মতবাদে রাজতন্ত্রের স্থান নাই,—রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের প্রয়োজনীয়তা। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে, সুতরাং সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণ-সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের অদল-বদল করিতে পারে। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। রুশোর মতবাদে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর (Liberty, Equality and Fraternity) বাণী প্রচারিত হয়। রুশো বলিতেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী" ("Voice of the people is the voice of God") এবং "মানুষ স্বাধীন

হব্‌স্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য

শাসক ও সরকার চুক্তির একটি পক্ষ নহে

২। **"Rousseau tried to combine the views of Hobbes and Locke."**

হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাশে বদ্ধ" ("Man is born free, but everywhere he is in chains")। মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্য কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ করিতে পারেন নাই। হব্‌স্‌-এর মতবাদের সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হব্‌স্‌-এর মতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য; কিন্তু তাহা রাজার হাতে নহে, তাহা সমাজের হাতে, সাধারণ ইচ্ছার (General Will) হাতে। লক্‌-এর মতবাদের সঙ্গেও রুশোর মতবাদের একটি সাদৃশ্য আছে। লক্‌-এর মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে না, তবে রুশোর ন্যায় লক্ কখনই জনসাধারণের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণের ("all powers to the people") কথা বলেন নাই। লক্‌-এর মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার গণপ্রতিনিধিদের আছে, কিন্তু রুশোর মতে তাহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বে বা গণ-সার্বভৌমত্বে (Popular Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন এবং লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (Political Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন।

মানুষের স্বাধীনতাই বড় জিনিস

লক্ এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনাঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদটি অযৌক্তিক। যাহারা আদিমকালের প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হব্‌স্‌-এর ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও পশুসুলভ, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল—তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়াছিলেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী। সুতরাং ভূস্বর্গ হোক্ অথবা একেবারে কদর্য ও পশুসুলভই হোক,—প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক অধিকার ছিল, এই ধারণা করা অযৌক্তিক। কেননা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ যেখানে ছিল না—সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপর অপরের

এই মতবাদের যুক্তি ইতিহাসে পাওয়া যায় না

এই মতবাদটি অযৌক্তিক

হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্তুতে পরিণত করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় অনেকক্ষেত্রেই বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে; কারণ জনমত যে সর্বদাই বিবেক-বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা নহে।

এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে

মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলা ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে,—ইহা ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে আছে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব—গণতন্ত্রের বিকাশে এই মতবাদের অবদানঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণের সম্মতি,—এই সত্যটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং একদিক হইতে ইহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক। একটি চুক্তি বলিতে আমরা বুঝি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় বাধ্যবাধকতা। আধুনিক-কালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার একটি শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারকে কাজ করিতে হয়। সামাজিক মতবাদে ইহাই বলা হইয়াছে যে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার শর্ত থাকিবে এবং শাসককে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। কারণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (General Will) উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি "সামাজিক" চুক্তি; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার। এখানেই সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের পথ-প্রদর্শক হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্য

রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার উৎস হইতেছে গণশক্তি

১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব,—ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লক্ এবং পরবর্তীকালে রুশোর মতবাদের

সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই।) ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর এই মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের পথ-প্রদর্শক

বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদ (Evolutionary or Historical Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রগঠনের কোন একক উপাদান নাই। ঐশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই অথবা পশুবলও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে, পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা অথবা পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাও সত্য নহে।[৩]

রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদে

রাষ্ট্রের সৃষ্টির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদে। রাষ্ট্র মানব সমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের ("continuous development of human society") ফল,—বার্জেস এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন। শুধু বার্জেস নহে, আধুনিককালের অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এই অভিমত পোষণ করেন। বিশেষতঃ স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) প্রমুখ, ইতিহাস-আশ্রয়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকগণ এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে মানব সমাজের এক বিবর্তনের মাধ্যমে। আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন হিসাবে গঠিত হইতেছে। এই মতবাদ ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical theory) অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary theory) বলিয়া পরিচিত। রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে

মানব সমাজের বিবর্তনের মধ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি

৩। "The State is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family"—*Garner Political, Science and Governments.* P. 20.

ঐতিহাসিক মতবাদই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই মতবাদের নিম্নলিখিত উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হিসাবে বাস করিবার প্রেরণার (kinship) সৃষ্টি হইয়াছে পরিবার হইতে। সুতরাং রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রক্তসম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবারে একত্রিত করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। গোষ্ঠী সম্পর্কে চেতনা রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যতম উপাদান।• সমগ্র গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীপতি। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে সৃষ্টি হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতি। এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে।

সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার প্রেরণা মানুষের স্বভাবজাত—রক্ত সম্পর্কের বন্ধন এবং পারিবারিক বন্ধন

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্র গঠনের একটি বিশেষ উপাদান। রক্তসম্পর্কের বন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একই ধর্মের ভিত্তিতে। গোষ্ঠী-জীবন পর্যন্ত রক্তের বন্ধন এবং ধর্ম একই জিনিসের দুইটি দিক; কেননা উভয়েই সমানভাবে পারিবারিক জীবন এবং গোষ্ঠী-জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারাই সামাজিক জীবনের সব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। গোষ্ঠীপতিও অনেকক্ষেত্রে ধর্মাচরণে নেতৃত্ব প্রদান করিতেন। প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। অতি প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ পুরোহিতগণ এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করার দাবি করিয়া সমাজের অন্যান্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় রাজারাও এই ধর্মসম্বন্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মগুরু আখ্যা দিতেন। ইংলণ্ডের রাণী সুপ্রতিষ্ঠিত চার্চের প্রধান (Head of the Established Churches) হিসাবে পরিচিতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হইবার অনেক পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থায় রাষ্ট্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ethical compulsion) বলিয়া বিবেচিত হয়।

ধর্মের বন্ধন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক

তৃতীয়তঃ, রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও রাষ্ট্রগঠনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে যুদ্ধবিগ্রহ, সামরিক শক্তির (Force) প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক শক্তির প্রয়োগ। ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইল, তখন নিজেদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোষ্ঠী-গঠনের পরবর্তী স্তরে গঠিত হয় উপজাতি (Tribe)। উপজাতীয় সংগঠন প্রাথমিক ভাবে সামরিক সংগঠন হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, শক্তিশালী উপজাতি কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল উপজাতির উপর আক্রমণ করা। এইভাবে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামরিক সংগঠন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যিনি নেতা নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত। সংগ্রাম এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করিয়াছে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু শারীরিক বল অথবা সামরিক শক্তিই কখনও রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল না।

সামরিক শক্তি রাষ্ট্রসৃষ্টির অন্যতম উপাদান

শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ সামাজিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজ বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবারের সৃষ্টি হয়; পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিল তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তি ছিল মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, তাহা ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে।

সামাজিক জীবনের পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি

সর্বশেষে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা, সম্পত্তি বজায় রাখার চেষ্টা, অভাব পূরণ করিয়া নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করিবার প্রেরণা প্রভৃতিও মানুষকে

সংঘবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার প্রেরণা দেয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারিল যে একটি সুনির্দিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব, তখনই মানুষ সেই সমাজ-ব্যবস্থা স্থায়ী রাখার জন্য স্বেচ্ছায় কর প্রদানে সম্মত হইল। ইহার পূর্বে সবল ব্যক্তিগণ দুর্বলের নিকট বলপ্রয়োগে কর আদায় করিত, অথচ ইহার বিনিময়ে সমুদয় দায়িত্ব সর্বাংশে সম্পাদন করিত না।

সংক্ষেপে ইহাই রাষ্ট্রগঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অথবা ঐতিহাসিক মতবাদ। রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যান্য মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, এই মতবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে। মানুষ একত্রিত হইয়া বাস করিতে চায়—মানুষের মধ্যে সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার মধ্যে এবং একজন শাসকের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে আমরা একটি ঐশ্বরিক উপাদান (divine element) খুঁজিয়া পাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের আদিরূপ যে একটি পরিবার এবং তাহা যে বহুল পরিমাণে শারীরিক শক্তির (physical force) উপর নির্ভরশীল ছিল এই তথ্যটির স্বীকৃতিও আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। কিন্তু এককভাবে কোন উপাদানই রাষ্ট্র গঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপাদানের বিচিত্র সমাবেশেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ক্রমপ্রগতি।

এই মতবাদে অন্যান্য মতবাদের উপাদানও দেখা যায়

Exercise

1. রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ আলোচনা কর।
   [Describe the theory of Divine Origin of the State.]

2. "বলপ্রয়োগ নহে, ইচ্ছাই হইতেছে রাষ্ট্রের ভিত্তি"—উক্তিটি আলোচনা কর।
   ["Will and not Force is the basis of the State."—Discuss the statement.]

3. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে হব্‌স্‌, লক্‌ এবং রুশোর মতবাদ আলোচনা কর।
   [Discuss the views of Hobbes, Locke and Rousseau about the origin of the State.]

4. রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদ তত্ত্বটির আলোচনা ও সমালোচনা কর।
   [Critically discuss the Social Contract theory of the origin of State.]

5. সমাজের ক্রমবিবর্তনের উপাদানগুলি আলোচনা কর।
   [Discuss the contributory factors of the evolution of Society.]

6. "রুশো হ্‌বস্‌ এবং লকের মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—উক্তিটির সম্প্রসারণ কর।

["Rousseau tries to combine the theories of Hobbes and Locke."—Elucidate the statement.]

7. "রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে গৃহীত তত্ত্ব হইতেছে ঐতিহাসিক মতবাদ অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ" —উক্তিটি আলোচনা কর।

["The accepted theory of the origin of the State is the Historical or Evolutionary Theory"—Discuss the statement.]

8. "ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে রাষ্ট্র সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদের অর্থাৎ ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদ, বলপ্রয়োগের মতবাদ এবং চুক্তি মতবাদের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে" —উক্তিটি আলোচনা কর।

["Rightly understood, all the best elements in the several theories of the State—the Divine Right Theory, the Force Theory and the Contract Theory—enter into the Evolutionary Theory of the State"— Discuss the statement.]

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বভৌমত্ব: ইহার বৈশিষ্ট্য (Sovereignty : Its Characteristics)

সার্বভৌমত্বের অর্থ (Meaning of Sovereignty) : রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের আইন ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। সার্বভৌমত্ব বলিতে আমরা সর্বপ্রধান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা বুঝি। মূলতঃ ইহা একটি আইনগত ধারণা।[১] প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি সার্বভৌম শক্তির নায়ক এবং ইহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। উইলোবির (Willoughby) মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা।[২] উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে ইহা আইন সৃষ্টি করিবার এবং আইনের ক্ষমতা বাড়াইবার একটি দৈনন্দিন কার্যকরী শক্তি।[৩] উইলোবি এবং উইলসনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বার্জেসের (Burgess) সংজ্ঞা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজা এবং ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা।[৪]

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু আইনবিশারদদের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোন আপাতবিরোধ নাই।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক কোন শক্তিই রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারে না। আইনের দিক হইতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন

রাষ্ট্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী

১। "There must exist in the State, as a legal association, a power of final legal adjustment of all legal issues which arise in its ambit." —Braker.

২। "Sovereignty is the supreme will of the state."

৩। ..."the daily operative power of forming and giving efficiency to laws."

৪। "Original, absolute, unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects."—Burgess.

রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এই সার্বভৌম ক্ষমতা কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Attributes of Sovereignty): সার্বভৌমত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক (original) অথবা আদিম। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, সেই প্রকার ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম (unlimited)। যে কোন আইন প্রণয়ন করিবার এবং ইহা বাতিল করিবার ক্ষমতা সার্বভৌমের আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

সার্বভৌমত্বের সীমা

কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম নয়, ইহা সসীম। তাঁহাদের মতে ঐশ্বরিক বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ থাকে না। সুতরাং আইনগতভাবে ইহার দ্বারা সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, শাসনতান্ত্রিক আইন (constitutional law) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে

শাসনতান্ত্রিক আইন সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না

কিন্তু ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা সার্বভৌমের সর্বদাই থাকে। কোন কোন লেখকের মতে আন্তর্জাতিক আইন (international law) রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য নয় এবং ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র যে-কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই পূর্বে সংগঠিত করিয়াছিল) বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং তত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে

আন্তর্জাতিক আইন কোন দেশেরই সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। কিন্তু বাস্তবে আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ যে-কোন রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব পালন করিয়া থাকে; কারণ আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করিলেই যুদ্ধের আশংকা থাকে। যাঁহারা বহুত্ববাদে (pluralism) বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তিসংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে এবং এই সমস্ত সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হইতেছে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের সীমা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা অসীম।

আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের অভিমত

বহুত্ববাদীদের অভিমত

চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অনন্যতা (exclusiveness)। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তি থাকিতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী অপর কোন শক্তি থাকিত, তবে সেই শক্তি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত। সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power) হইতেই আমরা এই অনুসিদ্ধান্ত করিতে পারি।

সার্বভৌম ক্ষমতা অনন্য ও সার্বজনীন

পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতারই আর একটি রূপ হইতেছে ইহার সার্বজনীনতা (all-comprehensiveness)। রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে।

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী (permanent)। রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সার্বভৌমের স্থায়িত্ব থাকে। সরকার অথবা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না।[৫]

৫। 'Sovereignty does not cease with the death or temporary dispossession of a particular bearer, or the reorganisation of the State, but shifts immediately to a new bearer, as the centre of gravity shifts from one part of a physical body to another when it undergoes external change."

সপ্তমতঃ, সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তান্তরযোগ্য (inalienable) নহে। আত্ম-বিলোপ সাধন ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের একটি অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করে তবে সেই ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না এবং সেখানে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ড অথবা ভারত কাহারও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এই যুক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনানুমোদিত স্বত্ব আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অপপ্রয়োগ অথবা অপব্যবহারের জন্য বিনষ্ট হয় না।

ইহা স্থায়ী এবং হস্তান্তরের অযোগ্য

সর্বশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (indivisible)। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়,—ইহার বিভাগ অসম্ভব। সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। সুতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান কখনই একযোগে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না।

সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায়।

সার্বভৌমত্ব

মৌলিক ক্ষমতা	চূড়ান্ত ক্ষমতা	অসীম ক্ষমতা	অনন্যতা	সার্বজনীনতা	স্থায়িত্ব	হস্তান্তরযোগ্যতার অভাব	অবিভাজ্যতা

আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (De Jure Sovereignty and De Facto Sovereignty) : আইনের চোখে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে **আইনানুমোদিত** সার্বভৌম অথবা আইনসঙ্গত সার্বভৌম (De Jure Sovereign) বলা হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইনসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রের জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি করিতে পারে। এই সার্বভৌমত্ব আইন অনুযায়ী সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে সার্বভৌম স্বীকৃত না হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে **বাস্তব সার্বভৌম** (De

আইনসঙ্গত সার্বভৌম আইন অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়

Facto Sovereign) বলা হয়। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,—কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রিসভা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কারণ, ইংলণ্ডে রাজশক্তি বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বাস্তবে যিনি সার্বভৌম তিনি আইনানুমোদিত সার্বভৌম না-ও হইতে পারেন

বাস্তব সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া লর্ড ব্রাইস বলেন, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনগণ আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আইনসঙ্গতভাবেই হউক অথবা আইনবিরুদ্ধভাবেই হউক নিজের বা নিজেদের ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ইচ্ছা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারা হইলেন বাস্তব সার্বভৌম। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি অধিকারী, তিনি যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় আসীন থাকেন তবে জনমত নিজের অনুকূলে আনিয়া তিনি তাঁহার ক্ষমতাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে পারেন।[১] বিপ্লবের পর যখন নূতন কোন শক্তি দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন সেই শক্তি বাস্তব সার্বভৌম হিসাবে পরিগণিত হয়। তখন ইহা নিছক আইনের ধারণা নহে। আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত নহে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্বকেই সার্বভৌমত্ব বলিয়া অভিহিত করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা এমন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে যিনি বা যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আইনানুমোদিত সার্বভৌম নহেন।

নামমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular Sovereignty and Actual Sovereignty): যাহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলবৎ হয় অথচ বাস্তবে যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে নামমাত্র সার্বভৌম (Titular Sovereign) বলা হয়। নামমাত্র সার্বভৌম সাধারণতঃ দেশের নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) শাসকরূপে পরিচিত হন। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনের চোখে সার্বভৌম। কিন্তু রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম। প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন মন্ত্রিসভা এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী। যিনি প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ও চূড়ান্ত

১। **"The Person or body of persons who can make his or their will prevail with the law or against the law; he or they, is the *de facto* ruler, the person to whom obedience is actually paid."**

—Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Vol. II.

ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign)।

আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty)ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদে হব্‌স্‌ এবং লকের মতের পার্থক্যের মধ্যে আমরা আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে পাই। আইনগত সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আইনগত সার্বভৌমত্ব কোন প্রকার নৈতিক সূত্র, ধর্মীয় বাধানিষেধ বা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বিচারকগণও আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অষ্টিন (Austin) বলিয়াছিলেন, সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন ("Law is the command of the Sovereign")। অষ্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথবা কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাঁহার মাধ্যমে চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হয়। আইনের চোখে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য। এই আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক সময়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে, কিন্তু আইনগত সার্বভৌমের কোন নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে বিচার করিবার মত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনগত সার্বভৌম বলিয়া পরিচিত এবং এই আইনগত সার্বভৌম রচিত আইন ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে-কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

আইনগত সার্বভৌমত্ব আইনের ধারণামাত্র

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty)ঃ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমের হাতে থাকিলেও বাস্তবে সেই ক্ষমতা হয়ত অপর একটি কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন। আইনগত সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমরা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) বলি। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম জনমতের নির্দেশে পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে আইনগত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইতেছেন দেশের নির্বাচকমণ্ডলী, যাঁহারা দেশের সরকার

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব

নির্বাচিত করেন, এবং ব্যাপক অর্থে ইহা হইতেছে জনমতের উপর প্রভাববিস্তারকারী যে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টি ; তিনি বা তাঁহারা নির্বাচক না-ও হইতে পারেন।[৭] গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অথবা রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হয়। তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম কতটা শক্তিশালী তাহা নির্ভর করে নির্বাচকমণ্ডলীর রাজনৈতিক সচেতনতার উপর।

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব

ডাইসির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপে পড়িয়া রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত রাজনৈতিক সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী না হইতে পারে, তবে ইহা ঠিকই যে রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক সার্বভৌমের আইনগত সার্বভৌমের ন্যায় বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে,—কিন্তু, ইহার এমন একটি শক্তি আছে যাহা কোনও রাষ্ট্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

গণ-সার্বভৌমত্ব

গণ-সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty): গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ অনুযায়ী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা (All powers to the People) থাকে। রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলিয়াছিলেন। স্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করাই গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির (electoral power) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথবা বিদ্রোহ করিবার শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনগণের আনুগত্য আদায় করিবার ক্ষেত্রে ইহার সামর্থ্যের উপর। সুতরাং জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ্য যে শক্তির থাকে তাহাই সার্বভৌম। গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই দেশের শাসক। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করে সেই আনুগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির প্রতি। "জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা" ("Voice of the People is the voice of

৭। **"In a narrow sense, the electorate constitutes the political sovereign, yet in a wider sense it may be said to be the whole mass or population, including every person who contributes to the moulding of public opinion, whether he is a voter or not."** —***Garner—Political Science and Government.*** **P. 160.**

God")—ইহাই ছিল রুশোর গণ-সার্বভৌমত্বের মূল কথা। রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী জনসাধারণেরই প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না এবং জনমত যদি কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যায় তবে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রয়োগ

সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা (Limits to Sovereignty or Theory of Limited Sovereignty): সার্বভৌমত্বের প্রচলিত অর্থানুযায়ী ইহা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, অনন্য এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহা অবাধে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু যদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং অসীম, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না তাহা নহে। অধ্যাপক ডাইসির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, একটি বাহ্যিক এবং অপরটি আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে ঐশ্বরিক বিধান, জনমত এবং শাসনতান্ত্রিক আইন।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সীমা

আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে সন্দেহ নাই। যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন সন্ধি অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং চুক্তির শর্ত ইহাকে পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন যে কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে তাহা প্রমাণিত হয় রাষ্ট্রসংঘের (U. N. O.) যে সনদ আছে তাহার ২ নম্বর অনুচ্ছেদের ক নম্বর ধারা হইতে।[৮]

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

কিন্তু কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ সর্বদা না-ও মানিয়া চলিতে পারে বলিয়া এবং সর্বদাই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে বলিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়ায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধি হইতে যে-কোন রাষ্ট্র নিজের নাম যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। সুতরাং

রাষ্ট্রসংঘ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে কিনা

৮। সেখানে বলা হইয়াছে, 'The Members shall refrain in their international relations from threat or use of force"

আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক আইন পালন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাহীন হইলেও বাস্তবে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া নিজের সার্বভৌমত্বকে জাহির করিবার চেষ্টা করে না।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে ঐশ্বরিক বিধান একটি। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মানবতার দোহাই—ইহাদের কোনটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।

ঐশ্বরিক আইন যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, অনেকের মতে শাসনতান্ত্রিক আইনও (Constitutional Law) সেই প্রকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থকদের মতে সরকারী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিস নহে; রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ম্যাক আইভার (Mac Iver) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ীই রাষ্ট্রকে চলিতে হয় বলিয়া ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

জনমত যত শক্তিশালীই হউক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ইহার নাই; ইহা অবশ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জার্মানীতে হিটলার যখন শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন তিনি জনমতের প্রবল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যতক্ষণ রাষ্ট্র জনমত, শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলে ততক্ষণ নিজের ইচ্ছায়ই রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে।

জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না

বহুত্ববাদীরা (Pluralists) মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সসীম হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন,—বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, শ্রমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা

আছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয় না। কারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কলহের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের যে সকল ক্রিয়াকলাপ থাকে, সেইগুলির মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর থাকে।

বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত ও অনন্য নয়

Exercise

1. সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ? সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি?

[What do you understand by Sovereignty? What are the attributes of Sovereignty?]

2. (ক) আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব, (খ) নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব এবং (গ) আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও গণ-সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। উদাহরণ দাও।

[Distinguish between (a) De Jure and De Facto Sovereignty, (b) Titular and Actual Sovereignty, and (c) Legal, Political and Popular Sovereignty. Give illustrations.]

3. সীমাবদ্ধ সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ? একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (ক) শাসনতান্ত্রিক আইন এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা কতটা সীমিত?

[What do you mean by 'limited sovereignty'? How far is Sovereignty of a State limited by (a) Constitutional Law and (b) International Law?]

4. "সার্বভৌমত্ব দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে সীমিত"—উক্তিটি পরীক্ষা কর।

["Sovereignty is limited from within and from without"—Examine the statement]

[**ইঙ্গিত ঃ** এই প্রশ্নের উত্তরে দুইদিক হইতে সার্বভৌমত্বের সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। বহুত্ববাদিগণ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সীমা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের সমালোচনা করিয়াছেন। সার্বভৌমত্বের সীমা কোথায় সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতে হইবে।]

5. সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[Discuss the characteristics of Sovereignty.]

পঞ্চম অধ্যায়

জাতিতত্ত্ব ও জাতীয়তাবাদ
(Theory of Nationality and Nationalism)

জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) : জাতীয় জনসমাজ গঠনের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) বলিতে কী বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় জনসমষ্টি বলিতে বুঝায় একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষা ও সাহিত্য, একটি সাধারণ ঐতিহ্য ও ইতিহাস, আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে।

স্বজাতীয় জনসমষ্টি কাহাকে বলে?

কিন্তু স্বজাতীয় মানুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই ঐতিহ্য এবং ঐক্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্বজাতীয় জনসমষ্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজবন্ধনের মূল সূত্র।

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) : জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীর ঐক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় একদল জনসমষ্টি লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে বংশগত ঐক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় জনসমাজে বংশগত ঐক্য থাকিবে; কারণ, ইংরাজী "Nationality" কথাটি আসিয়াছে "Natio" কথাটি হইতে। "Natio" কথাটির অর্থ হইল জন্ম। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বজাতীয় মানুষের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকিতে পারে; যেমন, বহুদিন পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না অথবা ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু তাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল,—ইহাই তাহাদিগকে একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জাতীয় জনসমাজকে "রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসমষ্টি" (politically conscious People) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। জাতীয় জনসমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হইতেছে, (১) বংশগত ঐক্য; (২) ভাবগত ঐক্য; (৩) ভৌগোলিক ঐক্য; (৪) অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্য এবং (৫) আচার-ব্যবহারের ঐক্য। **কিন্তু এই উপাদানগুলির কোনটিই জাতিগঠনের জন্য অপরিহার্য নহে।**

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality) : জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা দুইটি ভাগ করিতে পারি, যথা—বাহ্যিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত ঐক্য (racial unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু বংশগত ঐক্য যে একেবারে অপরিহার্য তাহা নহে। জার্মান এবং ইংরাজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালী এক বংশোদ্ভব না হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে।

বংশের ঐক্য একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু অপরিহার্য নয়

দ্বিতীয়তঃ ভাষাগত ঐক্য (sameness of language) জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে অপরিহার্য নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা তিন ভাষায় কথা বলে ; সোভিয়েত রাশিয়ায়ও অনেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষম্য কখনই অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত ঐক্য যে জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে।

ভাষাগত ঐক্য—ইহাও অপরিহার্য নয়

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভাষাগত ঐক্যের জন্য সম্ভব হইয়াছে

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের আর একটি উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও যে সর্বদা অপরিহার্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহুদী জাতি বহুদিন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে বসবাস না করিয়াও নিজেদের ঐক্যবোধের প্রেরণায় জাতীয় জনসমাজ গঠন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে অবিভক্ত ভারতে একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দু এবং মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত একজাতিতে পরিণত হয় নাই।

ভৌগোলিক ঐক্য—ইহা অপরিহার্য নহে

চতুর্থতঃ ধর্মগত ঐক্য (Religious unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাস করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই।

ধর্মগত ঐক্য—ইহার গুরুত্বও কমিয়া গিয়াছে

একই দেশে আচার-ব্যবহারের ঐক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বার্থের ঐক্যও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু ইহাও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে।

উপরোক্ত চারিটি উপাদান হইতেছে জাতীয় জনসমাজ গঠনের বাহ্যিক উপাদান, ইহাদের কোনটি অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের ভাবগত ঐক্য (spiritual unity) অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়। যদি একই ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হয়, যদি তাহাদের আত্মত্যাগ এবং সুখ-দুঃখের একই স্মৃতি থাকে এবং যদি একই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিজেদের ঐতিহ্য রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করে তখনই তাহাদের এই ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তাহারা নিজেদের অপরজাতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করে।[১] স্পেঙ্গলার বলেন জাতীয় সমাজের উপাদান কুলগত অথবা ভাষাগত ঐক্য নহে, ইহার প্রধান উপাদান ভাবগত ঐক্য।[২]

জাতীয় সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ভাবগত ঐক্য

জাতি (Nation): একটি জাতি হইতেছে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যাহা অনুরূপভাবে সংগঠিত জাতীয় জনসমাজ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি এক নহে। জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সংগঠিত হয় এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে

১। "...Neither biological nor linguistic unity, but a spiritual unity."—Spengler.

২। "It is sentiment of a common heritage of memories, whether of achievement or glory of suffering and sacrifice, together with a desire to live together and to transmit their heritage to their posterity."—C. D. Burns *"Political Ideals."* Chapter on "Nationalism."

পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, জাতি হইতেছে এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যাহা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করিয়া স্বাধীন হইয়াছে অথবা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। জিমার্ণের (Zimmern) মতে জাতি গঠনে ভাবগত ঐক্যের গভীরতা ও মর্যাদা খুবই বেশী এবং ইহা একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট।[৩]

জাতি ও রাষ্ট্র

কোন জাতি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তবে ইহা একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু, জাতি গঠিত হইলেই রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেননা, কোন জাতি হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীন নাও হইতে পারে; ইহা হয়ত স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে।[৪] কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই স্বাধীন এবং সার্বভৌম। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই জাতির সৃষ্টি হয় না; কিংবা রাষ্ট্রের বিলোপ হইলেই জাতির বিলোপ হয় না।

জাতীয়তাবোধ (Nationalism): জনসমাজ গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে ভাবগত ঐক্য (Spiritual unity)। জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতিকে বা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতি আসে একটি মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে। বার্নস্ দেখাইয়াছেন,

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির পিছনে দুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, একটি হইতেছে রেঁনেসার (Renaissance) যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এবং আর একটি হইতেছে নিজস্ব সরকার গঠন করিবার বৈপ্লবিক অধিকার। রেঁনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা (local independence) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাকিবে, এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বন্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল। এই দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ।[৫]

একজাতি, একরাষ্ট্র নীতি (Principle of One Nation, One State): জাতীয় জনসমাজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে একটি রাষ্ট্রনৈতিক

৩। "...a corporate sentiment of peculiar intensity, intimacy and dignity related to a definite home country."—Zimmern.

৪। "A nation is a nationality which has organised itself into a political body, either independent or desiring to be independent."—Lord Bryce.

৫। "Out of Renaissance Sovereignty, combined with Revolutionary Rights, comes Nationalism." Burns—Political Ideals.

সংগঠনের মধ্যে। যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত।[৬] ইহা হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of self-determination)। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয়, তখনই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের নিজস্ব ও পৃথক সরকার দাবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।[৭] অর্থাৎ জন স্টুয়ার্ট মিল "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" ("one Nation one State") নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।[৮] একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (Mono-National State) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। ১৭৭২ সালে যখন পোল্যাণ্ডের বিভাগ হয় তখন হইতেই কোন জাতীয় সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী কার্যকরী হইতে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন এই নীতির প্রধান সমর্থক। "এক জাতি এক রাষ্ট্র" নীতির পক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন জাতির স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা দেখিতে পারিবে না কিংবা অর্জন করিতে পারিবে না। এইজন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থেই একজাতীয় রাষ্ট্র (Mono-National State) গঠন করা উচিত। প্রত্যেক জাতিরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের বলেই কোন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতে পারে

'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির তাৎপর্য

জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

৬। "It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of government should coincide in the main with those of nationalities." Mill—Representative Government.

৭। "Where the sentiment of nationality exists in any form, there is prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government."

৮। "Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities."

অথবা ইহার রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা সার্থক করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে। একজাতীয় রাষ্ট্রের দাবী সমর্থন করিবার জন্য এই সমর্থকগণ বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের একটি বিচ্যুতি লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-National State) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইতে পারে

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্যনীতি যাহা উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন।[১]

জাতীয় জনসমাজের আত্ম-নির্ধারণের অধিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত করিবে

একজাতি, এক রাষ্ট্র নীতির সমর্থকগণ মনে করেন কোন জাতিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিলে ইহা নিজের উন্নয়নের জন্য এবং নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে সেই জাতি অন্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বরং অন্য জাতি হইতে নিজের বৈশিষ্ট্যকে পৃথক রাখিবে। কোন জাতির পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যকে উন্নত রাখিতে হইলে

১। "Self-determination is not a mere idle phrase ; it is an imperative principle of action which statesmen will, henceforth, ignore at their own peril."—Wilson.

অপর একটি জাতির প্রতিযোগী না হইয়া ইহার সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। পৃথিবীতে যদি বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র সমন্বিত বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে তবে সমগ্র মানব-সমাজই উপকৃত হইবে।[১০]

কিন্তু লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি সমর্থন করেন না। অ্যাক্টনের মতে, জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ।[১১] একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ত্ব স্বয়ং।[১২] গাম্‌প্লোউইক্ (Gumplowicz) বলেন, একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা আছে এই মতের কোনও ঐতিহাসিক অথবা সমাজতান্ত্রিক যুক্তি নাই।[১৩]

"একজাতি এক রাষ্ট্র" নীতির বিভিন্ন অসুবিধা

"একজাতি, এক রাষ্ট্র" নীতির বিপক্ষে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতি-গুলিরও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার ফলে মানব সমাজের একটি অংশের বীর্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।[১৪]

উন্নততর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনগ্রসর জাতিগুলি উন্নত হয়

১০। "If each nation is to develop its own characteristic, then each nation is valuable to every other not as a rival of exactly the same kind but as a contrast; and humanity at large is benefited by the preservation of so many distinct types."
C. D. Burns—Political Ideals.

১১। "The theory of Nationality is a retrograde step in history."—Acton.

১২। "The greatest adversary of the rights of nationality is the theory of nationality itself."

১৩। "There is no historical or sociological justification of the view that mono-national states possess elements of advantage over those composed of a number of nationalities."—Gumplowicz.

১৪। "The combination of different nations in one state is as necessary a condition of civilised life as the combination of men in society. Inferior races are raised by living in political union with races intellectually superior. Exhausted and decaying nations are revived by the contact of a younger vitality...this fertilising and regenerating process can only be obtained by living under one government. It is in the cauldron of the state that this fusion takes place by which the vigour, the knowledge, and the capacity of one portion of mankind may be communicated to another."
Acton—*History of Freedom and other Essays.*

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। গণতন্ত্রের সহিত জাতীয়তাবাদের কোন সংঘাত নাই। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দেখা যায়

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকর করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমান কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকর হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে।[১৫] ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিবে। আত্মনির্ধারণ নীতির দুইটি দিক্ আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় জনসমাজকে

জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে

১৫। It would redraw the political map of Europe and of the world—so that disjointed part of the same nationality would be knit together in a common polity and supranational empires would be broken up into their constituent national parts. It would make nationalities rather than state-units of international relationship and law." Hayes.

—"Nationalism" Encyclopaedia of Social Sciences.

ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে পারে।[১৬]

জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপর দিকে এই নীতি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির আত্মনির্ধারণ করিবার অধিকারের নীতিটি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিলে ইহা আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্প্রসারণের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

কোন জাতির আলাদা রাষ্ট্র থাকিলেও ইহা আত্মনির্ভরশীল না-ও হইতে পারে

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। বরং বিভিন্ন জাতি সম্মিলিতভাবে একটি রাষ্ট্র গঠন করিলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হয়।

"এক জাতি এক রাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা

ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করিতে পারে। উইলসন্ বলিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্যকর হইলে অনেক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক উন্নত

সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। বস্তুতঃ, বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে। ভারতে আমরা বিভিন্ন জাতীয়

১৬। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, 'The right of self-determination is a double-edged sword; it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become also a disintegrating force."

জনসমাজ দেখিতে পাই। এই দেশে বিভিন্ন জাতির পক্ষে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

উপসংহার ঃ 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিটির পক্ষে ও বিপক্ষে সব যুক্তি আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ব্রাইস এবং ম্যাকআইভার অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাইসের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য কোন জাতির সংগ্রাম হইতেছে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম।

জাতিতত্ত্ব রাষ্ট্র গঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of a Nationality) **ঃ** একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা মূলতঃ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী (Right to exist)।

জাতির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টিঁকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা না থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

ভাষা রক্ষার অধিকার

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (Right to retention of local laws and customs) অধিকার প্রদান করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লীগ্ অফ্ নেশন্স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়।

স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and political equality) থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলেই সমান।

রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার

জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি—জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা (Value and Limitations of the ideal of Nationalism—Ideal of Nationalism and Civilisation): জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism), যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে—'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। নিজে বাঁচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথবা কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে।[১৭]

জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক

আদর্শ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

১৭। 'The world has become so interdependent that an unfettered will of a state may be fatal to the peace of other States"—Laski—Introduction to Politics—Chapter-4.

যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক এবং আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক। প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রধান গুণ হইল ইহা একদিকে বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে ও উন্নত করিতে অনুপ্রাণিত করে, অপরদিকে ইহা একটি জাতিকে অপর জাতির সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিয়া অপর জাতির যাহা কিছু ভাল ও সুন্দর তাহা উপলব্ধি করিতে উৎসাহিত করে। ইহাতে একটি জাতি অপর জাতির প্রতিযোগী হয় না। বরং একটি জাতি অপর জাতির নিকট নিজেকে মূল্যবান রূপে পরিণত করে। ইহাতে সমগ্র মানব জাতি উন্নত হয়।

আদর্শ জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক

আদর্শ জাতীয়তাবাদ কোন অবস্থায়ই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নয়। ম্যাটসিনি ইটালীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান হোতা ছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতীয়তাবাদের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মূল বিষয় ইটালীর শ্রেষ্ঠত্ব হইলেও উহা অন্যান্য জাতির সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পরিপন্থী নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়া বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে কোন জাতিকে ইহার স্বাতন্ত্র্য অথবা জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দিতে হইবে। বরং একটি জাতি যদি অপর জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় জাতিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নত হয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে

কিন্তু জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই আদর্শের একটি ত্রুটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তাবোধের বিকৃত (perverted) বিকাশ দেখিতে পাই। সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা

বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[১৮] বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের

বিকৃত জাতীয়তাবাদ দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ করিতে প্রণোদিত করে

প্রথম পর্যায় হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর ক্রমশঃ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে।" অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলি বিক্রয়করণের জন্য অথবা শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করে,—যেমন, দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের উন্নত করা, ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তাবোধ এবং সাম্রাজ্যবোধ

বিকৃত জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে ক্ষতিকর

কখনই আন্তর্জাতিক অনুশাসনের সহিত সুসমঞ্জস নহে। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতে হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইহা একটি ত্রুটি। যদি "একজাতি একরাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-States) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের আশংকা থাকে।[১৯] জাতীয়তাবাদের ভিতরেই ইহার বিনাশের বীজ নিহিত থাকে।

১৮। "As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism," —Laski-Grammar of Politics.

১৯। অধ্যাপক লাস্কি জাতীয়তাবাদের এই অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "the scale of modern civilisation has made the national and sovereign state an instiutional expedient of which the political unwisdom and moral danger are both manifest."

উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন যে ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির প্রতি বাধ্যবাধকতা কিংবা আন্তর্জাতিক আইন পালন করিবার যৌক্তিকতার কথাও বিস্মৃত হয়। নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাখিবার জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ভাল হউক তাহা চাহে না এবং প্রয়োজন হইলে অপর জাতিকে নিজের পদানত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে। তাহা ছাড়াও যদি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি বহু জাতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুন পাঠান-মোগল এক দেশে লীন হইয়াছে। কিন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) : আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক্ আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (Universal Brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় যদি জাতীয়জীবন হইতেও পরবিদ্বেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর লিপ্সা দূর করা যায় তবে আর কখনই আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং কলহের সম্ভাবনা থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভাবের আদানপ্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতি-জাতীয় আন্দোলন (Super-National Movement) সমর্থন করেন। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন পৃথিবীতে যতক্ষণ পরস্পর বিবদমান ও প্রতিযোগী জাতি-রাষ্ট্র থাকিবে

ততক্ষণ সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।[২০] অতি-জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয় তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষ অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের (Family of Nations) সদস্য হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র যতক্ষণ প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি।

আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ

আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। অতি-জাতীয় আন্দোলন (Super-National Movement), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘ যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হইলে অতি-জাতীয় আন্দোলন এতদিনে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত এবং ইহাতে আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইত। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় আন্তর্জাতিকতার সহযোগিতা প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক।

আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি

২০। **"A world of competing nation-states, each of which is a law into itself produces a civilisation incapable of survival."**
Laski :—*The Danger of Being a Gentleman*. P. 81.

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছা প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উপযোগিতা

আন্তর্জাতিকতা সম্প্রসারণের প্রধান উপযোগিতা হইতেছে এই যে ইহার ফলে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিকতা যতই সম্প্রসারিত হইবে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলি ততই পরস্পরের নিকটতর হইবে এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হইবে। ইহার ফলে শুধু যে বিশ্বশান্তি সুরক্ষিত থাকিবে তাহাই নহে ; বিভিন্ন জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা হইতে উপকৃত হইবে। একটি জাতি অপর জাতির উন্নতিকে তখন বিদ্বেষের চোখে না দেখিয়া প্রীতির চোখে দেখিবে। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (Economic and Social Council) বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ হইতেই আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারি। আণবিক শক্তির অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির সদিচ্ছার সম্প্রসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন এবং এইজন্য আন্তর্জাতিকতার উপযোগিতা খুবই বেশী।

Exercise

1. জনসমাজ এবং জাতীয় জনসমাজের সংজ্ঞা প্রদান কর। জাতীয় জনসমাজের মূল উপাদান কি কি? উহাদের প্রত্যেকটি কি অপরিহার্য?

[Define People and Nationality. What are the basic elements of Nationality ? Is everyone of them absolutely essential ?

2. কোন রাষ্ট্রে ঐক্যবোধের সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the factors that create a sense of unity in a state.]

3. জাতীয় জনসমাজ গঠনকারী উপাদানগুলি কি কি? বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ সম্পন্ন দেশে কিভাবে একটি জাতির সৃষ্টি হয়?

[What are the factors that tend to create a Nationality ? How does a nation come into being in a country of diverse Nationalities ?]

4. (ক) জাতীয় জনসমাজ, (খ) জাতি ও (গ) রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[Distinguish between (a) Nationality, (b) Nation and (c) State.]

5. রাষ্ট্রনৈতিক নীতি হিসাবে আত্মনির্ধারণের অধিকার নীতিটির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

[**Discuss the value and limitations of the doctrine of Self-determination as a political principle.**]

6. "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি পরীক্ষা কর। তুমি কি মনে কর জাতীয় জনসমাজের তত্ত্ব ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ। জাতীয় জনসমাজ কি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে।

[Examine the theory of "One Nation, One State". Do you think that the theory of Nationality is a retrograde step in history ?"

7. জাতীয় জনসমাজের অধিকার কি কি ?

[What are the rights of Nationalities ?]

8. জাতীয় জনসমাজের প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি ? জাতীয় জনসমাজ কি ? রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তিপ্রদান কর।

[What are the essential elements of Nationality ? Can Nationality act as a basis of statehood ? Give reasons for your answer.]

9. তুমি কি মনে কর জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন ? তোমার উক্তির পক্ষে যুক্তি দেখাও। আন্তর্জাতিকতার উপর একটি টীকা লিখ।

[Do you think that Nationalism is incompatible with an international order ? Give reasons for your answer. Write a note on "Internationalism."]

10. জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাব সমস্যাটি আলোচনা কর।

[Discuss the problem of Nationalism vs. Internationalism.]

11. রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি এবং উপযোগিতা আলোচনা কর।

[Discuss the basis and utility of Internationalism as a political ideal.]

12. জাতি, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতীয়তাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা কর। জাতীয় জনসমাজ কি আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সন্তোষজনক ভিত্তি।

[Explain the meanings of Nation, Nationality and Nationalism. Is Nationality a satisfactory basis of modern States ?]

13. কোন রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া উচিত। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Should boundaries of State coincide with the boundaries of Nationalities ? Give reasons for your answer.]

14. জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা প্রদান কর। জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার প্রতিবন্ধক ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Define Nationalism. Is Nationalism a menace to Civilization ? Give reasons for your answer.]

(এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমে দেখাইতে হইবে কেন অনেকে মনে করেন যে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রথমে জাতীয়তাবাদের বিকৃতি রূপটি আলোচনা করিতে হইবে। উহার পর দেখাইতে হইবে যে জাতীয়তাবাদ সর্বদাই যে আক্রমণাত্মক অথবা বিকৃতিরূপসম্পন্ন হইবে, তাহা নহে। ইহার একটি ভাল দিকও আছে এবং সেইদিক হইতে ইহা আন্তর্জাতিকতাব সম্প্রসারণের পক্ষে সহায়ক ; ইহাই হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ।)

15. আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতার মূল্যায়ন কর।

[Attempt an evaluation of internationalism as a political ideal.]

16. জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার' বলিতে কি তুমি বুঝ ? ইহা কি একটি বাঞ্ছনীয় আদর্শ ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[What do you mean by the right of self-determination of a nation ? Is it a desirable ideal ? Give reasons for your answer.]

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘ—ইহার উদ্দেশ্য, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ
(The United Nations—Its Objective, Structure and Functions)

রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তুতি
(On way to Establishing the U. N. O.)

রাষ্ট্রসংঘ অথবা The United Nations গঠিত হইবার আগে জাতিপুঞ্জ (The League of Nations) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে বা জাতি-সমূহের পরিবার (Family of Nations) হিসাবে কাজ করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভাইসরয় চুক্তি অনুযায়ী মোটামুটিভাবে জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ছিল জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিরোধে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের জাতির পর্যায়ে উন্নীত হইবার অধিকারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে চার প্রকার স্বাধীনতার কথাও ঘোষণা করেন। এই চারিটি স্বাধীনতা হইল (১) বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression), (২) ধর্মের স্বাধীনতা (Freedom of Religion), (৩) দারিদ্র্য হইতে মুক্তির স্বাধীনতা (Freedom from Poverty) এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তির স্বাধীনতা (Freedom from Fear)। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট আটলান্টিক চুক্তির (Atlantic Treaty) মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মিত্রপক্ষ কেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করেন। আটলান্টিক চুক্তির আটটি দফা (Eight Points) ছিল। সেইগুলি হইতেছে,—(১) আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপে মিত্রপক্ষের লিপ্ত না হওয়া, (২) জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী কোন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তনশীল হওয়া, (৩) জাতীয় জনসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সরকারের গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত হওয়া, (৪) ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি রাষ্ট্রের সহিত একজাতীয় বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা, (৫) মিত্রপক্ষের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি গড়িয়া তোলা, (৬) নাৎসী জার্মানীর পতনের পর শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আশা,

আটলান্টিক চুক্তির আটদফা প্রস্তাব

পোষণ করা এবং প্রতিটি জাতি যাহাতে নিরাপদে টিকিয়া থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করা (৭) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রতিটি জাতির মানুষ যাহাতে নিঃশংকচিত্তে সমুদ্র ও মহাসাগরে পাড়ি দিতে পারে সেই ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৮) বিশ্বের প্রতিটি জাতি যাহাতে শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিত্যাগ করে সেই পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

শত্রু শক্তিজোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্য ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী মিত্রপক্ষ রাষ্ট্রসংঘ গঠনের জন্য মিলিত হন। তখন এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুপক্ষকে দ্রুত পরাজিত করিয়া বিশ্ব-শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মিলিত হইয়াছিলেন। মিত্রপক্ষের কোন সদস্যই পুনরায় জাতিপুঞ্জকে পুনরুজ্জীবিত করার সমর্থক ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাম্বারটন্‌ওকস্ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের (তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চীন) প্রতিনিধিগণের নিকট একটি নূতন আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ অবসান এবং শান্তিরক্ষার জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া একটি নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) গঠন করিবার কথা বলা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে একটি সেনাবাহিনী রাখিবার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। এই প্রস্তাব শান্তিকামী জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করে। নিরাপত্তা পরিষদে ভোট পদ্ধতি কিভাবে নির্ধারিত হইবে সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা শহরে রুজভেল্ট, চার্চিল এবং ষ্ট্যালিন এক বৈঠকে মিলিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন-উড্‌সে (Brettonwoods) রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত হয়। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সানফ্রান্সিসকো শহরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের প্রারম্ভিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে ৫১টি সদস্য-রাষ্ট্র একজোটে রাষ্ট্রসংঘের সনদের স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনা (Preamble to the U. N. Charter)

রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনাটি নিম্নরূপ* :

"আমরা, সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—পর পর দুইটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষের জীবনে যে অকথ্য দুঃখ-কষ্ট

*"We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generaticns from the scourge of war, which twice in our li'etime has brought nutold sorrow to mankind, and, to re-affirm faith in fundamental human htsrig

নামিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে যাহাতে রক্ষা করা যায় সেইজন্য সচেষ্ট হইবে, এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মৌলিক মানবিক অধিকার মানুষের মর্যাদা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সমান অধিকার এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিটি জাতির মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইব, এবং এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করিব যাহাতে ন্যায় এবং মর্যাদার সহিত নামবিক কল্যাণের জন্য যে-কোন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শিত হয়, এবং

বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন ধারণের মানের উন্নতি হয়, এবং

এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতে পারি সেই চেষ্টা করিব, এবং

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সম্মিলিত হইব, এবং

বিশ্বমানবের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব,

এই সকল উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য 'আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি,

in the dignity and worth of the human person in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom:

And for these ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to untie our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institutions of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

To employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all people.

Have resolved to combine our efforts to accomplish these aims : Accordingly, our respective governments. through representatives assembled in the city of Sanfrancisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form. have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the known as the United Nations."

Preamble to the U. N. Charter—Signed at the U. N. Conference on International Organization, Sanfrancisco, California on June 26. 1945.

আমরা যাহারা আমাদের নিজ নিজ জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি এই সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে সম্মিলিত হইয়াছি, রাষ্ট্রসংঘের সনদ পূর্ণ অবস্থা পোষণ করি এবং এই কারণেই "রাষ্ট্রসংঘ" নামে আমরা এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলাম।"

রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি (Principles and Purposes of the U. N.): রাষ্ট্রসংঘ সনদের ১নং এবং ২নং ধারায় রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি সন্নিবেশিত আছে। রাষ্ট্রসংঘের উদেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, এবং এই উদ্দেশ্যে শান্তি বিঘ্নিত হইবার সমুদয় আশংকা দূর করিবার জন্য এবং প্রতিরোধ করিবার জন্য, আক্রমণাত্মক কাজ এবং শান্তিভঙ্গকারী ব্যবস্থাসমূহ প্রতিরোধ করিবার জন্য, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য কার্যকরী যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

জাতি সমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা

(২) সমান অধিকার এবং জাতিসমূহের আত্মনির্ধারণ নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্তিশীল হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা করা এবং বিশ্বশান্তিকে জোরদার করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ বিস্তৃত করা

(৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা, এবং

(৪) এই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার সমন্বয় করিবার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করাই হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন জাতির উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১নং ধারার যে উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি অর্জন করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিবে বলিয়া সনদে উল্লেখ করা হইয়াছে;—(১) বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবে।

(২) রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সমুদয় অধিকার এবং সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সমুদয় কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) সব সদস্য-রাষ্ট্রই নিজেদের আন্তর্জাতিক বিবাদ এমনভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিবে যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিঘ্নিত না হয়।

(৪) সব সদস্য-রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা অথবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে আক্রমণ করা কিংবা আক্রমণের ভয় দেখানো হইতে অথবা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যের বিরোধী এই জাতীয় কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৫) বর্তমান সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ যাহা কিছু কাজ করিবে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য সব রাষ্ট্রই প্রস্তুত থাকিবে, এবং রাষ্ট্রসংঘ যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেই জাতিকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৬) যে সমস্ত রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে, তাহারাও যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে সেইদিকে রাষ্ট্রসংঘ লক্ষ্য রাখিবে।

সনদে এমন কোন বিধান নাই যাহা অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। তবে যদি দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করিতেছে, তবে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো (Structure of the United Nations)

রাষ্ট্রসংঘ একটি বিশ্বরাষ্ট্র কিংবা অতি-জাতীয় রাষ্ট্র (Super-national State) নয়। রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই সার্বভৌম। রাষ্ট্রসংঘ হইতেছে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলন কেন্দ্র। রাষ্ট্রসংঘের ছয়টি বিভাগ আছে, সেইগুলি হইতেছে, সাধারণ সভা (The General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council), অছি-পরিষদ (The Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

সাধারণ সভা (The General Assembly) : রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৯ নম্বর হইতে ২২ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলি সাধারণ গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সাধারণ সভার গঠন

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ সভা গঠিত হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৩; প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের এক্তিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অথবা রাষ্ট্রসংঘের কোন বিভাগের ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত এই জাতীয় যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা সাধারণ সভায় চলিতে পারে (১০ নং ধারা)। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ পর্যালোচনা করিতেছে সেই সকল বিষয় ছাড়া যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসাকল্পে সাধারণ পরিসদ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নিকট এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করিতে পারে (১০ নং এবং ১২ নং ধারা)। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার নীতিগুলি সাধারণ পরিষদ বিবেচনা করিতে পারে। এই জাতীয় বিবেচনার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ও থাকিতে পারে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারে (১১নং ধারা)। রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত হইলে অথবা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার সহিত সম্পর্কিত যে কোন বিষয় লইয়া সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। সনদের ৩৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এইরূপ কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত কোন বিষয় সাধারণ সভার আলোচনার জন্য প্রেরণ করে তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সভার আলোচনা, রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২২ নম্বর ধারার দ্বারা সীমিত। অর্থাৎ, যদি নিরাপত্তা পরিষদ ইতিমধ্যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা অথবা অনুসন্ধান চালায়, তবে, সাধারণ সভা আর এইগুলি লইয়া আলোচনা করে না। কিন্তু যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হইয়া যাইবার আশংকা থাকে, তবে সেই বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। নিরাপত্তা পরিষদ যে বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতেছে সেইগুলি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি লইয়া সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান, আবার যে মুহূর্তে নিরাপত্তা পরিষদ সেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দেয়, সেক্রেটারী জেনারেলও তাহা তৎক্ষণাৎ সাধারণ সভাকে জানাইয়া দেন। যদি তখন সাধারণ সভার অধিবেশন বন্ধ থাকে, তবে সেক্রেটারী জেনারেল সেই মর্মে সব সদস্য-রাষ্ট্রের নিকট বিজ্ঞপ্তি পাঠান।

সাধারণ সভার ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতা

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ সভা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমোন্নয়নের জন্য অনুশীলন চালাইতে পারে এবং সুপারিশ প্রদান করিতে পারে। তাহা ছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, জাতি-ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাপারেও অনুশীলন করিবার এবং সুপারিশ প্রদান করিবার অধিকার সাধারণ সভার আছে।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১২নং ধারার দ্বারা সীমিত থাকিয়া সাধারণ সভা কোন অবস্থার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জাতিসমূহের সাধারণ কল্যাণের জন্য এবং জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করিতে পারে এই প্রকার সুপারিশ প্রদান করিতে পারে।

সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপোর্ট গ্রহণ করে; এই বিবরণীতে সারা বৎসর ধরিয়া নিরাপত্তা পরিষদ কি কি কাজ করিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকে। শুধু নিরাপত্তা পরিষদই নহে, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টও সাধারণ সভা গ্রহণ করে। অছি-পরিষদ যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ সভার মতামত জানিতে চাহে, তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। সাধারণ সভা সমগ্র রাষ্ট্রসংঘের বাজেট অনুমোদন করে এবং রাষ্ট্রসংঘের মোট ব্যয়ে কোন রাষ্ট্রের কত অংশ থাকিবে তাহা নির্ধারণ করে। কোন বিশেষীকৃত সংস্থার বাজেটও সাধারণ সভা বিবেচনা এবং অনুমোদন করে।

সাধারণ সভায় ভোট প্রদান পদ্ধতি

সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ সভার উপস্থিত এবং ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হওয়া চাই। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, অছি-পরিষদের সদস্য নির্বাচন, কোন সদস্য-রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা রদ করা, কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে বিতাড়িত করা, অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির অধিকার সম্পর্কে অথবা ইহাদের কোন অঞ্চলগুলির বিষয় সমূহের বিচার বিবেচনা করা এবং বাজেট অনুমোদন করা। সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে (যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয় না;—সাধারণ ভাবে ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই প্রস্তাব অনুমোদিত

হয়। যদি কোন সদস্য-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে দেয় টাকা বাকী পড়িয়া যায়, তবে সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সদস্য-রাষ্ট্রকে ভোট প্রদানের জন্য অনুমতি দিতে পারে।

সাধারণ সভার অধিবেশন প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হয়। তাহা ছাড়া, অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইলেও সাধারণ সভার অধিবেশন বসিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণ সভার অধিবেশনের পদ্ধতি সাধারণ সভা নিজেই স্থির করিয়া থাকে এবং প্রতি অধিবেশনের সভাপতি সাধারণ সভাই নির্বাচিত করে। নিজের কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য সাধারণ সভা দরকার হইলে কোন সহকারী সংস্থা গঠন করিতে পারে। অ-স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলগুলির যে সমস্ত বিষয় সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য পেশ করেন, সাধারণ সভা সেইগুলি বিবেচনা করে।

নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council): নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় ১৫ জন সদস্য লইয়া। এই সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য; ইহারা হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন।[৫] অবশিষ্ট ১০টি সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন

অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কোন রাষ্ট্র অবসর গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবে না। প্রথম নির্বাচনের সময় তিনটি সদস্য-রাষ্ট্র এক বৎসরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোট আছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের সাতটি সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদনে গৃহীত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে সদস্য-রাষ্ট্রের সরকার নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রতি মাসে বর্ণনানুক্রমে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের পদ্ধতি কি হইবে তাহা নিরাপত্তা পরিষদই স্থির করে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবই গৃহীত কিংবা অনুমোদিত হইতে পারে না যদি ইহাতে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির যে কোন একটি ভেটো (veto) প্রয়োগ করে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত

ভোট প্রদানের পদ্ধতি

৫। পূর্বে জাতীয়তাবাদী চীন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৭১ সালে চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ এবং সেইসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে।

হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় না। যদি নিরাপত্তা পরিষদ এমন কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে যাহার সহিত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র জড়িত, তবে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার অধিবেশনে সেই সদস্য-রাষ্ট্রকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ যখন কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করে, তখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কাজ হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং যুদ্ধের সমুদয় সম্ভাবনা দূর করা। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সনদের ৪৭নং ধারায় উল্লিখিত সামরিক কমিটির (Military Staff Committee) সাহায্যে নিরাপত্তা পরিষদ কার্যসূচী প্রস্তুত করে। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতির জন্য যাহাতে রাষ্ট্রেও জনসম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় না হয় এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা যাহাতে বজায় থাকে ও দৃঢ়তর হয় সেইজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে।

নিরাপত্তা পরিষদকে ইহার বাৎসরিক বিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে হয়। সাধারণ সভা কোন বিষয়ে কোন প্রকার সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পাঠাইলে নিরাপত্তা পরিষদ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখে।

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান

আন্তর্জাতিক বিবাদেব শান্তিপূর্ণ সমাধানে (Pacific Settlement of Disputes) নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলি প্রথমে আলাপ আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ, বিচার, বিচারবিভাগীয় মীমাংসা, আঞ্চলিক এজেন্সী অথবা আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবে। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব হইতেছে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে অনুরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা। আন্তর্জাতিক কলহের কারণ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের আছে, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অনুসন্ধান করিয়া দেখে, আন্তর্জাতিক কলহের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কতটা বিঘ্নিত হইতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এমন রাষ্ট্রও যে কোন আন্তর্জাতিক কলহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই জাতীয় কলহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিরাপত্তা পরিষদ দিতে পারে। তবে নিরাপত্তা

পরিষদ যদি মনে করে যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কলহের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান জড়িত, তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট প্রেরিত হয়।

কোন জাতি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট করিতেছে কিনা এবং কোন কাজ আক্রমণাত্মক হইতেছে কিনা তাহা নিরাপত্তা পরিষদ বিচার করিয়া থাকে। এই আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সনদের ৪০নং ধারা অনুযায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য কতিপয় নীতি অবলম্বন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। যদি যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছে এই প্রকার রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধেও আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ না করে তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ সেই দেশগুলিতে যুদ্ধের নিবৃত্তির জন্য সেনাবাহিনী পাঠাইতে পারে, এবং এই কাজে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক কমিটির (Military Staff Commitee) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সামরিক কমিটি গঠিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের প্রতিনিধিদের লইয়া। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদের পরামর্শে রাষ্ট্রসংঘ ভারত-পাক সীমান্তে তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিল। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কঙ্গোয় শান্তি-স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ারিং মিশন ইস্রায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাতের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বশান্তি রক্ষার পরিপন্থী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটোপ্রয়োগ করায় ২২ বৎসর যাবৎ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইতে পারে নাই। বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার পথেও চীন বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমাবর্ষণ নিরাপত্তা পরিষদে এখনও পর্যন্ত নিন্দিত হয় নাই এবং তাহারও পিছনে রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগ। রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সমতার নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, তাহা যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নাই বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকার দরুন। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভূমিকা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন বিশ্বশান্তি

আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্টকারী এবং আক্রমণাত্মক কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের নীতি

রক্ষার সমুদয় দায়িত্ব একমাত্র তাহাদেরই ; ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির এই কর্তৃত্ব কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহা বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘের সনদে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে অথবা অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় যৌথভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যৌথ-প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান আছে। এইজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি গঠিত হইতে পারে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন (S. E. A. T. O.), উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন (N. A. T. O.), ওয়ারস শান্তি চুক্তি (Warsaw Peace Pact), মধ্য এশিয়া চুক্তি সংগঠন (CENTO) প্রভৃতি চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিরোধী নহে। অবশ্য এই জাতীয় চুক্তি বিশ্ব-শান্তি রক্ষার কতটা সহায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা এই চুক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) : রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১৮ এবং এই সদস্য-রাষ্ট্রগুলি সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। প্রথম নির্বাচনের সময় ১৮টি নির্বাচিত সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে, ছয়টি নির্বাচিত সদস্য-রাষ্ট্র দুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিলে ইহাদের ক্ষেত্রে নূতন ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র নির্বাচিত হয়। ইহার পর হইতে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য এবং প্রধান কাজ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য ও কাজ

এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে রাষ্ট্রসমূহের জীবনধারণের উচ্চমান বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ সুগম করা। তাহা ছাড়া, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যাহাতে মানবিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিকেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সচেষ্ট হইতে হয়। এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির সহিত (যেমন U. N. E. S. C. O., F. A. O. W. H. O., প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। এই সংস্থাগুলির কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করিবার অধিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আছে। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির মর্যাদা যাহাতে বজায় থাকে এবং সেইগুলি যাহাতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘের সনদে করা হইয়াছে ; অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্যতম কাজ হইতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে অধিকারগুলি যাহাতে পূর্ণ মর্যাদায় বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা। তাহা ছাড়া, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশনগুলির (Regional Economic Commissions) ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করাও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের কাজ। বিশ্বব্যাংক-এর (World Bank) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ কতটা সুগম করিতেছে তাহা দেখার দায়িত্বও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের।

অছি-পরিষদ (The Trusteeship Council) :—রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৭৫ হইতে ৯১ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলিতে অছি-পরিষদ সম্পর্কিত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাহারা অছি অঞ্চলের প্রশাসনব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় সেই সকল সদস্য-রাষ্ট্র, অছি-শাসক দেশ এবং মনোনীত সদস্য-রাষ্ট্রগুলি লইয়া অছি-পরিষদ গঠিত। অছি-শাসক দেশ নহে এইরূপ সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যার মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য যে কয়জন সদস্যকে মনোনীত করা প্রয়োজন, তাহাদের সাধারণ সভা মনোনীত করিয়া থাকে।

অছি-ব্যবস্থাধীন অঞ্চলগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা কি ভাবে চলিতেছে সেই সম্পর্কিত সমুদয় রিপোর্ট বিবেচনা করার দায়িত্ব হইতেছে অছি-পরিষদের। তাহা ছাড়া, অছি-শাসিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত আবেদন পত্র বিবেচনা করাও অছি-পরিষদের কাজ। অছি-পরিষদ মাঝে মাঝে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে এবং অছি সম্পর্কিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত সেই ব্যবস্থাগুলি অছি-পরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত হয়।

অছি-পরিষদে সব সদস্যেরই একটি করিয়া ভোট থাকে এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যেই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অছি-পরিষদের অধিবেশনে কি নিয়ম অনুসৃত হইবে তাহা অছি-পরিষদ নিজেই স্থির করে। প্রয়োজনবোধে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির উন্নতির জন্য অছি-পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে।

ভোট প্রদান পদ্ধতি

সর্বপ্রথম এগারটি অছি-শাসনাধীন অঞ্চল ছিল, এবং সেইগুলির মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল চারিটি, পূর্ব আফ্রিকায় ছিল তিনটি এবং চারিটি ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আটটি অছি অঞ্চল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকায় গোল্ডকোস্ট ও ব্রিটিশ টগোল্যাণ্ড সংযুক্ত হইয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহা পূর্বে একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল। ১৯৬৩ সালেও নিউগিনি একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল; পরে ইহা স্বাধীন হয়। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দ্বারা শাসিত যে সকল দেশ এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই, রাষ্ট্রসংঘের সনদে সেই দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাহীন অঞ্চল রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (সনদের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর ধারা)।

অছি-শাসিত অঞ্চল

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice) : রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিচার বিভাগ হইতেছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice)। পূর্বে জাতিসংঘের অধীনে যে বিচারালয় ছিল তাহাকে বলা হইত আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (The Permanent Court of International Justice)। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি পূর্বেকার আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত কর্তৃক অনুসৃত নিয়ম-কানুনের উপর ভিত্তিশীল।

রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এই প্রকার কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে কিনা কিংবা কি কি শর্তে হইতে পারিবে তাহা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা স্থির করিয়া থাকে। রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোন সদস্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া না চলে তবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ বা রায় কিভাবে বাস্তব রূপ পাইতে পারে সেই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ প্রদান করে কিংবা ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ

শুধু আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করাই নহে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করিতে পারে। যদি কখনও সাধারণ সভা কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আইনগত উপদেশ চাহে, তবে আন্তর্জাতিক

বিচারালয় সেই ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। মনে রাখিতে হইবে যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্যই সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেইজন্য কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে যে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারায় এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়।

উপদেষ্টা হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিবেচনা করে। (১) আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা, (২) আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন, (৩) এমন কোন বিষয় যাহা আন্তর্জাতিক আনুগত্যের প্রশ্নে ক্ষতিকারক, (৪) আন্তর্জাতিক চুক্তিভঙ্গে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নয়জন বিচারক উপস্থিত থাকিলে কোরাম হয় এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হইলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিয়া থাকেন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভূমিকা আলোচনা করিলে যে জিনিসটি প্রথমেই মনে হয় তাহা হইতেছে বৃহৎ শক্তিগুলিকে এই বিচারালয়ের অধীনে আনা যায় কিনা। উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমা বর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া মনে করে এবং এইজন্য এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিজস্ব নির্দেশ দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর লইয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ভারত নিজের আভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করিলেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আদালতের কতটা ক্ষমতা আছে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।[৬]

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মূল্যায়ন

কিন্তু, আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যারই মীমাংসা করে নাই, তাহা নহে। ইরাণ ও ব্রিটিশ-ইরাণ অয়েল কোম্পানীর বিরোধ, ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে সুয়েজখাল বিরোধ, কচ্ছ লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ, প্রভৃতি

৬। এইজন্য স্যুম্যান (Schuman) বলিয়াছেন, "The great controversies are questions of power admitting of no settlement through the application of law. They can be resolved only by diplomatic bargaining and compromise or by war, and in other way whatever."

ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল।

রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরখানা ও সেক্রেটারী জেনারেল (Secretariat and the General)ঃ রাষ্ট্রসংঘের সনদে দপ্তরখানা একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ কার্যালয় নিউইয়র্ক সহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া জেনেভা, ব্যাংকক, হেগ্, মণ্ট্রিল প্রভৃতি স্থানেও রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তরের কতিপয় বিভাগ আছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান বিভাগে প্রায় ১৮০০০ কর্মী কাজ করেন। শুধু অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ১৬০০০ কর্মী কাজ করেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের মোট আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ খরচ করা হয় সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপে।

রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তরের প্রধান হইতেছেন প্রধান সম্পাদক (Secretary General)। তাঁহার পদমর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘ সনদের ৯৭নং ধারায় প্রধান সম্পাদককে প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে এবং ৯৯নং ১০০নং ধারায় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে প্রধান সম্পাদক রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার কাজে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইতে চাঁদা আদায় করা ও সেই অর্থের যাহাতে ঠিক ব্যবহার হয় তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রধান সম্পাদকের কাজ। প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন সাধারণ সভা কর্তৃক। প্রধান সম্পাদক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার কাজে রাষ্ট্রসংঘকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার কাজেও প্রধান সম্পাদকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক দাগ হ্যামারশীল্ড কঙ্গো সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের তদানীন্তন প্রধান সম্পাদক উ থাণ্ট (U. Thant) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং তাঁহারই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম

রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আগে পূর্বতন পূর্বপাকিস্তানে যখন পাকিস্তানী জঙ্গীশাসকগণ ব্যাপক গণহত্যা অত্যাচার ও জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল এবং যখন এক কোটি অত্যাচারিত লোক বাংলাদেশ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল তখন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এই ব্যাপক গণহত্যা, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক দর্শকের কাজ করিয়াছিল।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা (Role of the U. N. in maintaining world peace)ঃ রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যগুলি খুবই মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের যে তৎপরতা, আন্তরিকতা এবং ভূমিকা উচিত ছিল তাহা নাই। আন্তর্জাতিক কলহ, ঠাণ্ডা লড়াই (cold war), বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেষারেষি প্রভৃতি দূর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। তবে অ-রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার পথ আরও সুগম করিতে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষভাবে সফল হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা

রাষ্ট্রসংঘের নীতি হইতেছে সব সদস্যরাষ্ট্রের সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া। অথচ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্যপদ অলংকৃত করিয়া আছে এবং যে কোন প্রস্তাব নিজের পছন্দ অনুযায়ী না হইলে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ, প্রজাতন্ত্রী চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভেটো প্রয়োগ করার ফলে ২২ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ লাভ করিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্রী চীনের ক্রিয়া-কলাপ হয়ত অনেকেই পছন্দ করেন না, আবার হয়ত কেহ কেহ পছন্দ করেন। কিন্তু এজন্য পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেশটিকে (যাহার লোকসংখ্যা সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী) ইহার সৃষ্টির পরেও ২২ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চীন ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশকে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম দেশ বলিয়া স্বীকার করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ারও কোন যুক্তি ছিল না। আবার রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লইয়া চীনের বিরোধিতা কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কোনদিনই প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃহৎ পঞ্চশক্তির হাত হইতে ভেটো ক্ষমতা তুলিয়া

লওয়া হয়। উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা বর্ষণ লইয়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিতর্ক হয় নাই, কেননা, সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করিত। অথচ কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল হইতে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোন্ দেশ আক্রমণকারী এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ ভঙ্গকারী, সেই দেশের কি শাস্তি হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ আজ পর্যন্তও কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ, ইরাণ ও ব্রিটেনের মধ্যে তৈল লইয়া বিরোধ, সুয়েজখাল লইয়া মিশরেব সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ, কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ, আরব ও ইস্রাইলের মধ্যে সংঘাত, দক্ষিণ আফ্রিকা রোডেশিয়ায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব এবং কৃষ্ণকায় লোকদের সেই সরকারের উপর অমানুষিক অত্যাচার, প্রভৃতি কোন বিষয়ের সমাধানেই রাষ্ট্রসংঘ এমন কোন নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারে নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘের হাতে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া বিশ্বের সব রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রাষ্ট্রসংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভেটো প্রদত্ত হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকর হইতে পারে নাই। রাষ্ট্রসংঘের নিদারুণ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইয়াছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গণহত্যা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, নারীর উপর অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়া সর্বত্র নিজেদের বর্বরতার চিহ্ন রাখিয়াছিল, তখন রাষ্ট্রসংঘ মানব-অধিকারের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিরীহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণহত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য দূরে থাকুক, একটি প্রতিবাদসূচক উক্তিও করে নাই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশ এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশও তখন পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘ ইহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু এই জাতীয় কোন ঘটনা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোন বৃহৎ শক্তির দেশে হইত, তবে কি রাষ্ট্রসংঘ চুপ করিয়া থাকিত? এজন্যই বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতার উপর বিশ্বের সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

পঞ্চশক্তির হাত হইতে ক্ষমতা তুলিয়া না লওয়া পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হইবে না

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের তৎপরতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নির্ভর করে বৃহৎ শক্তিগুলির

তৎপরতা এবং নিষ্ক্রিয়তার উপর, এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর। এইজন্য অরগ্যানস্কি (Organski) তাঁহার "World Politics" বইয়ে বলিয়াছেন, "···It is the policies and interests of the great powers that explain the action or inaction of the United Nations." ভিয়েতনামে অসামরিক জনসাধারণের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণ এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মানবিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা—ইহার কোনটিই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিহত করিতে পারে নাই।

রাষ্ট্রসংঘের কাজের ভাল দিক

রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতার দিক আলোচনা করিলেও ইহার ভাল দিকটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; আণবিক শক্তির অনেক উন্নয়ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। তবুও আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কোন সম্ভাবনা আছে কি না। অন্ততঃ রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব এইটুকু যে পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতটা সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার অভাব ছিল, তাহা রাষ্ট্রসংঘ অনেকাংশে দূর করিতে পারিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের (League of Nations) সদস্য ছিল না; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও বহু পরে জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক পরিমাণে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছে। পৃথিবী হইতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার যে নূতন স্বাধীন দেশগুলির জন্ম হইতেছে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি যে বর্তমানে নূতন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা রাষ্ট্রসংঘের ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছে। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ দিবসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "With all its defects, with all the failures that we can check up against it, it still represents man's best organized hope to substitute the conference table for the battlefield."

রাষ্ট্রসংঘের সাফল্য হইতেছে এই ক্ষেত্রে যে ইহা আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অন্ততঃ বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত হইয়া বসিবার এবং পারস্পরিক অভিযোগগুলি যাচাই করিবার সুযোগ দেয়। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সহকারী সংস্থা (The Auxiliary Organs of the U. N.) : রাষ্ট্র সংঘের ১৪টি সহকারী সংস্থার নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

( ) **আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা** (International Atomic Energy Association)—এই সংস্থার কাজ হইতেছে বিশ্বশান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির সদ্ব্যবহার করা। ১৯৫৭ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(২) **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা** (International Labour Organisation)—এই সংস্থা হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রাচীন সংস্থা। ইহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২৪ ; সম্প্রতি বাংলাদেশও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইবার পূর্বেই এই সংস্থার সদস্য হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে একই প্রকার শ্রম-আইন প্রণয়ন করা এবং বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(৩) **খাদ্য ও কৃষি সংস্থা** (Food and Agricultural Organisation) এই সংস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বন সম্পদের সদ্ব্যবহার, ক্ষুধার তাড়না দূরীকরণ, প্রভৃতি কাজে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করে। এই সংস্থার কার্যালয় রোমে অবস্থিত।

(৪) **রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা** (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)—বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি নিষ্ঠা জাগাইয়া তোলা এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে প্যারিসে।

(৫) **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা** (World Health Organisation)—রাষ্ট্র সংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই এই সংস্থার সদস্য। এই সংস্থার কাজ হইতেছে বিভিন্ন দেশ হইতে যাহাতে সংক্রামক ব্যাধির উচ্ছেদ হয় সেইজন্য চেষ্টা করা ; জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সংস্থা সর্বতোভাবে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করে। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে জেনেভায়।

(৬) **পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক** (International Bank for Reconstruction and Development)—এই সংস্থা সাধারণতঃ বিশ্ব ব্যাংক নামে পরিচিত। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে যে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের সাহায্য করা এবং অনগ্রসর দেশগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য

করাই এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য। অনগ্রসর দেশগুলিকে বৈদেশিক মূলধন দিয়া সাহায্য করার ক্ষেত্রে এই ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে। এই ব্যাংকের কার্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট অফ্ কলম্বিয়ার ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

(৭) **আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা** (International Finance Corporation)—এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে; ইহা বিশ্ব ব্যাংকের শাখারূপে কাজ করে। এই সংস্থার কাজ হইতেছে অনগ্রসর দেশগুলিতে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে অর্থ সাহায্য করা। এই সংস্থার কার্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

(৮) **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা** (International Development Association)—এই সংস্থাটিও বিশ্ব ব্যাংকের একটি এজেন্সী হিসাবে কাজ করে। অনগ্রসর দেশসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য, বিশেষতঃ, নদী উপত্যকা, জল সরবরাহ ও রাজপথ নির্মাণ, প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য এই সংস্থা হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে ওয়াশিংটনে।

(৯) **আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা** (International Civil Aviation Organisation)—এই সংস্থার কাজ হইতেছে অসামরিক বিমানের আন্তর্জাতিক চলাচল আরও সহজ ও নিরাপদ করা। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে মণ্টি্রলে।

(১০) **আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন** (International Postal Union)—আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের প্রধান কাজ হইতেছে সুষ্ঠু ভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ডাক পরিবহণের ব্যবস্থা করা। এই সংস্থার কার্যালয় বার্ণি-তে (Berne) অবস্থিত।

(১১) **আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগ ইউনিয়ন** (International Tele-Communication Union)—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সুষ্ঠু ভাবে বেতার-তরঙ্গ অন্যত্র পাঠাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইতেছে এই সংস্থার। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগণ এই সংস্থারও সদস্য।

(১২) **বিশ্ব আবহ সংস্থা** (World Metereology Organisation)—বিভিন্ন দেশে আবহ তথ্যাদি যাহাতে সহজ উপায়ে এবং দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকে বিশ্ব আবহ সংস্থা। এই সংস্থার অন্যতম কাজ হইতেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা উন্নত করা। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(১৩) **আন্তঃসরকার সমুদ্রযাত্রা উপদেষ্টা সংস্থা** নামে একটি সংস্থায় ১৯৫৯ সাল হইতে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ করা এবং জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাইতেছে। এই সংস্থার কার্যালয় লণ্ডনে অবস্থিত।

(১৪) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শুল্ক চুক্তি** (General Agreement of Trade and Tariff)—এই সংস্থার কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার শুল্ক প্রাচীর (Tariff barriers) কমাইয়া দিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করা। ৪৪টি দেশ একটি চুক্তির মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার** (International Monetary Fund) রাষ্ট্রসংঘের অধীন নয় বলিয়া ইহাকে রাষ্ট্রসংঘের সহকারী সংস্থার তালিকাভুক্ত করা হয় নাই ; এই সংস্থা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। তবে বিশ্ব ব্যাংকের যাহারা সদস্য তাহাদের আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারেরও সদস্য হইতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য নহে, বিশ্বব্যাংকেরও সদস্য নহে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, মুদ্রা বিনিময় নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ নীতির অবসান করা, এক দেশের মুদ্রার সহিত অপর দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যাহাতে সহজভাবে নিরূপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং অনগ্রসর দেশগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করাই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মুখ্য কাজ। এই সংস্থার প্রধান সদর কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত।]

রাষ্ট্রসংঘের সনদের কি সংশোধন হওয়া উচিত? (Should the U. N. Charter be revised ?)—রাষ্ট্রসংঘ যাহাতে আরও ভালভাবে ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করিতে পারে সেইজন্য ইহার সনদের নিম্নলিখিত সংশোধন হওয়া উচিত,—

কোন রাষ্ট্রেরই স্থায়ী সদস্যপদ থাকা উচিত নহে

(১) নিরাপত্তা পরিষদে কোন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র থাকা উচিত নহে ; এগারটি সদস্য-রাষ্ট্রকেই সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রসংঘের সব রাষ্ট্রেরই সমান মর্যাদা থাকা উচিত।

নিরাপত্তা পরিষদে কোন রাষ্ট্রেরই ভেটো ক্ষমতা থাকা উচিত নহে

(২) নিরাপত্তা পরিষদে কোন সদস্য-রাষ্ট্রেরই ভেটো ক্ষমতা থাকা উচিত নহে। একান্তই যদি ভেটো ক্ষমতা রাখিতে হয়, তবে ইহার প্রয়োগ খুবই সীমিত করা উচিত। একমাত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিবার জন্যই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত,—এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন করা যাইতে পারে।

স্বাধীন সব রাষ্ট্রকেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত

(৩) একটি বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক কারণে কোন দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। প্রজাতন্ত্রী চীনকে ২২ বৎসর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। এই প্রকার নিয়ম থাকা উচিত যে যখনই কোন দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এবং সাধারণ সভার একটি বিরাট অংশ সেই দেশকে স্বীকার করিয়া লয় তখনই সেই দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

• রাষ্ট্রসংঘ সনদের
• সংশোধন পদ্ধতি

(৪) রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন করিতে হয় তবে ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয় এবং সেই প্রস্তাবটি সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হইতে হয়। ইহার পর প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরিত হয় এবং সেখানে সব স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক ইহা সমর্থিত হইতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রসংঘ সনদের কোন বিধান সংশোধিত হইতে পারে।

দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের একমত হওয়ার উপর। এই পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একটি রাষ্ট্রও ভেটো প্রয়োগ করে তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদটি সংশোধিত হইতে পারিবে না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা, একটি রাষ্ট্রের একক ইচ্ছার উপর রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন হওয়া বা না-হওয়া নির্ভরশীল থাকা উচিত নহে।

Exercise

1. রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন নীতি আলোচনা কর।
[Discuss the purposes and the principles of the U. N.]

2. রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।
[Discuss the composition and functions of the General Assembly of the United Nations.]

3. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার মাধ্যম হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদ গঠন ও কার্যাবলী পরীক্ষা কর।

[Examine the composition and functions of the Security Council as a medium of maintaining international peace and security.]

4. টীকা লিখ :—

(ক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, এবং (খ) আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

[Write Notes on :—

(a) The Economic and Social Council, and (b) The International Court of Justice.]

5. অছি পরিষদের উপর একটি টীকা লিখ।

[Write a note on the Trusteeship Council.]

6. জাতিপুঞ্জের গঠন ও ভূমিকার একটি বিবরণী দাও। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল কেন ?

[Give an account of the structure and the role of the League of Nations. Why did it fail to avert the Second World War ?]

7. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকা পরীক্ষা কর।

[Examine the role of United Nations in maintaining international peace and security.]

8. রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা ও সাফল্যের উপর একটি টীকা লিখ।

[Write a note on the failures and achievements of the United Nations Organisation.]

9. রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন সহকারী সংস্থার একটি বিবরণী দাও।

[Give an account of the auxiliary organs of the United Nations]

10. তোমার মতে রাষ্ট্রসংঘের সনদ কিভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত।

[How should the U. N. Charter, in your opinion, be revised ?]

সপ্তম অধ্যায় | আইন ও অধিকার
(Law and Liberty)

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law) : "আইন" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (Social Law) মানিয়া চলে, অথবা সভ্য জীবন-যাপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন (Ethical Law) পালন করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক।

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অষ্টিনের মতে আইন হইতেছে সার্বভৌমত্ব আদেশ। অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তি হইতেছে একটি "উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ ("a determinate human superior")। জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের আদেশকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মতে অষ্টিনের দেওয়া সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত প্রথা (conventions or traditions) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হইতে কিছু না কিছু আইনের সৃষ্টি হয়। অষ্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী সেইগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টিনের সমর্থকগণ অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহাদের মতে আইন হইতেছে সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বারা কার্যকর করেন। উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তা এবং স্বভাবের সেই অংশ যাহা কতিপয় একধরণের নিয়মের মাধ্যমে সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা কার্যকর হইয়াছে।[১]

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

হল্যাণ্ডের (Holland) মতে আইন হইল মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়।[২]

১। **"Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."—*Wilson.***

২। **"Law is a political rule of external action enforced by a sovereign political authority".—*Holland.***

উড্রো উইলসনের মতে আইন কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নহে, ইহা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ সুযোগ অথবা দুর্দশার সৃষ্টি।[৩]

আইনের উৎস (Sources of Law): আইন যে সর্বদাই রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহা নহে। আইনের সৃষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে পারে; যেমন সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়পরতা, আইনবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

১। **প্রথা** (Custom): বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীনকালে প্রথার সাহায্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার চেষ্টা করা হইত।

'প্রথা' হইতেছে আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস

এই প্রথার সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে প্রথা হইতেছে আইনের উৎসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ধর্মের ভয়েই হউক বা অপরকে অনুকরণ করিয়াই হউক কিংবা প্রথা পালন করিবার উপযোগিতার জন্য হউক, প্রাচীনকালে জনসাধারণ অধিকাংশ প্রথাই মানিয়া চলিত।

এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশে সৃষ্ট হয় না। এমনকি আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র নহে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেইগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না।

২। **ধর্ম** (Religion): শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অনুশাসনও অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। সমাজ-জীবনে শৃংখলা আনয়নে ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পুরাকাল হইতেই

৩। **"Law is the creation, not of individual, but of special needs, the specia opportunities, special perils or misfortunes of the communities."—Wilson.**

ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। বর্তমান-কালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে উত্তরাধিকার আইন (Succession Act) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা হইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব সূচিত করে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনের সাহায্যে কয়িয়াছে। প্রথম যুগে রোমান আইনগুলিও (Roman Laws) কতিপয় ধর্মীয় সূত্র ছাড়া কিছু ছিল না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে ধর্ম কর্তৃক আইন প্রভাবিত হইয়াছে

৩। **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত** (Adjudication or judicial interpretation): আদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনেক সময়ে নূতন আইনের সৃষ্টি করে। যখন কোনও আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না অথবা কোন আইনের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার হয় না, তখন বিচারকগণ সেই সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন অথবা নূতনভাবে আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা যদি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা নূতন আইনেপরিণত হয়।

বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত আইনের উৎস

৪। **ন্যায় বিচার** (Equity): শুধু আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করাই নহে, বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (Justice) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ীও কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের আইন যে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে ন্যায়পরতাব অভাব থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

ন্যায় বিচার

৫। **আইনবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** (Scientific discussions of the Jurists): অনেক সময় আইনবিদ্‌গণের মিলিতভাবেবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই ব্যাখ্যা যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় তবেই ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনকালেও সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের মর্যাদা লাভ করিত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মনু-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি।

আইনবিদ্‌গণের আলোচনা

৬। **আইনসভা** (Law-making body) ঃ বর্তমানকালে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভা। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা প্রণীত আইন সার্বভৌম কর্তৃক কার্যকর হয়, আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রথম উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা প্রচলিত প্রথা ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না।

আইনসভা

ওপেনহিম্ (Oppenheim) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস আছে, তাহা হইতেছে, সমাজের সাধারণ সম্মতি। জনগণের সাধারণ সম্মতিই বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহার, ন্যায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ধরণের আইন (Different types of Law) ঃ আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমরা দেখিয়াছি। এখন আমরা দেখিব, আইন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে।

আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ উৎস হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আইনটি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কিনা তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আইন (Private Law) বলি। সরকারী আইন (Public Law) রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট। আইনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমরা সাধারণ আইন (Common Law), সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law), পৌর আইন (Municipal Law), শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law), ফৌজদারী আইন (Criminal Law), আইনসভা প্রণীত আইন (Statutes) এবং অর্ডিন্যান্সের (Ordinance) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। নিম্নে অঙ্কিত তালিকা হইতে আইনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে।

আইন

- স্বাভাবিক আইন (Natural Law)
- রাষ্ট্রনৈতিক আইন (Political Law)
  - আন্তর্জাতিক আইন (International Law)
  - পৌর আইন বা জাতীয় আইন (Municipal Law or National Law)
    - শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law)
    - সাধারণ আইন (Ordinary Law or Common Law)
      - সরকারী আইন (Public Law)
        - শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law)
        - অবিশেষক আইন (General Law)
      - ব্যক্তিগত আইন (Private Law)

সংবিধানে দেশের শাসন সম্পর্কিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পারিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে পরস্পারের সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে আমরা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক বিচার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law)। অপরাধ-সংক্রান্ত অথবা অপরাধ অনুযায়ী অপরাধী-গণকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি ফৌজদারী আইন অথবা দণ্ডবিধি (Criminal Law)। যখন বিভিন্ন প্রথা হইতে উদ্ভূত আইন

সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া লয় এবং অন্যান্য আইনের ন্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ আইন (Common Laws) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন্ নীতি অনুযায়ী চলিবে, সে সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতে রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য হইতেছে এই যে আন্তর্জাতিক আইন যদি কোনও রাষ্ট্র পালন না করে, তবে কোন আদালতে আইনভঙ্গকারীরূপে ইহার বিচার হইতে পারে না তবে বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, যে কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অথবা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে পারে, যদিও নিজের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। হল্যাণ্ডের মতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হইয়াছে এই প্রকার প্রচলিত আইনকে পৌর আইন (Municipal Law) বলা যাইতে পারে। কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন (Statutes) বলিতে পারি। আবার জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে একটি আদেশ (Ordinance) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে পরিগণিত হয়। আইনের বিধান (Rule of Law) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে, (১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ আদালতের এলাকাধীন। আইন ভঙ্গ না করিলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না। ইংলণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে।

স্বাভাবিক আইন (Natural Law) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ এবং পরিণতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পারি। গাছ হইতে আম মাটিতে পড়ে, ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় না। প্লেটো এবং এরিষ্টটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের মতে মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। অথচ,

স্বাভাবিক আইন
(Natural Law)

প্রকৃতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানবীয় আইন স্বাভাবিক আইনের ন্যায় সম্পূর্ণ ইহা মনে করা অনুচিত। হবস্, লক এবং রুশোও স্বাভাবিক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা বিভিন্ন। যে সকল আইন সামাজিক জীবনে সকলেই মানিয়া চলে, সেইগুলিকে সামাজিক আইন (Social Laws) বলা যয়। নৈতিক আইন (Moral Laws) বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই,—ইহা একটি নৈতিক আইন। রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম আইন,—সেইজন্যই প্রয়োজন হইলে ইহা নীতিশাস্ত্র বিবর্জিত হইতে পারে। যখন কোন নিয়ম মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয়, তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত আইন বলি।

নৈতিক আইন
(Moral Law)

আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন হিসাবে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আইন নহে; কেননা, কোন রাষ্ট্রই আইনতঃ আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। তবুও প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের একটি অনুমোদন (Sanction) সমগ্র বিশ্বের জনমত। সেদিক হইতে 'আন্তর্জাতিক আইন' কথাটি আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। কারণ ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি কার্যকর করে না।

আন্তর্জাতিক আইন
(International Law)

ম্যাক আইভার প্রমুখ লেখকগণ আইনকে দুইভাগে বিভক্ত করেন; যথা—জাতীয় আইন (National Law) এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) এবং সাধারণ আইন (Ordinary Law) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ আইনকে পুনরায় সরকারী আইন (Public Law) এবং বে-সরকারী আইন (Private Law) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। সরকারী আইন পুনরায় শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত আইন (General Law) এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমোক্ত আইন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে এবং শেষোক্ত আইন রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে।

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law): আইনের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে আইন হইতেছে একটি অথবা কতিপয় নিয়ম যাহা শুধু মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা কার্যকর হয়। আইনের প্রকৃতি লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অষ্টিনের মতে আইন হইতেছে নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ মাত্র ("Law is the command of the sovereign")। এই মতবাদ বিশ্লেষণী আইনবিদগণ (Analytical jurists) গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্লেষণ-পন্থী লেখক হল্যাণ্ডের (Holland) মতে আইন হইতেছে মানুষের বাহিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।[8] ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া গণ্য করা অথবা সব আইনই সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক। কারণ এমন অনেক আইন আছে যেগুলি সম্পূর্ণ প্রথাগত (conventional) এবং যেগুলি কখনই সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু এই মতবাদের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা মনে করেন, যে সকল প্রথা আইনের মর্যাদা লাভ করে সেইগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় বলিয়াই আইনের মর্যাদা লাভ করে। সমাজে অসংখ্য প্রথা আছে যেগুলি সর্বদা স্পষ্ট অথবা গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য আইনের দৃষ্টিতে সেই প্রথাগুলিই আইনের মর্যাদা লাভ করে যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। সুতরাং আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয়।

আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন আইনের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "আইন হইতেছে মানুষের সুপ্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয় এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকে।[5] আইন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়াই ইহা অমান্য

৪। "A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority."—Holland.

৫। "Law is that portion of the established thought and habit which has found a distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the Government."

করিলে শাস্তির ভয় থাকে। প্রতিটি আইনের পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগ।[৬] অধ্যাপক বার্কারের মতে আইনকে শুধু রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা অনুমোদিত এবং এবং প্রযুক্ত হইলেই চলিবে না, ইহাকে বিধি সম্মত এবং যুক্তিসঙ্গতও হইতে হইবে। এইজন্য ইহার (১) বৈধতা (validity) এবং (২) নৈতিক মূল্য (value) থাকা চাই।[৭] হল্যাণ্ড এবং উইলসন আইনের বৈধতার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বার্কার আইনের মূল্যায়নের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইক্ষেত্রে বার্কারের সহিত অধ্যাপক লাস্কির মতৈক্য দেখা যায়। লাস্কিও মনে করেন, আইনের প্রকৃতি এইরূপ হওয়া উচিত যেন ইহা জনসাধারণের সক্রিয় চাহিদাকে (effective demand) পূরণ করিতে পারে; অর্থাৎ, আইন যেন জনসাধারণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। আইন শুধু বৈধ (valid) হইলেই চলিবে না; ইহাকে জনগণের উপযোগী এবং জনগণের নিকট সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে। তবেই ইহা আদর্শ আইনে পরিণত হইবে। এইজন্য আইনকে জনসাধারণের আশা-আকাংখা অনুযায়ী সম্পাদিত হইতে হইবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য হইতে হইবে সকলের কল্যাণ সাধন করা তবে আইন রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়াই ইহার বৈধতা বজায় থাকে, এবং ইহার বিশেষ নৈতিক মূল্য থাকিলেই জনগণ সক্রিয়ভাবে ইহা পালন করে। বার্কার বলেন, আইনের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই, অর্থাৎ আইনের বৈধতা এবং মূল্য আছে বলিয়াই ইহা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং কার্যকর হয়।[৮]

আইনের বৈধতা এবং নৈতিক মূল্য—আদর্শ আইনের দুইটি উপাদান

উড্রো উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়।[৯] মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা মানুষেরই সৃষ্ট আইনের মধ্যে রূপ পায়। কোন দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করিলে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিষ্টতার পরিচয় পাই। আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা আইনের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই।

৬। "The last resort of enforcement lies behind law.—Mac Iver.

৭। "Ideally law ought to have both validity and value".
—Barker, Principles of Social and Political Theory, P. 191.

৮। "...It is only because law, as a whole and in its general nature, possesses both attributes that it actually operates and is actually effective."—Barker.

৯। "Law is a mirror of conception. It is an active force which has got a physical and an ethical compulsion."—Wilson.

একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন রূপ (Generality)। আইন সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও বর্তমানকালে আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড় ছোট, সকলেই সমানভাবে আইনের অধীন।[১০] দ্বিতীয়তঃ আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে। আইনের বাধ্যবাধকতা ইহার বৈধতার পরিচায়ক। আইন যদি বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে ইহা পালন করিতে জনসাধারণ বাধ্য। অর্থাৎ, লোকে আইন পালন করিতে বাধ্য হয়। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে। ইহা হইতেছে শারীরিক বাধ্যবাধকতা (Physical Compulsion)। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ নৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে আইনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা (Ethical Compulsion)। কিন্তু যখন মানুষ আইন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় নেয় এবং অপরের স্বাধীনতা খর্ব করে, তখনই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সামাজিক আইন (Social Laws) এবং রাজনৈতিক আইনের (Political Laws) কতিপয় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আইন যতটা জোর করিয়া কার্যকর করা যায়, সামাজিক আইন কার্যকর করিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ জোর করিতে হয় না। বিভিন্ন সংঘের আইন সেই পরিমাণেই কার্যকর হয় যে পরিমাণে জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে; যদি জনসাধারণ তাহা গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির সদস্যপদ ছাড়িতে হয়। বিভিন্ন সংঘের আইন বাধ্যতামূলক নহে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন সর্বদা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রীয় আইন কোন সময়েই অমান্য করা যায় না।

আইনের সার্বজনীন রূপ এবং বাধ্যবাধকতা

আইনের অনুমোদন (Sanction of Law): আইনের অনুমোদনের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" এই মতবাদে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের মতে আইনের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল ঐশ্বরিক বিধান। অর্থাৎ যেহেতু রাজা আইন প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেইজন্য আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, বর্তমানে সেই মতবাদ গৃহীত হয় না। কাণ্ট, হেগেল, প্রমুখ আদর্শ-

আইনের অনুমোদন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

১০। "Because it is general in its application the law of the State must be compulsive; because it is external in its injunction the law of the state can be compulsive."—Mac Iver, The Modern State, P. 263.

বাদীদের মতে আইন অনুমোদনের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাবস্থায় পালন করিতে হইবে, এই ছিল তাহাদের অভিমত। কিন্তু, এই যুক্তিটিও বর্তমানে গৃহীত হয় না। যাঁহারা সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ লক্ ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে আইন পালন করিতে হইবে এইজন্য যে যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োগ করেন, তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁহারা চুক্তি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থকেই আইনের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে আইনের অনুমোদন কিভাবে হইবে তাহা বুঝাইতে পারে না। অস্টিনের মতে আইনের অনুমোদন সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ, সার্বভৌমের আদেশই হইতেছে আইন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা (Pluralists) আইনের অনুমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেন না।

জনগণের সম্মতি আইন পালনের ভিত্তি

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের কতিপয় নিয়ম যাহা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। অর্থাৎ, আধুনিক লেখকগণ মনে করেন যে আইন সর্বদাই এমন হওয়া উচিত যেন জনসাধারণেরই বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছা ইহাতে বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসাধারণের ইচ্ছা বা সম্মতিই হইতেছে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি (grounds of political obligation)। অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন মানুষের কার্যকর চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। যাঁহারা রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, আইন তাহাদের ইচ্ছানুযায়ীই গঠিত হয়।[১১] বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের কার্যকর চাহিদা রাষ্ট্রের ভিতর অর্থনৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন জনগণের এমন এক ইচ্ছাকে বাস্তবে কার্যকর করে যাহা সর্ব অবস্থায় কার্যকর হয়।[১২]

জনগণ কর্তৃক আইন পালন করা অথবা না করা আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন পালন করিবার মূল কারণ জোরজবরদস্তি

১১। "Legal imperatives are a function of effective demand."—Laski.
—Introduction to Politics

১২। "The root of obedience to law is not coercion but the will to obey; nevertheless law takes the form of an imperative."
—Mac Iver—The Modern State, P. 21.

(coercion) নহে,—ইহার মূল কারণ হইতেছে আইন পালনের ইচ্ছা। যদিও আইনের অনুমোদন জনগণের ইচ্ছা বা সম্মতির উপর নির্ভরশীল, তবুও আইন পালন করিতে সকলেই বাধ্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের অনুমোদনের (sanction) ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কী লক্ষ্য, অথবা কেন ইহা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি আমরা বুঝি যে রাষ্ট্রের আইন আমাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হইয়াছে তবেই সেই আইন সার্থক এবং তবেই সেই আইন আমাদের অনুমোদন লাভ করিতে পারে।[১৩] আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহা পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা (legal validity)। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় শর্ত হইতেছে ইহার জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা। এইজন্য ইহার একটি নৈতিক মূল্য (value) থাকা দরকার।

আইনের অনুমোদন নির্ভর করে জনগণের সম্মতির উপর

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে। কাহারও ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। এইসব স্বার্থ যে সর্বদাই একপ্রকার হয় তাহা নহে,—ইহারা কোনও সময়ে পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময় পরস্পরের সহযোগী। সুতরাং রাষ্ট্র যদি কখনও এই ইচ্ছা করে যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রকাশ করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহা সর্বাধিক পরিমাণে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে। নাগরিকদের জীবনের সুখ-সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে তাহার উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা আনুগত্য

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার স্বার্থ থাকে ; সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে আইন ঠিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করে

১৩। "The legal imperatives of any state must always be conceived as if they are to be capable of justification in term of the end it seeks to serve, they are so to say, a permanent essay in the conditional mood."

Laski.—Introduction to Politics, P. 45.

প্রকাশ করিবে। যদি রাষ্ট্রের আইন সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে তবেই আইন ঠিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করিতে পারে।

রাষ্ট্রের আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে যেগুলিকে আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলণ্ডে আমরা বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম (conventions) দেখিতে পাই। সেইগুলি অনুমোদনের (sanction) প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব। তাহা ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। জনমতই হইল আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে তবে আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রাষ্ট্র তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্যের সহিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আইনের অনুমোদনে জনমতের ভূমিকা

যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং আমাদিগকেও সেভাবেই আইন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

আইন মান্য করা হয় কেন? (Why is Law obeyed?): আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট আইন পালন করিলে তাহাদেরই স্বার্থ সুরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাতে তাহাদেরই মঙ্গল, তখনই তাহারা আইন পালন করে। এখানে আইন কেন মান্য করা হয় তাহা আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধির উপর ভিত্তিশীল। অপর একটি মতবাদ অনুযায়ী মানুষ শাস্তির ভয়ে কিংবা অরাজকতার আশংকায় আইন পালন করিয়া থাকে। আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে। এই ভয়ে মানুষ আইন পালন করে। হব্‌স্, অষ্টিন প্রমুখ লেখকগণ আইন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় এবং ইহা যে সেইজন্য অবশ্য পালনীয়, এই যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। হব্‌স্ অবশ্য আরও একটি যুক্তির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কদর্য প্রকৃতির রাজত্ব হইতে অথবা অরাজকতা হইতে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ আইন পালন করে।

আইন কেন মান্য করা হয় সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা

উপরে আইন কেন মান্য করা হয় সেই সম্বন্ধে যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করা

হইল তাহার সমন্বয় করিয়া স্যার হেন্‌রী মেইন (Sir Henry Maine) এবং তাঁহার অনুগামিগণ মনে করেন, মানুষ শাস্তির ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় কারণেই আইন মান্য করিয়া থাকে। কিন্তু লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার পাঁচটি কারণ দেখাইয়াছেন; যথা—(১) নির্লিপ্ততা (Indolence), (২) শ্রদ্ধাভক্তি (Deference), (৩) সহানুভূতি (Sympathy), (৪) শাস্তির ভয় (Fear) এবং উপযোগিতার উপলব্ধি বা বিচার-বিবেচনা (Reason)। নির্লিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে মানুষ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করে না; যেহেতু রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়াছে, সেইজন্য সে আইন পালন করে। শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসক কিংবা জননেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হিসাবে মানুষ আইন পালন করিয়া থাকে। শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও নাগরিকগণ আইন পালন করিয়া থাকে। আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয় হইতেও অনেকে আইন পালন করিয়া থাকে। সর্বশেষে, মানুষ তখনই আইন পালন করিয়া থাকে যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে আইন পালন করিয়া চলিলে তাহারই কল্যাণ। আইন যদি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করে এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকর চাহিদাকে পূরণ করিবার চেষ্টা করে তবে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন করে। গ্রীণের ভাষায় "Will and not force is the basis of the State". অধ্যাপক ল্যাস্কিও মনে করেন যে, মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে একটি বিশেষ আইনের স্বীকৃতির অর্থ হইতেছে তাহারই স্বার্থ কিংবা কার্যকর চাহিদার স্বীকৃতি তখনই মানুষ সেই উপযোগিতার উপলব্ধি হইতেই আইন পালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়।[১৪] আইনের বৈধতা (Validity) এবং মূল্য (Value), উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আইন পালন কেন করা হয়, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা উচিত।[১৫]

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)ঃ সুসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সকলেরই সাধারণ

১৪। A legal imperative has "no claim to obedience merely because it is effective. Its claim to obedience depends upon what it does to the lives of individual citizens. Of this they alone can judge." Laski.—Introduction to Politics.

১৫। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য—"আইনের অনুমোদন" (Sanction of Law) শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সঙ্গত এবং বিচার-সম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে এই নিয়মগুলির সংশোধন করা যাইতে পারে অথবা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার নাগরিকদের উপর কতটা কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ করে। বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণকারী প্রত্যেক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাষ্ট্রই এককভাবে টিঁকিয়া থাকিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহা খুশী করিয়া যাইবে এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিতে পারি না। কারণ, প্রথমতঃ, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। যে আইন অমান্যের পিছনে কোনও শাস্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় না। কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলেই, আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি, যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রসংঘে প্রয়োগ করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃত আইন?

একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্য। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আইন

অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। বর্তমানে এমন দিন আসিয়াছে যে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়। কিন্তু, এজন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক সময় ভঙ্গ করা হয়, তাহাতে ইহার আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি। জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র পালন করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস (Sources) হইতেছে ছয়টি। যথা:— (১) রোমান আইন; (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী; (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা; (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল; (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান। উলসি, লরেন্স, হল্, এবং ওপেনহিম প্রমুখ লেখকদের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা এবং গ্রন্থাবলী বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস

আইন এবং নীতিশাস্ত্র (Law and Ethics): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্র গভীরভাবে জড়িত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অপর দিকে নীতিশাস্ত্র নৈতিক বিধি এবং নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রাচীনকালে সমুদয় আইন নীতিশাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে আমরা কতিপয় পার্থক্য দেখতে পাই। নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানুষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যও নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের শুধু বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নীতি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল চিত্তশুদ্ধির পথ সুগম করা; রাষ্ট্রীয় আইনের উদ্দেশ্য হইল সমাজে শান্তি ও শৃংখলা এবং সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখিয়া সকলের কল্যাণের জন্যই মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। নীতিশাস্ত্র শুধু মানুষের অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না; নীতিশাস্ত্রের মাপকাঠির দ্বারা

আইন এবং নীতি-শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তুর পার্থক্য

মানুষের বাহ্যিক জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হয়। মিথ্যা কথা বলা, অপরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও হিংসা করা অথবা মনের নীচতা প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী। কিন্তু ইহা যদি আইনভঙ্গের কারণ না হয় অথবা কাহাকেও শারীরিক আঘাত দেওয়া না হয় তবে আমরা ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, অনুমোদনের দিক হইতেও রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রীয় আইন কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নৈতিক আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শাস্তি পাইতে হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে এবং হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে। সুতরাং শারীরিক শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন, অথবা সমাজের উপহাস সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ। তাহা ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী। প্রয়োজন হইলে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে পারি অথবা ইহা সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে পরি না। চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরুদের এই মান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে কোনও মান নাই। তবে, রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন করিবার সময় সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিতে হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু, সেগুলি যে সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অনুয়ায়ী হইবে, তাহা নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় যদি সেই নৈতিক নিয়ম সামাজিক স্বার্থের সহিত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে। কাহাকেও হত্যা করা হইলে অন্যায় হয়, ইহা যেমন একটি নৈতিক নিয়ম, সেই প্রকার ইহা একটি রাষ্ট্রীয় আইন। কিন্তু এইজন্য সর্বদাই যদি সব নৈতিক বিধিকেই রাষ্ট্রীয় বিধির মর্যাদা দেওয়া হয় তবে নৈতিক আদর্শেরই ক্ষতি হয়। সিজউইকের (Sidgwick) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিত ততক্ষণ সম্পর্কযুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণ পরস্পরের সঙ্গে

অনুমোদনের পার্থক্য

নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নৈতিক আইনের একটি বিশেষ মান আছে

সম্পর্কযুক্ত।[১৬] অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, বালিকাদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরনের বিবাহ নৈতিক আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। লর্ড বেণ্টিংকের আমলে সতী-দাহ প্রথা আইন-বিরোধী কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবার পর হইতে ইহা যে একটি অন্যায় প্রথা ছিল সে সম্পর্কে সমাজের ধারণা স্পষ্ট হয়।

রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবর্জিত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়। প্রকৃতপক্ষে যে সকল রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেগুলির প্রতি মানুষের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা বেশী থাকে। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে, একটি হইতেছে, ভাল আইনের সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত প্রচলিত নৈতিক আইনগুলির যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, সেইদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি (অর্থাৎ যে আইনগুলি জনস্বার্থ-বিরোধী এবং চিরন্তন ন্যায় নীতির বিরোধী) রাষ্ট্রের বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে পাই। অস্পৃশ্যতানিবারণ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাণের জন্য কারখানা আইন প্রবর্তন, জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রভৃতি ভাল ভাল আইন রাষ্ট্র প্রণয়ন করিয়াছে।

নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত রাষ্ট্রের কর্তব্য

স্বাধীনতা এবং ইহার অর্থ (Meaning of Liberty) ঃ স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় প্রাচীনকালে এথেন্স নগরীতে। এই স্বাধীনতাকে বার্নস (Burns) তৎকালীন এথেন্সের স্বাধীনতা (Athenian Liberty) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এথেন্সের অধিবাসিগণ স্বাধীনতা বলিতে সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দ্বিবিধ ধারণা পোষণ করিতেন। এথেনীয় স্বাধীনতা প্রাচীনকালে এথেন্সের সংস্কৃতিকে

এথেন্সের স্বাধীনতা

১৬। "Ethics is connected with Politics so far as well-being of any individual man is bound up with the well-being of his society."

"To turn all moral obligations into legal obligations would be to destroy morality."
Mac Iver.

খুবই উন্নত করিয়াছিল। বার্নস বলেন, "Athenian Liberty was productive." কিন্তু, যুগের পরিবর্তনের সহিত এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে।

'স্বাধীনতা' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। ইংরাজী শব্দ "Liberty" আসিয়াছে ল্যাটিন "liber" শব্দ হইতে। এই কথার অর্থ হইতেছে, অবাধ স্বাধীনতা। এই অর্থ হইতে বিচার করিলে "আইন" অথবা "নিয়ন্ত্রণ" এবং "স্বাধীনতা" আপাতবিরোধী ধারণা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু, 'স্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতাই নহে। সাধারণ অর্থে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার অভাব (absence of restraints)। কিন্তু, জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা কখনও উচ্ছৃংখলতায় পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে ব্যক্তিগত সুখের জন্য অত্যাবশ্যক যে সকল সামাজিক শর্ত সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। এই সামাজিক শর্ত হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইলে ব্যক্তিগত সুখ কাহারও ক্ষুণ্ণ হয় না। তখনই ইহাকে অধ্যাপক লাস্কির মতে আমরা 'স্বাধীনতা' আখ্যা দিতে পারি।[১৭] কিন্তু, শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য নয়। স্বাধীনতার আর একটি দিক্ আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথবা উপভোগ করার যোগ্য। মানুষের জীবন যাহাতে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া উচিত। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার *"Essay on Liberty"* বইয়ে স্বাধীনতাকে বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণের অভাব বলিয়া কল্পনা না করিয়া এই ধারণা প্রচার করেন যে, স্বাধীনতা হইতেছে মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ, বিভিন্নমুখী এবং অব্যাহত প্রকাশ।

স্বাধীনতার অর্থ

গ্রীণ বলেন, তাহাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের জীবনকে সুন্দর করিবার জন্য এবং নিজের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য করা

১৭। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "I mean by liberty the absence of restraint upon the existence of those social conditions which in modern civilization are the necessary guarantees of freedom." —Laski : Grammar of Politics, P. 142.

উচিত অথবা উপভোগ করা উচিত এরকম কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।[১৮]

নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত নহে

অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। কিন্তু, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানুষ যাহাতে সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেইজন্য একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রণী শক্তি হইতেছে আইন। আইন এইক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে,—ইহা মানুষের উপর এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। একজনের অধিকারে যাহাতে অপরে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান থাকা দরকার। তাহা হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক (Liberty as related to Law or Authority) : প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া চলিলেই জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। আইনের সাহায্যেই রাষ্ট্র স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

প্রত্যেকের স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত স্বাধীনতাকে আমরা আইন-অনুমোদিত স্বাধীনতা (legal liberty) বলিতে পারি। আইনানু-মোদিত স্বাধীনতা আইন কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়াই কখনও অব্যাহত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না।[১৯] প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ।[২০]

১৮। "Freedom consists in a positive power or capacity of doing or enjoying something worth-doing or worth-enjoying." —Green

১৯। "......Legal liberty, just because it is legal, is not an absolute or unconditional liberty." —Barker

২০। "The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all......" —Barker

আইনের দ্বারা যদি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত হয় না। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড়। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্র তখন আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম করে।

রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক

শাসনতান্ত্রিক আইনে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্য কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত হয়, তবে রাষ্ট্রীয় আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসক-সম্প্রদায় কর্তৃক যদি নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত অথবা ব্যাহত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া অথবা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়া নাগরিকদের নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে এই প্রকার পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,—একে অন্যের পরিপূরক। আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত ("Law is the condition of Liberty.")। জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে। নাগরিকদের বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থেই সমাজে দরকারবোধে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইতেই এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আমার যদি অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকে, তবে আমার উপর এই নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত যে স্থান বিশেষে আমি বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারিব না। এই নিয়ন্ত্রণটুকু যদি আমার উপর না থাকে, তবে অপরের উপরেও থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে আমার নিজের স্বাধীনতাই বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দিবে।[২১] জীবনধারণের জন্য মানুষের কতিপয় অত্যাবশ্যক

ক্ষেত্রবিশেষে স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যই প্রয়োজন

২১। এইজন্যই বেন এবং পিটারস (Benn and Peters) বলিয়াছেন, "It is the paradox of freedom that we must set a constraint to catch a constraint. Benn and Peters,—"Social Principles and the Democratic State." P. 213.

চাহিদা আছে ; যেমন শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এই সকল চাহিদা মিটিলেই নাগরিকগণ প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। আইন মানুষের এই অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি করে উহার উৎকর্ষের উপর।[২২] যতক্ষণ পর্যন্ত আইন জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যতক্ষণ ইহা জনসাধারণের সব অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্তই জনগণ আইন মানিয়া চলে। সুতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা স্বাধীনতার পরিপূরক, পরিপন্থী নহে। রাষ্ট্রের সংবিধানিক আইন, যেমন "হেবিয়াস কর্পাস আইন," (Habeas Corpus Act), "অধিকারের বিধি" (Bill of Rights), প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যে কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, তাহা নহে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন ঘোষণা করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে গণ-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, সতর্ক জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে ("Eternal vigilance is the price of Liberty."—Laski)। যতক্ষণ পর্যন্ত জনমত সতর্ক এবং সদা-সচেতন থাকে, ততক্ষণ রাষ্ট্রীয় আইন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝায় না। কিন্তু, একে অন্যের পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, আবার আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারক ও বাহক হইতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different types of Liberty) : স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের প্রথমেই আইনসঙ্গত স্বাধীনতার (Legal Liberty) স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হইতেছে আইনসঙ্গত স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ। ইহা ছাড়া, আমরা দেখিতে পাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচিত হইল।

২২। "Sovereignty is a function of the quality of the life that it makes for its members." —Laski

স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) **:** কোন কোন ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, প্রত্যেক মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মক্ষমতা আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রয়োগ করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণের মতে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনতা মানুষ উপভোগ করিত, তাহাই হইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রণী-শক্তি ছিল না, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীনতা সবলের স্বেচ্ছাচারিতা অথবা উচ্ছৃংখলতা ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক স্বাধীনতার সমর্থকগণ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে আইনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যে স্বাধীনতা জনসাধারণ উপভোগ করে, তাহা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরস্পর-বিরোধী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পর-বিরোধী আচরণে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতা কল্পনা করা সম্ভবপর নহে।

স্বাভাবিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমস্যা

পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty) **:** পৌর স্বাধীনতা বলিতে সামাজিক জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (individual liberty) বুঝায়। শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নহে, পৌর স্বাধীনতা বলিতে আমরা সামাজিক স্বাধীনতাও (social liberty) বুঝি; কারণ জনসাধারণ সমাজ-জীবনেই এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। পৌর জীবনে মানুষের কতিপয় অধিকার একান্ত অপরিহার্য। নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য নাগরিকদের এই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, সংবিধানের মধ্যেই এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়া সভ্য সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং চিন্তা করিবার অধিকার, ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের সমষ্টিকেই আমরা পৌর স্বাধীনতা বলি। রাষ্ট্র অযথা জনসাধারণের পৌর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যদি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পৌর স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জনসাধারণ নিজেরা

হয়ত নিজেদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে জানে না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নহে। বিশেষতঃ, বাক্-স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারে। পৌর স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক আছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণী-শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই নিয়ন্ত্রণী-শক্তি হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইন। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা প্রদান করিবার অর্থ এই নয় যে, একজন অপরলোকের বিরুদ্ধে যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারে, অথবা, কাহাকেও চলাফেরার স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে কাহারও বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পৌর স্বাধীনতা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক, ততক্ষণ পর্যন্তই ইহা রাষ্ট্র জনসাধারণকে প্রদান করিবে। আবার, পৌর স্বাধীনতা যাহাতে প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্যও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের আবশ্যক।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বরূপ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) : গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার-সমষ্টিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করা বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের উপরেই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এবং যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার এবং ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং তাহাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক, তাহাই নহে—উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরও অনেক উন্নত হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ ও ইহার গুরুত্ব

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) : অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprises) পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। অ্যাডাম স্মিথ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের মধ্যে সকলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নাগরিকদিগকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেই প্রকার নাগরিকগণকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে সমাজতন্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলিয়া আসে এবং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সাম্যের (economic equality) প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সবলের হাতে দুর্বলের শোষণ ঘটাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থনৈতিক শোষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের উচিত যাহাতে এই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইবার অধিকার, বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেখা যায়

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) : জাতীয় স্বাধীনতা হইতেছে অন্যান্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে একটি জাতির সাধারণ স্বাধীনতা বা সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বুঝায়। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির বা দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন অসম্ভব। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতির পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। সমষ্টিগত স্বাধীনতা হইতেছে একটি দেশের অথবা জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতির ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই

সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধানতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেই স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব দিক হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষতঃ, সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Different safeguards of Liberty) : নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয়, সেইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়।

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রের মূলকথা হইতেছে জনগণেরই নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। পৌর-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কখনও তারতম্য হয় না। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না ; বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। একনায়ক-তন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু সেই আইন জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। জোর-জবরদস্তি করিয়া সেক্ষেত্রে জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি থাকে বলিয়া এবং নিজেদেরই প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত আইন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

সচেতন জনমত

সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়। এজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য এবং যাহারা এই সতর্কতা বজায় রাখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাই স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়া থাকেন।[২৩]

২৩। "Eternal vigilance is the price of liberty and those who are trained to that vigilance become conscious guardians of liberty." —Laski

স্বাধীনতার পরিপন্থী যাহা কিছু দেখা যাইবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাহসই হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য।[২৪] জনমত যখন স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়। তাহা না হইলেই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করে এবং সেক্ষেত্রে জনমতের শক্তির কাছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার মানিতে হয়। যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সমর্থ হয় এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন রাষ্ট্রীয় আইনই জনগণের স্বাধীনতার শর্ত হইয়া পড়ে। তাহা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রিসভার অথবা পরিচালকমণ্ডলীর (Executive) শাসন। আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। পার্লামেণ্টে যদি বিরোধীদল খুব শক্তিশালী হয় তবে ক্ষমতায় আসীন দল এমন কিছু করিতে সাহস পাইবে না যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে তাহা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশ শাসন-কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান এবং বিনা বিচারে কাহারও শাস্তি হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার বিভাগ (Separation of Powers) করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে। মণ্টেস্কু বলিয়াছিলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার

২৪। "The secret of liberty is always in the courage to resist."

জন্য এমনভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা উচিত যেন ক্ষমতাই ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।[২৫] সরকারের আইন প্রণয়ন পরিচালন এবং বিচার বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষমতা বিভাগ করার পক্ষে বলা হয় যে পরিচালন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যদি ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া না হয় তবে শাসনকর্তৃপক্ষ অত্যাচারী হইতে পারেন; যেমন শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি কাহাকেও আইন ও শৃংখলা ভঙ্গ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার করেন এবং নিজের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে প্রকৃত দোষী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার শাস্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। এ ক্ষেত্রে সে প্রকৃতই দোষী কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাকা উচিত বিচার বিভাগের। তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ করা হয় নাই; অথচ ইংলণ্ডের নাগরিকগণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। তবে ইহা ঠিক যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রী-করণের তত প্রয়োজন নাই যত প্রয়োজন আছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন থাকে এবং পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত না হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতে পারে না। ইংলণ্ডে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাই, সরকারের ক্ষমতারও স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। কিন্তু সেই দেশে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) অথবা আইনের নিরপেক্ষতা আছে। আইনের নিয়মের তিনটি তাৎপর্য আছে, যথা—(১) আইনের সর্বোচ্চ সার্বজনীন ক্ষমতা থাকিবে, (২) আইনের চোখে সকলেই সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী হইবে না অথবা কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না।

ক্ষমতার বিভাগ

আইনের অনুশাসন (Rule of Law)

সুতরাং আইনের অনুশাসন (Rule of Law) হইতেছে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।[২৬]

২৫। "To prevent the abuse of power, it is necessary, by a proper disposition of things, that power should be a check to power." ফাইনারের (Finer) "The Theory and Practice of Modern Government" বইয়ে উদ্ধৃত।

২৬। ম্যাক আইভার বলেন, "The operation of the rule of law enables us to interpret government as an organ of society, an agent empowered to work in appointed ways, owning a derived authority and a delegated might, no longer the master of the State."
—Mac Iver ; The Modern State. P. 269

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী জনমত। জনসাধারণের সচেতনতাই তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবে। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং উন্নতধরনের সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যাহাতে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সেইজন্য দেশবাসীকে সতর্ক রাখা বিরোধীদলের একটি প্রধান কাজ।

শক্তিশালী জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

ভারতবর্ষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার। সরকার যদি নাগরিকগণকে স্বাভাবিক সময়ে এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন, তবে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পালন করিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার-বিভাগ যাহাতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive Principles) মধ্যে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনও শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের দেশে বিনাবিচারে এখনও নাগরিকদের বন্দী করা যায়। সম্প্রতি ভারত প্রতিরক্ষা আইনের (Defence of India Rule) প্রয়োগ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে শাসনতন্ত্র ভারতীয় নাগরিকগণকে যত স্বাধীনতাই দিক না কেন, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত প্রতিরক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাগরিকগণ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বাধীনতা মোটেই কম উপভোগ করে না।

ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

Exercise

1. আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইনের কি কি উৎস আছে? [**Define Law. What are the sources of Law ?**]

2. আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা কর। [**Discuss the relation between Law and Morality.**]

3. আইনের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? [**What are the features of Law ?**]

4. 'স্বাধীনতার' অর্থ আলোচনা কর। "স্বাধীনতায় শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাব নাই, ইহা হইতেছে আত্মোপলব্ধির একটি সুযোগ।"—এই উক্তিটি আলোচনা কর। [Discuss the meaning of Liberty. "Liberty is not the absence of restraint, but an opportunity for self-realisation."]—Discuss this Statement.

5. বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা কর। [Discuss the nature of the different types of Liberty.]

6. "আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত"—এই উক্তিটি আলোচনা কর। ["Law is the condition of Liberty"—Discuss the statement.]

7. স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর। [Discuss the defferent safeguards of Liberty.]

8. "স্বাধীনতা" বলিতে কি বুঝায়? 'আইনের' সহিত ইহার সম্পর্ক দেখাও। [What is meant by "Liberty"? Point out its relation to 'Law'.]

[**ইঙ্গিত :** স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা কর।]

9. আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [Discuss the relation between Law and Liberty.]

10. আইনের স্বরূপ ও অনুমোদন আলোচনা কর। [Discuss the nature and sanction of Law.]

11. আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃতপক্ষে আইন? ইহার কি কি উৎস আছে? [Is international Law, properly speaking, Law? What are its sources?

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Citizenship and the Rights and Duties of a Citizen)

নাগরিকতার সংজ্ঞা (Definition of Citizenship) **:** নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত।

'নাগরিক' শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থ

বর্তমানে 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। আধুনিক কালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিক জীবনে সকলেই কতিপয় সুযোগ-সুবিধা সরকারের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না বলিয়া সকলকেই আমরা নাগরিক বলিতে পারি না। বিদেশীগণ সবরকম পৌর-স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। আধুনিককালে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন হয়। নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ—রাষ্ট্রের উন্নতিতেই নাগরিকগণের উন্নতি। আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরনের নাগরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিলে নাগরিক জীবন শান্তিময় হইয়া উঠে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়ত সব নাগরিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। এইজন্যই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যও আছে। অধ্যাপক লাস্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার

সার কথা নিহিত রহিয়াছে সাধারণের মঙ্গলের জন্য, নাগরিকের শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বিচার-বুদ্ধির অবদানের মধ্যে ("citizenship······means contribution of one's instructed judgment to the public good.—Laski)। সুতরাং নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন লোক যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং সর্বদাই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে।

নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Citizen and an Alien): একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর (alien) মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী। একজন বিদেশী একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিভিন্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ,

বিদেশীর আনুগত্য থাকে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি

একজন বিদেশী যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দাবি করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একজন বিদেশীকে বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করানো যায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র (যে রাষ্ট্রে সে সাময়িকভাবে বাস করিত) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের

বিদেশীর রাজনৈতিক অধিকার থাকে না এবং তাহাকে সেনা-বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা যায় না

নিরাপত্তা সর্বদাই তাহার রাষ্ট্র রক্ষা করে। একজন নাগরিক সম্পূর্ণভাবে সবরকম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন, কোন বিদেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের সব দায়িত্বই পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনাবাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়।

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় (Different methods of acquiring Citizenship): নাগরিক দুই প্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মসূত্রে নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বারা নাগরিক। নাগরিকতা অর্জনেরও দুইটি উপায় আছে,—প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জনের দ্বারা।

জন্ম-পদ্ধতি এবং অনুমোদন-পদ্ধতি

জন্মাধিকার আবার দুই প্রকার হইতে পারে—একটি হইল জন্মনীতি (Jus Sanguinis) এবং অপরটি হইল জন্মস্থান নীতি (Jus Soil)। প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক বলিয়া দাবি করিতে পারে। অর্থাৎ পিতা যে দেশের নাগরিক, পুত্র যদি সেই দেশে জন্মগ্রহণ না করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবিতে সে সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তি হইতেছে, যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মটিতে জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অর্জিত হয়। যদি কোনও রাষ্ট্র এক সঙ্গে উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে জন্মের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে; আবার জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে আমেরিকার কোন নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এরূপক্ষেত্রে কোন নাগরিক সাবালক হইয়া স্থির করিবে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে।

অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা (naturalized citizenship) বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন দেশের জন্মগত

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা

নাগরিক অপর দেশের কতিপয় শর্ত পালন করিয়া সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করে। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরি করিয়া, বহুদিন একটানা বিদেশে বসবাস করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথবা সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন করিতে হয় এবং তাহার পর কতিপয় শর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে

ঐ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বাস করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সৎস্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি শর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে নাগরিকতা অর্জন করিয়া বিদেশী ঐ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু, অনেক সময় সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মের ভিত্তিতে নাগরিক না হইলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। ইটালী, জার্মানী, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড জন্মনীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। আবার আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সুবিধা অনুযায়ী যখন যে নিয়মটি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করে। ভারতবর্ষ কর্তৃক অনুসৃত নীতিটি একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের সময় যে স্থায়িভাবে ভারতে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা যাহার পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিয়াছে, তাহাকেই ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যে অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতামাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে যেকোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইবে। এই ব্যক্তি যদি এতকাল ভারতের বাহিরে বাস করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে।

ভারতে অনুসৃত নীতি

এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং দ্বি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে। ধরা যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিল। জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক। শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহা লইয়া হয়ত কোন গোলমাল হইবে না—কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রশ্ন লইয়া উভয় দেশের মধ্যে বিতর্ক এবং কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার যে নীতি প্রচলিত তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ করা অনেক

জন্মগত অধিকার ও জন্মস্থানগত অধিকারের মধ্যে সংঘাত

ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণের সমস্যা হয় না। কিন্তু ইহাও একটি বিজ্ঞানসম্মত নীতি নহে। কেননা, এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা একটি বিশেষ স্থানে জন্ম-সংক্রান্ত দৈবদুর্ঘটনার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্, একটি ভারতীয় দম্পতি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। যাত্রাপথে জাপানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুকাল তাহারা থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে তাহাদের একটি সন্তান জন্মলাভ করিল; পুনরায় তাহাদের চারিটি সন্তান যথাক্রমে ইংলণ্ড, জার্মানী, ইটালী এবং সুইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাঁচটি সন্তান পাঁচ দেশের নাগরিক হইল। কিন্তু, আমরা এই অবস্থা অচিন্তনীয় মনে করি। সেইজন্য জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত নহে।

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত সেই আবেদন-পত্রটির খুঁটিনাটি বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়া নাগরিকতা লাভের সব শর্ত পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখে। অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা সম্পূর্ণ (complete or grand) হইতে পারে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা এবং জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না এবং উভয় প্রকার নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা (citizenship by grand naturalization) বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা (citizenship by partial naturalization) বলি। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকতা এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য হয়; কারণ জন্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণই এই পদগুলির জন্য মনোনয়ন পাইতে পারেন। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা নাই।

সম্পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক আইনকানুন আছে। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি (immigration laws) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতারক্ষার জন্য। নাগরিকতা সম্পর্কে এই

নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথবা বর্ণগত বিদ্বেষ।

নাগরিক অধিকারের বিলোপ (Loss of Citizenship) : যাহাকে নাগরিক অধিকারের বিলোপ বলিয়া ধরা হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র। অর্থাৎ, ইহাতে একদেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশের নাগরিকতা গ্রহণও দেখা যায়।

নাগরিকতার বিলোপ

বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মূল নাগরিকতা হারাইয়া থাকে। কোনও নূতন নাগরিকতা অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে। একই সঙ্গে একাধিক দেশের নাগরিক অধিকার ভাগ করা সম্ভবপর নয়। বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অনুমতি লওয়া থাকে অথবা যদি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই এই চাকুরি লইয়া থাকে, তবে সে এইজন্য নাগরিকতা হারাইবে না। বিদেশে জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে নিজের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণেও কেহ নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি (লেখাপড়া অথবা জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত) গ্রহণ করিতে পারে না।

নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and People) : নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ (People) এক নহে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। স্বজাতীয় কোন লোক যদি কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে, তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও দেশের নাগরিক নহে। কোন বাঙালী যদি ব্রিটেনের নাগরিকতা অর্জন করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করেন, তবে তিনি যে বাঙালী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না। স্বজাতীয় লোক যদি ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে সে কোন্ দেশের নাগরিক অধিকার গ্রহণ করিবে তাহা তাহাকে স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝায় একই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট

একদল লোক যাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া এক গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নাগরিকের ন্যায় তাহাকে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Subject) : নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু প্রজা সবসময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদাসম্পন্ন এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারে না। ভারতবাসীরা যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহারা প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। যাহাদের প্রজা বলা হয় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার অধিকার হয় না। প্রজার কোন অধিকার শাসকসম্প্রদায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চায় না। শাসকের ইচ্ছায় প্রজার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে 'প্রজা' শব্দটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেননা গণতন্ত্রের যুগে এই শব্দটির কোন স্থান নাই।

নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Elector) : অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সবসময় ঠিক নহে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে ; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক না-ও হইতে পারে, আবার কেহ হয়ত নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে নাগরিক নাও হইতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও নির্বাচন অধিকার প্রদান করিতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিদেশীকে আমরা নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

নাগরিকদের অধিকার (Rights of the Citizens) : অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিয়াছি নাগরিকদের দুই প্রকার অধিকার থাকে ; যথা,—নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights)। নৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয় না। কিন্তু আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। আইনগত অধিকারগুলিকে পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—সামাজিক অথবা পৌর অধিকার (Civil Rights), রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এবং অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)।

নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (Civil Rights of the Citizens) **:**

১। **জীবন রক্ষার অধিকার** (Right to life) **:** পৌর অধিকারগুলির মধ্যে ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গোলযোগ হয় অথবা রাষ্ট্রের উপর যদি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবি করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

জীবন রক্ষার অধিকার

২। **স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার** (Right to Move freely) **:** প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রুচি অনুযায়ী বিকাশ করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যাইবে না। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে নাগরিকদের এই অধিকার রাষ্ট্র খর্ব করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ অথবা জাতীয় জরুরী অবস্থা ছাড়া সব নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকার ভোগ করিয়া থাকে।

চলাফেরার অধিকার

৩। **কাজ করিবার অধিকার** (Right to Work) **:** কাজ করিবার অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে। তবে কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে।

কাজের অধিকার

৪। **সম্পত্তির অধিকার** (Right to Property) **:** সম্পত্তির অধিকারও নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকারটি সার্বজনীন নহে। সামাজিক কল্যাণের জন্য—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের শোষণমুক্ত করিবার জন্য রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই হস্তক্ষেপের মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (eminent domain), পুলিশী ক্ষমতা (Police Power) এবং করস্থাপন করিবার ক্ষমতা

সম্পত্তির অধিকার

(power of taxation)। রাষ্ট্র জনস্বার্থের খাতিরে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে সম্পত্তির অধিকারী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পরে। এমনিতে সাধারণ অবস্থায় নিজের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে।

৫। **স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার** (Right to Contract)ঃ এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দিক। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে কোন বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করিবে। চুক্তি করার স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত।

চুক্তি করিবার অধিকার

৬। **বাক্-স্বাধীনতার অধিকার** (Right to Freedom of Speech)ঃ বাক্-স্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার। এই পৌর অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ, ইহা একটি পৌর অধিকার। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার যদি মানুষ না পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব মানুষেরই থাকা উচিত। এই অধিকারটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য দায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, এই অধিকারটিও সার্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমাদের যাহা খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ যুদ্ধ অথবা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বাক্-স্বাধীনতার অধিকার—কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা একটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়।

৭। **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা** (Freedom of the Press)ঃ সভ্য নাগরিক জীবন এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। নাগরিকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, সেইরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অনুযায়ী সরকারও প্রভাবিত হয়। সংবাদপত্রে যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের খোলাখুলি সমালোচনা হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যুদ্ধের সময়ে অথবা দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব

৮। **সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা** (Right to Association)ঃ মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করে তখন তাহারা একটি সমিতি গঠন করে। একটি সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। সুতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য সভাসমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকের থাকা আবশ্যক। এই অধিকারটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যদি নাগরিকগণ রাজনৈতিক সভা সমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভা সমিতি সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথা নাই।

সভা-সমিতি গঠনের অধিকার

৯। **পরিবার গঠনের স্বাধীনতা** (Right to Family)ঃ সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না। তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রে কোন পুরুষ একজন স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না এবং কোন স্ত্রীলোক একজন স্বামী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না। মুসলমান ধর্মে অবশ্য বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ করিবার এবং পরিবার গঠন

পরিবার গঠনের অধিকার

করিবার অধিকার যেমন নাগরিকদের আছে সেই প্রকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

১০। **ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা** (Freedom of Worship and Conscience) : মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য মানুষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনভাবে চালনা করিবার অধিকার থাকা উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মানুষের নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ), সেই সকল রাষ্ট্রেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা অনেক দেখিয়াছি। সুতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে।

ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা

১১। **শিক্ষার অধিকার** (Right to Education) : নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে সেইজন্য শিক্ষা পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিকগণকে প্রদান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না।

শিক্ষার অধিকার

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর অধিকার আছে, যেমন নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) : রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই।

১। **বাসস্থানের অধিকার** (Right to Residence) : এই অধিকার অনুযায়ী যে-কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নির্বিশেষে দেশের যে-কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে

বাসস্থানের অধিকার

পারিত, তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার (Right to move) কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

বিদেশে জীবনরক্ষার অধিকার

২। **বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার** (Right to Protection while staying abroad) : কোন নাগরিক যদি বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবনরক্ষার অধিকার দাবি করিতে পারে।

ভোটপ্রদানের অধিকার

৩। **ভোট প্রদান করিবার অধিকার** (Right to vote) : সমুদয় রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষতঃ, পরোক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এই অধিকারটি অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য সে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অথবা তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহা একটি মৌলিক অধিকার। বিদেশীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত।

সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার

৪। **সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার** (Right to hold public office) : নাগরিকগণের সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার থাকিবে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে, সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং বিদেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের অনুমতিতে এই অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িক ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু; বিদেশী কখনই নাগরিকতা অর্জন করে না।

আবেদন করার অধিকার

৫। **আবেদন করিবার অধিকার** (Right to Petition) : নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের কারণ থাকে তবে তাহা দূর করিবার জন্য নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে।

৬। স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right to Resist) **:** প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোন একটি বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহা লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে। তবে এই অধিকারের তাৎপর্য হইতেছে, যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। সাধারণতঃ সভানুষ্ঠান করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া, এবং সংবাদপত্রের মারফৎ অথবা আইনসভার ভিতরে সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে শাসনতান্ত্রিক প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (Right to Constitutional Remedies)।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

উপরোক্ত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ছাড়াও অপর একটি বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার হইতেছে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং মতপ্রকাশের অধিকার (Freedom of Speech and Expression of Opinion)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। এইজন্য প্রয়োজন হইলে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিতে পারেন।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) **:** অর্থনৈতিক অধিকারগুলি পৌর অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিরক্ষার অধিকার এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার, নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি পাইবার অধিকার প্রভৃতি হইতেছে প্রধান অর্থনৈতিক অধিকার। আধুনিক লেখকগণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে চাকুরী পাইবার অধিকার। দেশে যাহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরী পাইবার অধিকার নহে নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দাবি করিতে পারে। অবশ্য সব কর্মক্ষম লোককে চাকুরী প্রদান করা বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অসম্ভব। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের কাজের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রিটেন, সুইডেন প্রভৃতি কোন কোন দেশে বেকার ভাতা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি

অথবা সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থনৈতিক অধিকার। শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে এবং তাহারা ন্যায্য মজুরি পাইল কি না সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়া এবং কাজের ন্যায্য মজুরি পাওয়া নাগরিকদের একটি অর্থনৈতিক অধিকার। স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের আর একটি অর্থনৈতিক অধিকার।

কর্তব্য (Duties) ঃ অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। অধিকার যেরূপ নৈতিক এবং আইনসঙ্গত এই দুই প্রকার হইতে পারে কর্তব্যও সেই প্রকার নৈতিক কর্তব্য (Moral Duty) এবং আইনসঙ্গত কর্তব্য (Legal Duty) এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। নৈতিক কর্তব্য সমর্থিত হয় নাগরিকের বিবেক এবং সমাজের অনুশাসনের দ্বারা—ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ধারণাই নৈতিক কর্তব্য পালনে নাগরিকের প্রেরণা দেয়। এই কর্তব্য পালনে বিমুখ হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু আইনসঙ্গত কর্তব্য যদি কেহ অবহেলা করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের আইনসঙ্গত কর্তব্য। কোন নাগরিক যদি এই কর্তব্য পালন না করে তবে রাষ্ট্র সেই নাগরিককে শাস্তিপ্রদান করিতে পারে। নৈতিক কর্তব্য এবং আইনসঙ্গত কর্তব্যের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সব দেশে একপ্রকার নহে। কোন কোন রাষ্ট্রে হয়ত একটি কর্তব্য নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়, অন্য কোন রাষ্ট্রে হয়ত ইহা একটি আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। নাগরিকদের ভোট প্রদান করা অধিকাংশ দেশেই একটি নৈতিক কর্তব্য; কিন্তু, মেক্সিকো এবং আর্জেন্টাইনে ইহা একটি আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties) ঃ নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে। মানুষের সমাজচেতনা হইতে অধিকার এবং কর্তব্য উভয়েরই সৃষ্টি হয়। সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের উক্ত কাজে নাগরিকদের কতিপয় দাবি থাকে, সেইগুলি হইতেছে নাগরিকদের অধিকার। আবার নাগরিকদের কাছেও রাষ্ট্রের এবং সমাজের কতিপয় দাবি থাকে এবং তাহাও পূরণ করা হইতেছে নাগরিকদের কর্তব্য। নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে।

সমাজ-জীবনে নাগরিকদের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর সীমারেখা অন্যান্য নাগরিকের অধিকারের উপর নির্ভর করে। কারণ, প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে সেই অধিকারগুলি ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় তখনই তাহার কর্তব্যবোধের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরও সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে।

অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আমার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য নাগরিকদের নিকট বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিত পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং অন্যান্য নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু আমারও এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমারও অধিকার পালনের মধ্য দিয়া আমি অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। হবহাউস (Hobhouse) এইক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়াছেন। আমার যদি রাস্তায় ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার থাকে, তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া। অনুরূপভাবে আমারও কর্তব্য অপরকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া; কারণ, অপরেরও অনুরূপভাবে রাস্তায় ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার আছে।[১]

রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা

দ্বিতীয়তঃ, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে আমি যেমন হস্তক্ষেপ করিতে পারি না অন্যান্য নাগরিকগণও আমার অধিকারে সেইরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যান্য নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে।

১। হবহাউসের ভাষায় "If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement......your duty is to give me reasonable room."

অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ না করা। অন্য নাগরিকদেরও অধিকার আছে তাহাদের বাড়ীতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে না দেওয়া। আমার ভোটদানের অধিকার আছে ; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিকভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের ফলে অন্য নাগরিকের উপর যেমন কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়াছে সেই প্রকার আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক। অধিকার এবং কর্তব্য, উভয়েরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ সুন্দর করা এবং শৃংখলার সৃষ্টি করা। আমার অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,—ইহাতে আমার এবং অপর সকলেরই স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। সুন্দর ও সার্থক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের জন্য নাগরিকের যেমন অধিকার থাকা দরকার, সেই প্রকার কর্তব্য পালনেও দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। নাগরিকগণ অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেইভাবে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ নিজেদের অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তব্যের কথা বিস্মৃত না হয়। আবার, সব নাগরিকেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের সময় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সময়মত করপ্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি কাজে লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাসীন হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র যদি কখনও নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে

নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা

সুন্দর ও সার্থক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে নাগরিকের দায়িত্ব

নাগরিকদের কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে

বিদ্রোহের অধিকার ও কর্তব্য

ক্ষমতা (power of taxation)। সম্পত্তির মালিকের সম্মতি ব্যতীতই রাষ্ট্র এই ক্ষমতা বলে সম্পত্তি দখল করিতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত আছে : (১) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনের নির্দেশ থাকা প্রয়োজন, (২) জনস্বার্থ বর্তমান থাকা প্রয়োজন ; (৩) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পুলিশী ক্ষমতা হইতেছে সেই ক্ষমতা যাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। পুলিশী ক্ষমতা বলে যদি রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি ধ্বংস বা দখল করেন, তাহার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহেন। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তিচ্যুত করা যায় না এবং ৩১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র যদি কোন সম্পত্তি দখল করিতে চাহে, তবে ইহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; তাহা ছাড়া, সার্বজনীন উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি দখল করিতে পারিবে। ১৯৫৫ সালে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী আইন অনুযায়ী সার্বজনীন উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী আইনের ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে দখল করিতে পারিবে না। জনস্বার্থের খাতিরে এবং পরিচালনার উন্নয়নের জন্যও কোনও কোম্পানীর শাসনভার সরকার গ্রহণ করিতে পারেন।

সর্বশেষে, নাগরিকগণকে **শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার** (Right to constitutional remedies) দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী নাগরিকগণ নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হইলে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সরকার যে-কোন সময়েই নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু রাখিতে পারেন। বিনা বিচারে আটক না থাকিবার অধিকার ভারতীয় নাগরিকগণের আছে। কিন্তু ভারত প্রতিরক্ষা আইনে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে (Maintenance of Internal Security Act) নাগরিকদের সেই অধিকারকেও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। *সাধারণভাবে কোন নাগরিককে কি কারণে আটক রাখা* হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ জারী করিতে পারে, ইহাকে "Habeas Corpus" বলা হয়। আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা "Mandamus" জারী করিয়া কোন ব্যক্তি, সংস্থা, অধস্তন আদালত অথবা

সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রতিষেধের (prohibition) সাহায্যে উর্দ্ধতন বিচারালয় নিম্নতর আদালতকে আপন এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। ইহা শুধু বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসন বা আইন সংক্রান্ত কাজের বেলায় প্রযুক্ত হয় না। *Quo Warranto* বা অধিকার-পৃচ্ছা অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তি যে-পদ অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় সেই পদ বা অধিকার দাবি করে, তখন তাহার দাবি বৈধ কিনা তাহা অনুসন্ধান করা হয় এবং অবৈধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। উৎপ্রেষণ (*Certiorari*) অনুযায়ী নিম্নতম আদালত বা বিচার বিভাগের কিছু ক্ষমতা আছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিলে ঐ বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বিচারককে উচ্চতর বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা যায় কিংবা ক্ষমতা-বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়। শাসনতন্ত্রের ৩২নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অধিকারকে উপরোক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা অথবা জননিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত শক্তিসমূহের সদস্যরা কতটা এই মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করিবে পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দণ্ড মকুব আইন প্রণয়ন করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক শাসন থাকাকালীন অবস্থায় যদি সশস্ত্র বাহিনী এমন কোন কাজ করে যাহা শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অবৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাকে বৈধ ঘোষণা করিয়া আইনপ্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে।

সশস্ত্র বাহিনীর অথবা জননিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত লোকের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি খুবই গণতান্ত্রিক, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই অধিকারগুলি কখনই শর্তবিহীন (absolute) নহে, জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তবে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যদি নিবর্তন-মূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু থাকে তবে শাসকগোষ্ঠী এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন—এই আশঙ্কা অমূলক নহে।

মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

মৌলিক অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়? (How are the Fundamental Rights enforced?): মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঠিকমত কার্যকর হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিধান আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার

দিয়াছে, তাহা শুধু শাসন-বিভাগের বিপক্ষেই নহে, তাহা আইন-প্রণয়ন বিভাগের বিপক্ষেও বটে। শাসন-বিভাগের কোন কাজ অথবা আইন-প্রণয়ন বিভাগের কোন আইন যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়, তবে শাসন-বিভাগের সেই কাজকে অথবা আইন-প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেই আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে (১৩নং ধারা)। দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার-বিভাগের ক্ষমতা আছে Habeas Corpus বা আদেশপত্র জারী করিয়া রাষ্ট্রের যে-কোন কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার। শাসনতন্ত্রের ৩২নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের এই আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্রের ২৬৬নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টেরও ক্ষমতা আছে অন্য যে-কোন আদালতকে এই জাতীয় আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়ার। তৃতীয়তঃ, যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে এই মৌলিক অধিকারগুলির কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া রাখা যায় না। শুধু জরুরী অবস্থায় শাসনতন্ত্রের ৩৫৯ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার-গুলির কার্যকারিতা বন্ধ রাখিতে পারেন।

১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার (Golaknath vs. The State of Punjab) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই রায় দেন যে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির সংশোধন করা অথবা সেইগুলিকে খর্ব করার অধিকার পার্লামেন্টের নাই; এই অধিকার আছে শুধু এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি গণপরিষদের। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকারসহ শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সংশোধন করিতে পারে।

মৌলিক অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ? (Are the Fundamental Rights absolute?)ঃ মৌলিক অধিকারগুলি সার্বজনীন নহে। কোন কোন অবস্থায় এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৩নং ধারা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ পার্লামেন্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৩নং ধারা অনুযায়ী দেশে যদি সামরিক আইন চালু থাকে তবে দেশের নিরাপত্তা অথবা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের যে-কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী যদি দেশে জরুরী

মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ

মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ

অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারা অনুযায়ী আইনসভাগুলির আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর যে সীমা আরোপিত আছে তাহা উঠিয়া যায় এবং পার্লামেণ্ট জরুরী অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে-কোন রকমের আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে এবং শাসনতন্ত্র তাহা অনুমোদন করে। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসান হইলেই শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারাটি পুনরায় কার্যকর হয়।

চতুর্থতঃ, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং আদালতে নাগরিকদের নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আবেদন করা সেই সময়ে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন (৩৫নং ধারা)।

সর্বশেষে, শাসনতন্ত্রের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের বিধান সহ শাসনতন্ত্রের যে-কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে।

Exercise

1. (ক) নাগরিকতার সংজ্ঞা প্রদান কর। (খ) নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[**(a) Define citizenship. (b) Distinguish between a Citizen and an Alien.**]

2. এইগুলির পার্থক্য আলোচনা কর:—(ক) নাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষ, (খ) নাগরিক ও প্রজা, (গ) স্বাভাবিক নাগরিক এবং নাগরিকতা অর্জনকারী।

[**Distinguish between (a) Citizen and People, (b) Citizen and Subject, (c) Natural and Naturalised Citizens.**]

3. নাগরিকতা কিভাবে অর্জন করা যায় এবং কিভাবে ইহার বিলোপ ঘটে?

[**How can citizenship be acquired and how is it lost?**]

4. একজন নাগরিক যে পৌর অধিকারগুলি ভোগ করে, সেগুলি আলোচনা কর।

[**Describe the different civil rights that a citizen enjoys.**]

5. গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকারগুলি আলোচনা কর।

[**Discuss the different political rights of a citizen in a democratic country.**]

6. নাগরিকদের (ক) সভা-সমিতি গঠনের অধিকার, (খ) বাক্-স্বাধীনতার অধিকার এবং (গ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়?

[**What are the rights of a citizen to (a) Public Meeting, (b) Freedom of speech, and (c) Freedom of the press?**]

7. বাক্-স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়? গণতন্ত্রের পক্ষে কি ইহা খুব প্রয়োজনীয়? এই অধিকারের কি কোন সীমা থাকা উচিত?

[**What is meant by the Right of Free Speech? Is it essential for Democracy? Should there be any limits to this?**]

8. ভারতীয়দের নাগরিকতার উপর একটি টীকা লিখ।

[**Write a note on the citizen[illegible] dians.**]

9. ভারতীয় নাগরিকগণ যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করেন, সেগুলি আলোচনা কর। এই অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ?

[**Discuss the Fundamental Rights that Indian citizens enjoy. Are these rights absolute?**]

নবম অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি
(Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution)

ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে শাসনতন্ত্রের কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে দেশের জনগণকে এমন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাহাতে আমাদের রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হইতে পারে। এই নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইলে দেশ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) : ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে (৩৭—৫১নং ধারা) রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির বিধান রাখা হইয়াছে। নীতিগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এমন কতিপয় নীতি আছে যেগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের মতে যেগুলি কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আইন-বিভাগ এবং শাসন-বিভাগের কাজের পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি আছে। তৃতীয়তঃ, নাগরিকদের কতিপয় অধিকারের বিধান করা হইয়াছে। এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এইগুলি পরিচালনার এমন কতিপয় নীতি যেগুলিকে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে না। শাসনতন্ত্রের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী এই নীতিগুলি কোন আদালত কর্তৃক কার্যকর হইবে না ; কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য হইল এমন একটি সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে জনগণ সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পাইবে ; রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে যেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার ভোগ করিতে পারে। জনগণের স্বার্থে সমাজের সমুদয় আর্থিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির অর্থ

করিতে হইবে; সকলের জন্যই সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান মজুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া সামাজিক স্বার্থের হানি না করে এবং যাহাতে ইহা ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সমানভাবে বণ্টিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশু এবং যুবক-যুবতীগণকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শাসনতন্ত্রের ৪০নং ধারা অনুযায়ী গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেইগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েৎ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমগ্র দেশকে একটি "কল্যাণ রাষ্ট্রে" (Welfare State) পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের উচিত পঞ্চায়েৎ সংগঠন করা এবং চৌদ্দ বৎসরের নীচের সব শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কর্ম, শিক্ষা, বেকার ভাতা, কাজের ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী, শ্রমিকদের বার্ধক্য এবং দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার জন্য সরকারী ভাতা, প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য অর্থসাহায্য প্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইবে রাষ্ট্রের। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের, বিশেষতঃ, কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে (৪৩নং ধারা)। তফসিলীশ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, জনস্বার্থের সংরক্ষণ করা এবং মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন করা এবং গরু প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গৃহপালিত জন্তু বধ রহিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলির অন্যতম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যতদূর সম্ভব এই নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারত সরকার শিল্প-শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করিয়াছেন।

একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সংগঠন

শিল্প-শ্রমিকের নিরাপত্তা

তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন অথবা চারুকলার দিক হইতে উন্নত এবং পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন কর্তৃক জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত স্মারক স্থান ও বিভিন্ন বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপর একটি বিধান (৫০নং ধারা) অনুযায়ী রাষ্ট্রের উচিত শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগকে ক্রমশঃ পৃথক করা। এই কাজে ভারত

ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ

সরকার এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারেন নাই। সর্বশেষে, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সেই বিষয়েও নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে কিছুটা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মানজনক, ন্যায়সঙ্গত ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো এবং পারস্পরিক মীমাংসার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের সমাধানে উৎসাহ প্রদান করিতে ভারতবর্ষের চেষ্টা করা উচিত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বশান্তির প্রয়াস

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, বেকার ভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু নির্দেশাত্মক নীতিতে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু ইহা করিতে রাষ্ট্র আইনগতভাবে বাধ্য নহে। যদি জনগণের অর্থনৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার (Fundamental Right to Economic Equality) থাকিত, তবে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিতে হইত। ভারতে বর্তমান বেকারসমস্যা খুবই তীব্র; কিন্তু এই পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষে কাহাকেও বেকার ভাতা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে উল্লিখিত কর্তব্য যে রাষ্ট্র সর্বদাই পালন করে তাহা নহে; কিন্তু যদি এই নীতিগুলিকে জনগণের মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হইত, তবে দেশে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হইত।

অর্থনৈতিক সাম্য, বেকার ভাতা, শোষণ-মুক্তি

মৌলিক অধিকার পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাম্যের ব্যবস্থা নাই, অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপযোগিতা (Utility of the Directive Principles): যখন ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি যেহেতু আদালত-গ্রাহ্য নহে, সেইজন্য তাহা শাসনতন্ত্রে বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু এই ধারণা যে সুবিবেচনাপ্রসূত নহে তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও আমাদের দেশের আদালত নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী বলিয়া কোনও আইনকে বাতিল করিতে

পারে না, তবুও অনেক আইনের শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা বজায় রাখা হইয়াছে যেহেতু সেইগুলি নির্দেশাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন আইন শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারা অনুযায়ী অধিকারের উপর 'অকারণ নিয়ন্ত্রণ' চাপাইয়া দেয় বলিয়া কেহ অভিযোগ করে, এবং যদি সেই আইন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় তবে আদালত সেই আইনটি অকারণে জনগণের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবে। ১৯৫১ সালে 'বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসারা' মামলায় আদালত অনুরূপ রায় প্রদান করেন।[১] যদিও শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কখনও মৌলিক অধিকারগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তবুও মৌলিক অধিকারের ভূমিকা এবং এক্তিয়ার বিবেচনা করিবার সময় আদালত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বরং দেখা গিয়াছে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার জন্যও কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের সংশোধন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে ৩৯নং ধারায় বলা হইয়াছে যে দেশের বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যেন ইহাতে সকলের কল্যাণ হয়। এই নীতি অনুযায়ী কৃষি এবং অর্থনৈতিক সংস্কার করিবার জন্য ভারত সরকার সম্পত্তি সম্পর্কিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ-যোগ্য নহে, কিন্তু ৩২নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য, সুতরাং কোন অবস্থায়ই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য না হইলেও বিশেষ উপযোগী

প্রয়োজনবোধে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়

যদিও নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য নহে তবুও আমাদের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে এই নীতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন গণতান্ত্রিক দেশই এই নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। এই নীতিগুলির পিছনে কোন আইনগ্রাহ্য অনুমোদন নাই সত্য,

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য না হইলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

১। Bombay State vs. Balsara

কিন্তু, এইগুলির অনুমোদন (sanction) হইতেছে রাজনৈতিক। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সরকারের প্রতি শাসনতন্ত্রের সাধারণ নির্দেশ। রাষ্ট্র যদি এই নীতিগুলি অনুযায়ী পরিচালিত না হয়, তবে সরকারকে এইজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।[২]

যদি সরকার এই নীতিগুলি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত না করেন, তবে পার্লামেণ্টের বিরোধীপক্ষ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং এজন্য সরকারের সমালোচনা করিতে পারে। এখানেই রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সার্থকতা। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের জন্য কতিপয় নৈতিক উপদেশ। এইগুলির অন্তত একটি শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ভারতকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করিতেছে

ভারত সরকার এই নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার (৪০নং ধারা) ও জাতীয় আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন করিবার প্রচেষ্টা নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী প্রচলিত হইতেছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। অপরদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক। এইভাবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ হইয়াছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য (Differences between the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights) **:** রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে নিম্নরূপ :—(১) এই নীতিগুলি আদালতগ্রাহ্য নহে ; সুতরাং আদালত কর্তৃক এইগুলিকে কার্যকর করা যায় না। (২) এই নীতিগুলি যদিও রাষ্ট্রের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তবুও ইহারা রাষ্ট্রকে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। (৩) নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের সংঘাতের সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারগুলি বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি

২। গণপরিষদে শাসনতন্ত্রের এই বিধানগুলি লইয়া আলোচনাকালে ডক্টর আম্বেদকর মন্তব্য করিয়াছেন, "If any Government ignores them, they will certainly have to answer for them before the *electorate* at the election time."

নহে। মৌলিক অধিকারের সংঘাতের সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারগুলি বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নহে।

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে।

মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের উপর সীমা আরোপ করে, নির্দেশাত্মক নীতি দায়িত্ব আরোপ করে

প্রথমতঃ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কতিপয় কাজের উপর সীমা আরোপ করে। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করিবে অথবা কিভাবে নিজেদের দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সেই ব্যাপারে দায়িত্ব আরোপ করে এবং নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করার অজুহাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না

দ্বিতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে সেই মর্মে আইনপ্রণয়ন করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য কোন আইন প্রণীত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার অজুহাতে আইন অমান্য করিবার অধিকার নাই। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ শাসনতন্ত্রই নাগরিকদের এই অধিকারগুলি দিয়াছে এবং এইজন্যই এইগুলি হইতেছে "মৌলিক" অধিকার।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য নহে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য

তৃতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতি আদালত-গ্রাহ্য নহে। সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি কোন নির্দেশাত্মক নীতিবিরোধী হয় তাহা হইলে আদালত সেই আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন আইন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তবে আদালত সেই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে। আবার আদালত কোন অবস্থায়ই সরকারকে এই নীতিগুলি অনুসরণে বাধ্য করিতে পারে না।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিতে পারে না

চতুর্থতঃ, যদি নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় তবে মৌলিক অধিকারটিই বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিটি নহে। সর্বশেষে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উদ্দেশ্যের দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক; কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা,

বেকারভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সমাজতান্ত্রিক।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক— মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

Exercise

1. ভারতে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পরিধি এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[Discuss the scope and utility of the Directive Principles of State Policy in India.]

2. রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বর্ণনা দাও।

[Give an outline of the Directive Principles of State Policy.]

3. রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের পার্থক্য কোথায়? এই নীতিগুলির কি কোন উপযোগিতা আছে?

[In what respects do the Directive Principles of the State Policy differ from the Fundamental Rights ? Have these principles any utility ?]

4. ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি বলি.ত কি বুঝায়? উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

[What is meant by Directive Principles of State Poilcy as adopted in the Constitution of India ? Illustrate your answer.]

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র
(Constitution of the State)

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of a Constitution) **:** প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একজন শাসনকর্তা থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হইবে অথবা নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক থাকিবে,—সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য ডাইসির মতে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতর সার্বভৌম শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি। সরকারের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যাদি সবই কতিপয় লিখিত অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিতর সার্বভৌম শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে

শাসনতন্ত্রকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী কোন দেশের শাসনতন্ত্র বলিতে সেই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সব নিয়মকানুন বুঝায়; এই নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রথাগত বিধান এবং আদালত-গ্রাহ্য আইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই লিপিবদ্ধ আইন যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিরূপিত হয়।

শাসনতন্ত্রের দুইটি অর্থ

১। "A constitution is a product of all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign powers in the state"—Dicey

সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা অনেক বেশী। সাধারণ আইন যখন খুশী তখনই পরিবর্তন করা যায়; কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে হইলে শাসনতন্ত্র-নির্দেশিত পথে আবার অগ্রসর হইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা।

সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতন্ত্রের মর্যাদা বেশী

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions): শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ লিখিত (written) এবং অলিখিত (unwritten) এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান একটি অথবা কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনতন্ত্রের যখনই যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডে আমরা অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথবা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিতভাবে থাকিতে পারে।[২] ইংলণ্ডের ১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (Bill of Rights) ইত্যাদি লিখিতভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভার ন্যায় কাজ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমরা মূলগত পার্থক্য বা বিজ্ঞানসম্মত

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত নহে

২। ব্যাখ্যার মাধ্যমেও লিখিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সম্ভবপর। লর্ড ব্রাইস এই প্রসঙ্গে বলেন, 'Written Constitutions are developed by interpretations fringed with decisions and enlarged by customs as that after a time the letter of the text does not convey the full effect.

পার্থক্য বলিতে পারি না। আবার, লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী-রূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে। যদিও আমেরিকায় তাহা সম্ভবপর, ভারতে তাহা সম্ভবপর নয়। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে যদি নাগরিকদের মধ্যে কেহ এই মর্মে অভিযোগ করে যে সংশ্লিষ্ট আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং যদি তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা বিজ্ঞান-সম্মত নয়

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্র জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বেশী উপযোগী। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বিবেচিত হইলে এই যুক্তির কোন সারবত্তা থাকে না। শাসনতন্ত্রে, লিখিত এবং অলিখিত উভয় প্রকার বিধানই থাকা দরকার; তাহা না হইলে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। জাতীয় জীবন-ধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্র রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রকে আবার নমনীয় (Flexible) এবং অনমনীয় (Rigid) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা খুব সহজসাধ্য নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয়। যেভাবে সাধারণ আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সংশোধন এবং পরিবর্তন করা যায়। এইজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, এবং ইহার সংশোধন করিতে হইলে দুইটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার দুই পক্ষের মোট সদস্যদের ⅔ অংশকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চৌত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ

নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র

করিতে হইবে। এইভাবে গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারে প্রথম ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের (অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজ্যের) আইন পরিষদ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের (অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজ্যের) বিশেষ সম্মিলন। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলণ্ডে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথবা অনমনীয়ঃ শাসনতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে এই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২৬টি নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহা কিছুটা সম্ভব হইয়াছে প্রথাগত বিধানের (conventions) দরুণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা। যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার নিজেদের ক্রিয়াকলাপের শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়, তখনই সুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। তখন সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বহুক্ষেত্রে তথাকথিত সংশোধন ছাড়াই পরিবর্তিত হইয়াছে।[৩] অপরদিকে, বৃটেনে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহা সহজ পদ্ধতি হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কতকটা অনমনীয়

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয়

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বলা হয়, "...The American constitution is a living organism. It is a Darwinian and not a Newtonian affair."

বিলটি অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্প সময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অথবা রাজ্য আইন-সভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও নমনীয়। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনের কার্যক্ষেত্র ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কার্যতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিতে পারে না ; অথচ সংশোধনের মাধ্যমে কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে। (১) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন ও শাসন-বিভাগীয় সম্পর্ক, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, পার্লামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-কোন সংশোধনী বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের বিধান সভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। এইভাবে বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া চাই, তবেই শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (২) শাসনতন্ত্রের অন্যান্য সংশোধন করিতে হইলে ঐ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইতে হইবে। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (৩) কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন, নূতন রাজ্যের সৃষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, কোন রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন অথবা বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ

ভারতে শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট (by simple majority) দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায়। সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারসহ যে-কোন ধারার সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে আসিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

অনমনীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য (Observations about rigid Constitutions) ঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (Permanence)। এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্র সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাসনতন্ত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অনমনীয় শাসনতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে যে ক্ষমতার বণ্টন হয় তাহা যাহাতে ঘনঘন পরিবর্তিত না হয় সেজন্য শাসনতন্ত্র অনমনীয়, তাহা ছাড়া, বহু যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেখা যায়। সেইগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়া দরকার। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না।

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বিশেষ উপযোগী

শাসনতন্ত্রকে অতিরিক্ত অনমনীয় করার চেষ্টা

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল যে, জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রিসভার সৃষ্টি করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেইজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাঠামোর দিক হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নহে। তবে সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রচলিত প্রথার প্রভাবে নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা স্পষ্ট থাকে না

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা এবং অসুবিধা (Relative Merits and Demerits of Written and Unwritten Constitutions) **:** শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের (constitutional crisis) আশংকা থাকে।

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ ও দোষ

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতীয় প্রগতির পথ সুগম হয়। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রের একটি দোষ আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্রকে খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহারা সর্বদা স্থায়িত্ব (stability) না-ও থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথবা জনমতের দাবিতে যখন খুশী তখনই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন। তাহাতে শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়া যায় এবং শাসনতন্ত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। অলিখিত শাসনতন্ত্রগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত বিধানের ভিত্তির উপর

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

অলিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ

প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই সুস্পষ্ট হয় না। তাহাতে বিধি-নিষেধের অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (unitary system of government) অলিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক চালিত হইতে পারে,—যেমন ব্রিটেনে ইহা হইয়াছে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features of the Indian Constitution)ঃ ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। প্রথমে ইহার ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) এবং ৮টি তালিকা (Schedules) ছিল। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইবার পর ইহার ৩৮০টি অনুচ্ছেদ এবং ৯টি তালিকা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র এতবড় হইবার কারণ হইল, ইহাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয় নাই, রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির বর্ণনা—সরকারী চাকুরী, সরকারী ভাষা, তফসিলীভুক্ত গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিবিধ ধারা শাসনতন্ত্রে স্থান পাওয়ায় শাসনতন্ত্রটির আকার এত বড় হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের একটি অংশ সরকারী ভাষা এবং অপর একটি অংশ জরুরী অবস্থাকালীন বিধানের সম্পর্কে জড়িত।

ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইলঃ (১) ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। কাঠামোর দিক হইতেও ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে মোট ২২টি রাজ্য (সিকিম সমেত) ও অরুণাচল সমেত ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও কেন্দ্রীয় রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রতি ইহার ঝোঁক। বিশেষতঃ, দেশে জরুরী অবস্থায় সৃষ্টি হইলে

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

সমগ্র শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া যাইবে। জরুরী অবস্থার প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমুদয় রাজ্যসরকারগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলির বাহিরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত হইয়াছে। এই অবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিয়াছে। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী যদি কখনও কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং রাজ্যসরকারের বিধানমণ্ডল কর্তৃক আইনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রণীত আইনই গৃহীত হইবে, রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল হইবে। অবশ্য রাষ্ট্রপতির অগ্রানুমতি লইয়া গৃহীত রাজ্য বিধানমণ্ডলের এই আইন বাতিল হইবে না। এইজন্যই ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনেকেই কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন অনুযায়ী ভারতীয় পার্লামেন্টের হাতে শাসনতন্ত্রের যে-কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যায়

(২) ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়াই 'লিখিত' (written)। ইহাতে অনেক বিষয় উল্লেখিত আছে ; যেমন, সরকারী ভাষা ও সরকারী চাকরি ইত্যাদি যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি সম্পূর্ণভাবে অনমনীয় নয়। ইহার মধ্যে আমরা নমনীয়তা এবং কঠোরতার সংমিশ্রণ (partly rigid and partly flexible) দেখিতে পাই। ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইলে সংশোধনী প্রস্তাবটি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের প্রতিটিরই অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেন্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই। আবার কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতন্ত্র সংশোধনের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রথমে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে অনুমোদিত হওয়া চাই এবং তৎপর ইহা মোট রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির অন্তত অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। শাসনতন্ত্রের কোন বিধানই সংশোধনের অযোগ্য নহে। শাসনতন্ত্রের বিধান

শাসনতন্ত্রটি লিখিত, কিন্তু ইহা খুব কঠোর অথবা খুব নমনীয় নয়, যদিও নমনীয়তার দিকে ইহার বেশী প্রবণতা দেখা যায়

অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলির সীমানা, আয়তন এবং নামের পরিবর্তন, শাসনতন্ত্রের ১৬৯নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা অথবা তুলিয়া দেওয়া এবং ৭নং অনুচ্ছেদের ৫নং তালিকা ও ২১নং অনুচ্ছেদের ৬নং তালিকা অনুযায়ী সিডিউল্ড অঞ্চল অথবা সিডিউল্ড উপজাতি শাসন করা প্রভৃতি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে। সম্প্রতি শাসনতন্ত্রের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের যে-কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হইলে সংশোধন-পদ্ধতিরও সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। (৩) একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্য কোন মূল রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র নাই।

মৌলিক অধিকার

(৪) ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে (Part III) ১২ হইতে ৩৫ নং অনুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি কখনই অবাধ বা একক নয়, কেননা জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলি বাতিল করিতে পারেন, মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে, (ক) সাম্যের অধিকার (Right to equality), (খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom), (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to religious freedom), (ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and educational rights), (চ) সম্পত্তির অধিকার (Right to property) এবং (ছ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ক্ষমতা (Right to constitutional remedies)। এই মৌলিক অধিকারের উপর কতিপয় বাধা-নিষেধও আরোপ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিবর্তনমূলক আটকের (Preventive detention) কথা উল্লেখ করা যায়। ভারত সরকার সকল সময়েই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সাধারণ সময়ে নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য। অর্থাৎ সরকার যদি নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার না করেন, তবে নাগরিকগণ এইজন্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারেন।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

(৫) মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র-পরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক

এবং অর্থনৈতিক ন্যায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুসৃত হইলে আমাদের দেশ একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

(৬) ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the constitution) স্বীকার করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের উৎস। ভারতের সুপ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের রক্ষক। তাহা ছাড়া, কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া উহা বাতিল করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

(৭) শাসনতন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিশেষ ক্ষেত্রে আইন-প্রণয়নের উপর বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাধারী একটি স্বাধীন বিচার-বিভাগ। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন যদি শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয় তাহা হইলে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সেই আইন বাতিল করার ক্ষমতা আছে। তবে এই ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের নিকট যে-কোন নাগরিককে মৌলিক অধিকার রক্ষার ভিত্তিতে সেই আইনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে হইবে।

বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষা

ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত শাসনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই আইনসভাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে থাকিবে।

(৮) ভারতের শাসনতন্ত্রে দায়িত্বশীল সরকারের (Responsible Government) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ সরকারের কাঠামো রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের ন্যায়। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের এক সমন্বয় আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। এখানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনেকটা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে গঠিত। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রপ্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী-পরিচালিত মন্ত্রিসভাই দেশের শাসন-বিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

দায়িত্বশীল সরকার

(৯) যদিও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ একটি বিরাট লিখিত শাসনতন্ত্র

প্রণয়ন করিয়াছেন তবুও এই শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান (conventions) গড়িয়া উঠিবার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন আকস্মিক কারণে একদিনের জন্য মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের ভোটে পরাজিত হয়, তবেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য কিনা সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের শাসনতন্ত্রে দেওয়া নাই। নীতিগতভাবে মন্ত্রিসভার তখন পদত্যাগ করা উচিত এই প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠা বিচিত্র নহে! আবার কোন্ অবস্থায় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন এবং কোন্ অবস্থায় মন্ত্রিসভার পরামর্শ রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিবেন সেই সম্পর্কেও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ জারী করেন। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর পুনর্গঠিত লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়।

প্রথাগত বিধানের ভূমিকা

(১০) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভারতীয়দের এক-নাগরিকতার (single citizenship) বিধান। ভারতীয়গণ সকলেই ভারতের নাগরিক,—কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকতা তাহাদের নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতীয় নাগরিকগণকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়।

এক-নাগরিকতা

(১১) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিক সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ভারতের শাসনতন্ত্রে সামাজিক সাম্য (Social Security) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। শাসনতন্ত্রে ধর্ম, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশেও এখন পর্যন্ত বর্ণগত বৈষম্য (racial discrimination) দেখা যায়। তাহা ছাড়া, ভারতে ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (communal representation) বর্জন করা হইয়াছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সামাজিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি

কাঠামো এবং প্রকৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও কেন্দ্রিকতার দিকে ইহার ঝোঁক খুব বেশী। শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-

বণ্টন এইরূপভাবে করা হইয়াছে যে, রাজ্যসরকারগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে শাসনতন্ত্র খুব অনমনীয়। কেননা সেইক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন (যাহাদের আবার মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই) এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি থাকা চাই। তাহা ছাড়া, জরুরী অবস্থায় আমাদের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সেইজন্যই সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্রটির কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়।

Exercise

1. শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান কর। বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ কর।

[Define a constitution. Classify the different constitutions.]

2. "লিখিত শাসনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্র এবং অলিখিত-শাসনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য অলীক বিভাজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"—উক্তিটি আলোচনা কর।

["The distinction between states with written and those with unwritten constitutions is an illusory basis of division."—Discuss the statement.]

3. "লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সুচিহ্নিত নয়।"—আলোচনা কর।

["Distinction between a written constitution and an unwritten constitution is not well-marked."—Discuss.]

4. লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর।

[Discuss the relative merits and demerits of written and unwritten constitutions.]

5. ভারতের শাসনতন্ত্র কি কঠোর?

[Is the Indian Constitution rigid?]

6. ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the salient features of the Indian Constitution.]

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন ধরনের সরকার
(Forms of Government)

এরিস্টটল কর্তৃক রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's Classification of States) : গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটল (১) সংখ্যানীতি এবং (২) উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) অনুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। সংখ্যানীতি অনুযায়ী এরিস্টটল বিচার করিয়াছিলেন কয়জন ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ; অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থা নির্ধারণ করা এই নীতির লক্ষ্য। সংখ্যানীতি অনুযায়ী এরিস্টটল রাষ্ট্রগুলিকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র দুই প্রকারের হইতে পারে,—স্বাভাবিক (normal) অথবা বিকৃত (perverted)। যে সকল রাষ্ট্র জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক রাষ্ট্র আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে। কোন দেশে অবশ্য যুগপৎ দুই প্রকারের সরকার রহিয়াছে ; যেমন ভারতের ক্ষেত্রে হইয়াছে। রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) অথবা এককেন্দ্রিক (Unitary) হইতে পারে। লিকক (Leacock) সরকারকে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গণতন্ত্র আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (যেমন ইংলণ্ডে দেখা যায়) এবং প্রজাতন্ত্র (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়), এই দুই প্রকার হইতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা বা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার পরিলক্ষিত হয়। প্রজাতন্ত্র আবার এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র দেখা যায়। আবার, ভারত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র দেখা যায়। এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকার মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার অথবা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার উভয়ই হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রী সরকারও মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার উভয়ই হইতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার পরিলক্ষিত হয়।

লিককের শ্রেণী-বিভাগের ত্রুটি

লিককের শ্রেণীবিভাগের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আমরা যাহাকে একনায়কতন্ত্র বলি তাহাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া একনায়কের আবির্ভাব সামরিক ইতিহাসে বিরল নয়। তাহা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) দেখিতে পাই যদিও বস্তুতঃ ইহা কমিউনিস্ট দলের একনায়কতন্ত্র। লিকক সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় এই জিনিসগুলি বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজনের শাসন বা অভিজাততন্ত্রের উল্লেখ লিককের শ্রেণী-বিভাগে দেখা যায় না। যদিও লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণী-বিভাগের একটি বিচ্যুতি আছে, তবুও আধুনিককালে লিকক্ কর্তৃক অনুসৃত সরকারের শ্রেণীবিভাগই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগে মূলতঃ তিনটি নীতি অনুসৃত হয়। গেটেলের মতে এই তিনটি নীতি হইল,—

আধুনিক শ্রেণী-বিভাগের নীতি

(১) সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্যা নির্ণয় করা, (২) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিশেষতঃ, শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন বিবেচনা করা। প্রথম নীতি অনুযায়ী সরকারকে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী সরকারকে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। তৃতীয় নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়। ইহাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে পারে। যেমন, ভারতের শাসনব্যবস্থায় আমরা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং মন্ত্রিসভা চালিত সরকার দেখিতে পাই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of Federation) **ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি জানিতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতে সৃষ্ট হইতে পারে। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে (integration by absorption) যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রথমটি হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ঐক্যানুভূতি পরিলক্ষিত হইবে; এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ পরস্পরের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিতে চাহিবে কিন্তু সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না।[১]

কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়

যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ডাইসির মত

যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার প্রধান শর্তগুলি হইতেছে অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক সান্নিধ্য, জাতীয় ঐক্যানুভূতি, মিলনের স্পৃহা এবং আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা। হোয়েরে বিভিন্ন মূল রাজ্যের পরস্পর মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষার কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং একই প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বিভিন্ন রাজ্যকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মিলিত হইবার জন্য প্রণোদিত করে। বিভিন্ন রাজ্যের মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা যেমন সৃষ্ট হইতে পারে, অনুরূপ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে দুইটি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। একটি হইতেছে centripetal tendency বা কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব। অপরটি হইতেছে centrifugal tendency বা কেন্দ্রাতিগ প্রভাব। ডাইসি কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য বড় এককেন্দ্রিক রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহা হইতেছে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব।

অঙ্গরাজ্যগুলির মিলিত হইবার স্পৃহা কেন হয়

১। ডাইসির ভাষায় **"They must desire Union but not unity."** হোয়েরে **(K.C. Wheare)** অনুরূপ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন **"Communities or states must desire to be united, but not to be *unitary*."**

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্য সাধারণ স্বার্থগুলির সম্পর্কিত ব্যাপারে সমগ্র দেশের জন্য একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে এবং এই সরকার সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন, মুদ্রাব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালনা) সমগ্র দেশের উপর নিয়ন্ত্রণী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেরই নিজস্ব কতিপয় সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীন, আঞ্চলিক সরকারের ; এইভাবেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই।[২] ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ও জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ গঠন করিবার পক্ষে অনুকূল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে। এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (Union) গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে। এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। জাতীয় সংহতি বজায় রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন হয়। আবার প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার দরকার হয়। এই দুইটি প্রয়োজনের বাস্তব রূপ হইতেছে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেখানে সব অঙ্গরাজ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট অর্পণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৩] কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা

জাতীয় ঐক্য এবং রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীনতার সংমিশ্রণ

যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়

২। "A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty." Discuss.

৩। "In Federal constitution the powers of government are divided between a government for the whole country and government for parts of the country in such a way that each government is legally independent within its sphere."

—K. C. Wheare : *Modern Constitutions*

হোয়েরে আরও বলেন: "By the Federal Principle I mean the method of dividing powers so that general and regional Governments are each within a sphere, co-ordinate and independent."

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্র। সেইজন্য এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক ঐক্য এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ (ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে-কোন রাজ্যের অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে (আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই, তবুও এই ব্যবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রসারিত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও বাঁটোয়ারা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার সার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজ্য সরকারই স্বীকার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি রাজনৈতিক কৌশল।[৪] যদি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি

দ্বৈত নাগরিকতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সমান মর্যাদা

৪। "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights."—Dicey

হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা থাকে ; যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা।

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টন করিবার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা বিশেষভাবে অনুভূত হয় বড় বড় দেশগুলির ক্ষেত্রে। দুইভাবে আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টিত হইতে পারে। প্রথমটি হইতেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)। এই ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার সমগ্র ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিয়া নিজের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি করে এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা আরোপ করে। দ্বিতীয়টি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারসমূহ গঠিত হয় এবং শাসনতন্ত্রের দ্বারাই ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী সরকার এককেন্দ্রিক থাকে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়।

আঞ্চলিক ক্ষমতার বণ্টন :
(১) বিকেন্দ্রীকরণ
(২) ক্ষমতার বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Federal State) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই ঃ

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান (co-existence of governments) থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

১। দুই ধরণের সরকার,—কেন্দ্রীয় সরকার, এবং রাজ্য-সরকার

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের অসাধারণ ও সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদান করা হয়। শাসনতন্ত্রে লিখিত নাই এইরূপ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) বলা হয়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে অঙ্গরাজ্যগুলিই এই ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে।

২। ক্ষমতা বণ্টন

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে।

৩। লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা এবং কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কোন অবস্থায় শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করিতে পারে না। যদি ক্ষমতা বণ্টন অথবা কার্যপরিধির পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় কিংবা শাসনতন্ত্র সংশোধিত করিবার দরকার হয় তবে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সংশোধন পদ্ধতির মারফৎ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্যই শাসনতন্ত্রটি লিখিত এবং অনমনীয় হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক আইনসভাকেই অ-সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law-making Body) হইতে হইবে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য যাহাতে সর্বদা বজায় থাকে সেইজন্য শাসনতন্ত্রের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যা-কর্তা হিসাবে কাজ করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা।

৪। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—ইহার মূলসূত্র

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে। অবশ্য আঞ্চলিক সরকার-গুলিরও আলাদা আদালত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা (existence of an independent and impartial judiciary)। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইন-গুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের অভিভাবক (Guardian of the constitution) বলা হয়।

৫। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা (double citizenship) থাকে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা চালু করা হয় নাই। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাগরিক। রাজ্যসরকারের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে হয় না।

৬। দ্বিনাগরিকতা

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকারগুলি ইহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দেশের মোট রাজস্বের একটি অংশ পাইয়া থাকে।

৭। রাজস্ব বণ্টন

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যসরকার (সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করিয়া আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এই প্রকার ব্যবচ্ছেদের (secession) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একই রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির পরিচালনা করিয়া থাকে। সেই দেশে দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোনও রাজ্যের ব্যবচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট রাজ্যসরকারের আনুগত্য

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত (Conditions essential to the formation of a Federal Union)ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয়। ইহার মধ্যে একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূল রাষ্ট্রকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই ভাবকে আমরা কেন্দ্রাভিগামী ভাব (centripetal tendency) বলিতে পারি। ডাইসি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নিজের কাজের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন

করে এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইহাকে আমরা "Federation by disaggregation" বলিতে পারি। এই প্রভাবকে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব (centrifugal tendency) বলা হয়। ডাইসি ইহার উল্লেখ করেন নাই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে উভয় প্রভাবই কার্যকর হইতেছে; তবে বেশীর ভাগ কেন্দ্রে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবটিই কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত হইতেছে, বিভিন্ন রাজ্য একদিকে যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়, অপরদিকে ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধও টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত আছে।

ভৌগোলিক যোগসূত্র

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূল-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (Geographical contiguity) থাকা প্রয়োজন। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবোধ আসে। যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বতন অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র ছিল না। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পূর্বতন পাকিস্তানের ভৌগোলিক যোগসূত্রের অভাবের অন্যতম পরিণতি।

জাতীয়তাবোধ

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসিগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। যদি অঙ্গরাজ্যগুলির বিকৃত জাতীয়তাবোধ (perverted nationalism) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের পারস্পরিক সংঘাত সর্বদা লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূল-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও সম্পদ, এবং রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মূলরাজ্যগুলির আয়তন এবং সম্পদের বৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মূলরাজ্যেরই সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি মূলরাজ্য বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর মূলরাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে।

মূলরাজ্যগুলির মধ্যে সমতা

চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আঞ্চলিকস্বার্থের সংরক্ষণ

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; এই আদর্শ হইতেছে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা হয় নিম্নলিখিত কারণেঃ বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং একই প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। আবার, নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার আগ্রহ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখার প্রেরণা দেয়। এই দুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠন সফল হয় না। এই দুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ হইতেও সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে পারে। জাতীয় ঐক্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। সদাসচেতন জনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

জাতীয়তাবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা অপরিহার্য। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা নির্দেশ করে ইহার পর সমুদয় ক্ষমতা (residuary powers) বিভিন্ন মূলরাজ্য অথবা রাজ্য সরকারের হাতে আসে। যাহাতে

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ সরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরস্পরের মধ্যে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে মূলরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্যই একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ত্র। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রটিকে লিখিত হইতেই হইবে। তাহা না হইলে শাসনব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই লিখিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যে লিখিত শাসনতন্ত্রের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম উপাদান হইতেছে ভৌগোলিক যোগসূত্র, এবং ভারতে ইহা আছে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকায় ভারতে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অধিবাসীগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে একজাতীয়তা-বোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই থাকিতে চায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই প্রকার। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হইয়াছে,—রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নহে। ভারতে দ্বিনাগরিকতা প্রথাও নাই এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ক্রমশঃই এক-কেন্দ্রিক সরকারের (Unitary Government) দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ভারতে এই শর্তগুলি কতটা পূরণ হইয়াছে

ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ এবং অঙ্গরাজ্যগুলির একই প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতীয়দের দ্বিনাগরিকতা নাই

এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Merits of a Federal Government): ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ইহা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব এবং কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিবার উপায় নির্দেশ করে।[৫] যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের সুবিধাদি ভোগ করিতে চায়, অথচ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনও বজায় রাখিতে চায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এই সুবিধা পাইয়া থাকে। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আইন প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণয়ন করা সম্ভব। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আপন আপন শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং তাহা যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভবপর। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর উপযোগী। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাষা, সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। নাগাল্যাণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ দৃঢ় করা হইয়াছে। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

মূল রাজ্যের লোকেরা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে সন্তুষ্ট থাকে, বড় বড় দেশের পক্ষে ইহা উপযোগী

৫। "It furnishes the means of maintaining an equilibrium between the centrifugal and centripetal forces in a state of widely different tendencies."

বিশেষ উপযোগী। বড় বড় বহুজাতি সমন্বিত দেশগুলির পক্ষে অথবা ভৌগোলিক, বংশগত অথবা অন্যান্য ব্যবধানের জন্য বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীদের লইয়া গঠিত দেশগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী। এই দেশগুলিকে যদি আংশিক স্থানীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই ইহারা নিজেদের স্বার্থে ঐক্য বজায় রাখিতে খুবই সচেষ্ট হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

তৃতীয়তঃ, লর্ড ব্রাইসের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসন উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা লইয়া এইরূপভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদা সরকার থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হওয়ায় শাসনকার্যে অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিরও সঙ্গত কারণ থাকে।

লর্ড ব্রাইস নির্দেশিত গুণ

শাসনব্যবস্থা উন্নত হয়

যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ (Demerits of Federal Government)**ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে। প্রথমতঃ, শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলি প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন করার উপর নিজেদের অধিকার দাবী করিয়া জাতীয় সরকারকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে।[৬] ক্ষমতা বণ্টন এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ এবং

অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বিব্রত করিতে পারে

৬। "The members of the federal union, because of their rights over persons and property and their right to legislate in certain matters, may seriously embarrass the national government in enforcing its treaty obligations, The experience of the U. S. bears witness to this difficulty."—Gettell

কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, কোন অঙ্গরাজ্যে যদি সেই দল সরকার গঠন না করে, তবে উভয় সরকারের মধ্যে প্রতি পদে মতভেদের আশংকা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল, মন্থর ও জটিল

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুণ সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুই প্রকার সরকার থাকায় সরকারের ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব ঘটিয়া থাকে ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপর পক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পারিক বিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসীও হইতে পারে।

ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত, কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্র দেশে একই ধরনের আইন না হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইলে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন লইয়া বিরোধের সৃষ্টিও বিরল নহে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরস্পরবিরোধী অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। আমেরিকায় আমরা ইহা দেখিয়াছি। বর্তমানে অনেক দেশেই শিল্প-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিটি অনুভূত হইয়াছে।

উপসংহার :—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত অপগুণগুলি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। বরং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে সেই দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় ঐক্য বজায় আছে। সুইজারল্যাণ্ডে যদি উনিশটি ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধ-ক্যাণ্টন সম্মিলিতভাবে টিকিয়া না থাকিত তবে ইউরোপের শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ঘটিত। কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে সম্মিলিতভাবে বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of a Unitary Government): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থায় এককভাবে কর্তৃত্ব করে। এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে নিজের সুবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে,—আবার ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া সমগ্র দেশে নিজেকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটি মাত্র সরকার এবং একটিমাত্র আইনসভা থাকে। এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকে।[৭] ডাইসি (Dicey) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে "একই কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার স্বভাবজাত প্রয়োগ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৮]

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের একক কর্তৃত্ব থাকে

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত হইতে পারে। ইংলণ্ডে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই এবং সেই দেশের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য থাকে না বলিয়া শাসনতন্ত্রটিও অনমনীয় হয় না। এই ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য এবং সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে। সার্বভৌম আইন সভা যে কোন সময়েই

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র নমনীয় থাকে এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে

৭। "The essence of a Unitary State is that the power of the Central Government is unrestricted, for the constitution......does not admit any other law-making body than the central one."—C. F. Strong.

৮। "The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power."—Dicey.

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Federal State and a Unitary State) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোন প্রকার সরকার নাই; সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যে স্থানীয় শাসন বিভাগ (local administration) থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যেমন স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে; স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সহিত জড়িত সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা একমাত্র এককেন্দ্রিক সরকারের।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বণ্টন হয়। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র শাসন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেসর্বা

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকে না। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত থাকে না

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। কিন্তু, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। কিন্তু ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র লিখিত। তাহা ছাড়া, ইহা ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মত খুব নমনীয় নয়।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে অনেকক্ষেত্রেই, যেমন ইংলণ্ডে, আমরা সার্বভৌম আইনসভা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন অঙ্গরাজ্যের বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য যেমন একটি স্বাধীন এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থাকে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সেইপ্রকার স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় নাই।

আইন সভার প্রাধান্য

ক্ষমতার দিক হইতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র যে সর্বদাই বিকেন্দ্রীভূত থাকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলণ্ডে অনেক সময়েই স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আবার ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলির অনেক ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অনেক সময়েই কম প্রদান করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of a unitary form of Government): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইতেছে সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অনুসৃত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন এবং শাসনপরিচালনায় সরকারের একই নীতি অনুসরণ করা হয় বলিয়া শাসনতন্ত্র কোন সময়েই জটিল ও বিরাট হয় না। ছোট ছোট দেশের ক্ষেত্রে যেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে না, সেইগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া যে সকল দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী।

আইন ও শাসন-পরিকল্পনার অখণ্ডতা

যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষানীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রুতসিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয় সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ

শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তা এবং ব্যয়সংকোচন, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণ

সুবিধা , আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় যখন খুশী তখনই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়। গতিশীল সমাজের চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া পার্লামেণ্টও যখন যেমন প্রয়োজন সেই প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উৎকর্ষের সূচনা করে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উৎকর্ষের সূচক

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of a unitary form of Government): বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল ইহাতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে না। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা সমগ্র দেশের জন্য প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই বেশী এবং যাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁহারা কখনই এই ধরণের সরকার সমর্থন করেন না।

ইহা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সরকারী ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে বহুলাংশে নিরুৎসাহী করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহার ফলে স্থানীয় অথবা আঞ্চলিক শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পদে হস্তক্ষেপ করে। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শাসনকার্যের উৎকর্ষ নষ্ট করে

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation): কোন দেশের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কিনা তাহা জানিবার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা

জাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই কতিপয় মূলরাজ্য নিজেদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সমর্পণ করে। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান (co-existence of Governments) দেখিতে পাই। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় এবং রাজ্যসরকারকে নিজ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতার বণ্টন এই দুইটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; তাহা ছাড়া, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত: দ্বি-নাগরিকতা (double citizenship) দেখা যায়। শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত ক্ষমতাগুলিও (Residuary powers) সাধারণতঃ রাজ্যসরকারগুলি ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের সরকারের সহাবস্থান দেখা যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর ভিত্তিশীল, এবং মোট ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (অরুণাচল সমেত) লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই আলাদা সরকার আছে এবং সেইগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে ক্ষমতার বণ্টন, লিখিত শাসনতন্ত্র, অনমনীয় শাসনতন্ত্র, শাসনতন্ত্রের প্রধান, স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলি বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে (পরিপূর্ণভাবে না হইলেও) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Union), রাজ্য (State) এবং যুগ্ম (Concurrent) তালিকার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলির সংখ্যা হইতেছে ৯৭টি। রাজ্য তালিকায় ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং যুগ্ম তালিকায় ৫৭টি বিষয় স্থান পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী ভারতেও ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রগুলি যে মর্যাদা ভোগ করে, ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূলরাজ্য সেই মর্যাদা পায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মূল রাষ্ট্রের অধিকার (State rights) হিসাবে যে বিধান আছে, ভারতের শাসনতন্ত্রে তাহা

নাই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে ভারতের মূল রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব ছিল না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে মূল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সত্তা ছিল। তাহা ছাড়া, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪৮নং ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বহির্ভূত-বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতাগুলি (Residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলি ভোগ করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত; রাজ্যসরকারগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। কিন্তু ভারতে শুধু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভিন্ন অন্য রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র নাই।

ভারতের রাজ্যগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র নাই

তৃতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে (-৫৫-১৫৬নং ধারা)। আবার যখন রাজ্যপাল ইচ্ছা করেন (২০১নং ধারা), তখনই রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাইতে পারেন। ইহা হইতেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতা প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন; সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায় না।

ভারতে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধীন

চতুর্থতঃ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে শুধু পার্লামেণ্টই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোন মূল রাজ্যের সীমানা বা আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে, (৪নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ) এবং এইজন্য মূল রাজ্যের আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটি পার্লামেণ্টে সুপারিশ করিবার পূর্বে শুধু রাজ্যসরকারের আইন-সভার অভিমত জানিয়া লইবেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ৩নং ধারার সংশোধন অনুযায়ী ইহাও রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রগুলির ন্যায় ভারতের রাজ্যগুলি অবিনশ্বর নহে। ভারতে পূর্বে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ছিল ১৭; এখন ইহা হইয়াছে ২২।

ভারতের পার্লামেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে

পঞ্চমতঃ, রাজ্যগুলির অধিকারের সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি ভারতের শাসনতন্ত্র দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ৫০টি মূল রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব আছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টের রাজ্যসভায় ইহা নাই। ইহা হইতেই ভারতীয় মূল

ভারতের মূল রাজ্যগুলির মর্যাদার সমতার অভাব

রাজ্যগুলির মর্যাদার অসমতা এবং সমগ্রদেশের শাসনব্যবস্থার এককেন্দ্রিকতা প্রমাণিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, ভারতের নাগরিকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের ন্যায় দ্বি-নাগরিকতা ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রের ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক, কোন রাজসরকারের নাগরিক নহেন।

ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব নাই

সপ্তমতঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চপদস্থ নাগরিকগণ যে শুধু রাজ্য সরকারের আইন বা বিধান অনুযায়ী কাজ করেন তাহা নহে,—তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইনগুলিকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ সচিবগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের ৩১২নং ধারা অনুযায়ী সর্বভারতীয় সরকারী কাজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও অনেকক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের কিছু কাজ করিয়া দিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্রের ২৫৮নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রাজ্যকে কিছু শাসন-সংক্রান্ত কাজের ভার দিতে পারে, এবং ২৫৮ (ক) নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যসরকারও শাসনবিভাগ সম্পর্কিত কতিপয় কাজের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারে। যদিও শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আছে, তবুও শাসনকার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। সম্ভবতঃ, শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ত্রুটিগুলি এইভাবে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।

রাজ্যসরকারের শাসন সম্পর্কিত কাজের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে

অষ্টমতঃ, দেশে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন তাহা শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রপ্রবণ করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কোন রাজ্যসরকার কখনও গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের অথবা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগ রাজ্যসরকারগুলিকে কতিপয় ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সমুদয় বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে (শাসনতন্ত্রের ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭নং ধারা)। শুধু

তাহাই নহে, জরুরী অবস্থা ছাড়াও পার্লামেণ্টের রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্টে শাসনতন্ত্রে ২৪৯নং ধারা অনুযায়ী সেই বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় উপাদান এইটুকু আছে যে রাজ্যসভার সম্মতি ব্যতীত রাজ্যসরকারের আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত হইতে পারে না।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা থাকায় শাসনতন্ত্রটি কেন্দ্রপ্রবণ হয়

নবমতঃ, অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজ্যসরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আয়কর, মূলধন মুনাফা কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিবার এবং সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যদিও বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীগণই এই কর প্রদান করে। তাহা ছাড়া, অন্তঃশুল্ক এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর ধার্যের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। রাজ্যসরকারের লেন-দেন ও আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যে একাউনটেণ্ট জেনারেল (Accountant General) থাকেন, তিনিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। একাউনটেণ্ট জেনারেলের উপর যিনি কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (Comptroller & Auditor General) থাকেন, তাঁহাকেও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক সাহায্যের জন্য সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকে, এবং রাজ্যসরকারগুলি কতটা আর্থিক সাহায্য পাইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করেন। ফিনান্স কমিশনের বিধানসমূহ রাজ্য-সরকারগুলিকে মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ক্ষমতা

দশমতঃ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলির যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হইলেও সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তিত হইতেছে। ইহাও আমাদের শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতার ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় নাগরিকদের বর্তমানে একই জাতীয় জনসমষ্টির (nationality) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল আছে। যদিও শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক সংশোধন অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস হইতে সেই রাজ্য-

ভারতে শুধু একটিই রাষ্ট্রভাষা

গুলিতে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইতেছে, তবুও সেইগুলি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। শাসনতন্ত্রের এই বিধানগুলি আমাদের শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক প্রমাণিত করে।

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক সন্ধির শর্তাদি পালনের জন্য পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ে যে কোন রাজ্যের জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, দুই বা আরও বেশী রাজ্যসরকার অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিচার-ব্যবস্থার পরিচালনার নিয়মকানুন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলিতে একই প্রকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও মূল রাষ্ট্রগুলির বিচার-বিভাগ ও পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা

তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টে এককভাবে আইন-প্রণয়ন করিয়া মূল রাজ্যগুলির সীমানার পরিবর্তন করিতে পারে। এই কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে যদিও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের মতামত জানিতে হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আইন রাজ্যসরকারগুলি পালন করিতে বাধ্য হয়। তাহা না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজসরকারের কর্তৃত্ব জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি শাসন-বিভাগের সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য। সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অক্লান্ত প্রয়াস ইত্যাদি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজ্যসরকারগুলির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা সূচিত করে। এইজন্যই বলা হয়, ভারতীয় শাসনতন্ত্র কাঠামোর দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও, প্রকৃতির দিক হইতে এককেন্দ্রিক। সেইজন্য অধ্যাপক হোয়েরে (Professor Wheare) ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই শাসনতন্ত্র হইতেছে অর্ধ-পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রীয়।[১]

১। ("A system of government which is quasi-federal...a Unitary State with subsidiary federal features rather than a Federal State with subsidiary forces".) Wheare—Federal Government (1951) P. 18. কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ শ্রীদুর্গাদাস বসু এই যুক্তি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'The constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both. It is a union of composite state of a novel type. It enshrines the principle that in spite of federation the national interest ought to be paramount." D. Basu, Commentary on the Constitution of India, Vol. 1.

আমাদের শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক নয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার নীতিগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয় তাহার প্রমাণ হইতেছে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারে জাতীয় কংগ্রেস এবং কতিপয় রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার একসঙ্গে শাসনকার্য চালাইতেছেন। আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে স্বাভাবিক সময়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের মধ্যেই এমন বিধান আছে যাহাতে প্রয়োজন হইলে শাসনব্যবস্থাটি এককেন্দ্রিক করা যাইতে পারে। আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা ৫৫২টি দেশীয় রাজ্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিয়াছে। ভারতে এই সংহতি বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রটিকে কিছু পরিমাণে এককেন্দ্রিক না করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

ভারতের শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ এবং কেন্দ্রপ্রবণতার মধ্যে সমন্বয় হইয়াছে

পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা (The Parliamentary System of Government and the Presidential System of Government) ঃ শাসনবিভাগের সহিত আইন-বিভাগের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি হইতেছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, এবং আইনসভার অধিকার থাকে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয় না।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার বা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Parliamentary form of Government) ঃ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে একজন নামসর্বস্ব শাসন-বিভাগের প্রধান (Titular Executive Head) থাকেন এবং তিনি শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান (Real Executive Head) হইতে পৃথক। যিনি নামসর্বস্ব শাসক বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head), তিনি সর্বদা মন্ত্রিসভার পরামর্শ এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইতেছেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং জাতির

নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য

প্রতীক ; কিন্তু তিনি জাতিকে শাসন করেন না। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি রাজত্বই করেন, শাসন করেন না ("He reigns and does not govern")। শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, প্রকৃত প্রধান নহেন। কারণ ভারতে প্রকৃতপক্ষে একটি পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার হস্তেই শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা ন্যস্ত। ভারতে প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান ; তাঁহার নেতৃত্বেই মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে। শাসনবিভাগের যিনি নামসর্বস্ব প্রধান, তাঁহার মর্যাদা অপরিসীম, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা নাই।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব প্রধানকে পার্লামেণ্টের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় না। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে নিজের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ইহাকে বলা হয় মন্ত্রিসভার দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সরকারের নীতি এবং শাসনবিভাগের পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। যে-সমস্ত দেশে আইন সভার দুইটি কক্ষ আছে, সেই দেশগুলিতে মন্ত্রিসভাকে সাধারণতঃ আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাকে হাউস অফ্ কমন্সের নিকট দায়ী থাকিতে হয় ; হাউস অফ লর্ডসের নিকট নহে। ভারতবর্ষেও মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকে। আইনসভা যদি (১) মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে ; (২) মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে কোন বেসরকারী বিল অনুমোদন করে ; (৩) মন্ত্রিসভা কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট অথবা অন্য যে কোন বিল না-মঞ্জুর করে ; এবং (৪) মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ না করিয়া অথবা মন্ত্রিসভার মত না লইয়া মন্ত্রিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি কমাইয়া দেয়, তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যে কোন মন্ত্রীকে সরকারের শাসনবিভাগের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও সেইজন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য। মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার ভঙ্গ হইতে পারে এই জাতীয় কাজও করিতে পারেন না।

মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিদের পার্লামেণ্টের নিকট যৌথ দায়িত্ব (Collective Responsibility) থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইতেছে, যে কোন মন্ত্রীর দোষের জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভাই দায়ী

থাকে। তাহা ছাড়া, সরকারী নীতিতে কোন মন্ত্রীর হয়ত কতিপয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত আপত্তি বা মতভেদের কারণ থাকিতে পারে। তিনি তাঁহার বক্তব্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করিতে পারেন; কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নীতি গৃহীত হইবে, সেই সময় তাঁহার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইবেন এবং পার্লামেন্টের নিকট সেইজন্য জবাবদিহি করিবেন কিংবা পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের অংশীদার হইবেন।

যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য

কোন কোন পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেমন ইংলণ্ডে, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব দেখা যায়। আবার কোন কোন পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেমন ভারতবর্ষে, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা হইলেই যে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব থাকিবে তাহা নহে। তবে শাসনবিভাগকে পার্লামেন্টের নিকট সর্বদা দায়ী থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভাকে নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া এই দেশে শাসনতন্ত্র হইতেছে সার্বভৌম। ভারতে শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, এই জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সুতরাং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একটি প্রধান সর্ত হইতেছে, যে দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে সেই দলকে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে। যদি কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে এবং যদি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-party System) কার্যকর থাকে, তবে একাধিকদল সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারে ততক্ষণই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার সাফল্য-জনকভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসভার হাতে এমন ক্ষমতা থাকা দরকার যে ইচ্ছা করিলে প্রধানমন্ত্রী নামসর্বস্ব শাসককে দিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ভারতের লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নির্দিষ্ট

পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে

কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইতে পারে

সময়ের একবৎসর আগেই পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্রিসভার সংহতি

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিদের মধ্যে একই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, সংহতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ("homogeneity, solidarity, and common loyalty to the chief") থাকা দরকার। সি. এফ্. ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, যদি দল-ব্যবস্থা ক্যাবিনেটকে ইহার একাত্মক রূপ প্রদান করে, তবে প্রধানমন্ত্রী ইহাকে সুসংহত করেন।[১০] মন্ত্রিসভার যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের সকলকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৫ নম্বর ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ছয় মাসের জন্য পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে তিনি আর মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায় (যেমন, ইংলণ্ড), আবার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায় (যেমন, ভারতবর্ষ)।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে। যে দেশে মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দলই পার্লামেণ্টের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে (যেমন ইংলণ্ড), অর্থাৎ, যে দেশে পার্লামেণ্টীয় রাজনীতিতে আমরা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System) দেখিতে পাই, সেই দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা তখনই সার্থক হয় যখন বিরোধীদল মন্ত্রিসভাকে সরকারী নীতি নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। বিরোধীদল যত শক্তিশালী হইবে, তত ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিহত হইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিরোধী দলেব অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।[১১]

বিরোধী দলের সংহতি অস্তিত্ব

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এইজন্য ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমন্সের বিরোধী দলকে "His (Her) Majesty's loyal opposition" বলা হয়।

পার্লামেণ্টারী অথবা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের গুণাবলী (Merits of the Parliamentary Government): পার্লামেণ্টারী সরকারকে বেজহট

১০। **"If it is the Party system which gives the cabinet its homogeneity it is the position of the Prime Minister which gives it solidariiy." C. F. Strong: *Modorn Political Constitutions*, P. 221,**

১১। **আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) বলেন "Gpposition is not just a nulsance to be tolerated, but is a definite and essential part of the constitution".**

(Bagehot) "Knuckle Joint" অথবা আঙ্গুলের গাঁট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কারণ এই ধরণের সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। সরকারের এই দুইটি বিভাগ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, এবং দুইটি বিভাগের সৃজনীশক্তিমূলক পারস্পরিক ক্রিয়া একটি সুদক্ষ সরকার গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।[১২]

এইধরণের সরকারের পার্লামেণ্টের ভিতর মন্ত্রিসভার উপস্থিতি এবং মন্ত্রিদের পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক থাকায় পার্লামেণ্টও আইন প্রণয়নে শাসনবিভাগের নিকট হইতে নেতৃত্ব পায় এবং ইহাতে সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেশের শাসনকার্য চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর। মন্ত্রিদের পক্ষেও পার্লামেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকায়, বিতর্কে অংশগ্রহণ করায়, এবং বিরোধীদলের ও নিজের দলের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায়—আইনসভায় প্রকাশিত মতামত এবং জনমত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভবপর হয়।[১৩] সুতরাং মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের সাধারণ শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা জনমতের সহিত সম্পর্ক যুক্ত

যদি কখনও মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে অথবা যদি কখনও কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গিয়া যায় তবে পার্লামেণ্টের পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিয়া জনসাধারণের মতামত জানিয়া লইবার সুযোগ পার্লামেণ্টারী সরকারের থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করার ক্ষমতা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একটি বিশেষ গুণ। যদি জনমতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন মন্ত্রিসভা কাজ চালাইতে থাকে তবে জনমতের চাপে পার্লামেণ্টের পক্ষে একটি মন্ত্রিসভার স্থলে অপর একটি সরকার যাহাতে গঠিত হয় সেই ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। এইভাবে

সরকারের নমনীয়তা এবং সমন্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধান

অনেক সময়ে যে কোন মন্ত্রীর অথবা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে এণ্টনী ইডেনের স্থলে ম্যাকমিলান এবং ম্যাকমিলানের

১২। "It secures an essential co-ordination between bodies whose creative interplay is the condition of effective Government."—Laski—Grammar of Politics P. 99.

১৩। "Being in constant contact with those of their own they have opportunities of feeling the pulse of the assembly and through it the pulse of public opinion.—Bryce. Modern Democracies P. 464.

স্থলে ডগলাস হিউমের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়াও সরকারের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। এইজন্য বেজহট মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের নমনীয়তাকে একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মন্ত্রিদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী সরকারে যাঁহারা মন্ত্রিসভার সদস্য হন তাঁহারা প্রত্যেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া মন্ত্রী হন। সুতরাং দেশের লোক কী চায় এবং সরকারেরর ক্ষমতা ও কাজের কোথায় সীমারেখা থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট অবহিত থাকেন। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের এই গুণটি খুব কমই থাকে।[১৪]

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংহতি সাধন করা সম্ভবপর

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডে যে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার গঠিত হইয়াছে ইহাতে গণতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়া যদি ইংলণ্ডকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইত তবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা ছিল না। সর্বশেষে, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়। দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া পার্লামেণ্টারী সরকার চলিতে পারে না। দলীয় ব্যবস্থা যত উন্নত হয়, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাও তত উন্নত হয়। দলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার যত সুদক্ষ হয় এবং বিরোধী দলগুলি যত দৃঢ় ও সংহত হয়, দলীয় ব্যবস্থাও তত উন্নত হয় এবং ইহা নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াইয়া দেয়।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের ত্রুটি (Demerits of the Cabinet System): মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের অভাব

সরকারের অন্যতম ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় না। মন্ত্রিসভা শুধু যে শাসনবিভাগেরই প্রকৃত প্রধান তাহা নহে, ইহা পার্লামেণ্টকেও নেতৃত্ব প্রদান করে। এমন কি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই জাতীয় সরকারে বিচার

১৪। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের উল্লেখ করিয়া লাস্কি বলিয়াছেন, "The average American President represented, at the best, a leap in the dark: his average cabinet rarely represents at all. But the average member of an English Cabinet has been tried and tested over a long period in the public view."
—Laski—Grammar of Politics, P. 300.

বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। সেইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের অভাবে আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা মূল্যহীন।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের সরকার মন্ত্রিসভাকে স্বৈরাচারীতে পরিণত করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং ইহার পর দলীয় শৃংখলা এত কঠোরভাবে অনুসৃত হয় যে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্ট কোন অবস্থায়ই মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরোধিতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এই জাতীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মন্ত্রিসভারই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয়। লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) ইহাকে নয়া স্বৈরাচার (New Despotism) আখ্যা দিয়াছেন।

নয়া স্বৈরাচার

সরকারের নমনীয়তা ত্রুটি হিসাবে দেখা দিতে পারে

পার্লামেণ্টারী সরকার খুবই নমনীয়। কারণ একটি মন্ত্রিসভার উপর যদি পার্লামেণ্টের আস্থার অভাব দেখা যায় তবে অপর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। বিশেষতঃ, পার্লামেণ্টে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারিলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতে পারে; ইহাতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। সুশাসনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারের একটি দৃঢ় শাসননীতি। কিন্তু মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে ইহা দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হয় যে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হয়ত জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যে সুদক্ষ শাসক হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। যাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করেন তাঁহারা নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট পান। কিন্তু এইজন্য সরকার গঠিত হইবার পর তাঁহারা যে সুদক্ষ মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

দক্ষতার দিক হইতে সমালোচনা

চতুর্থতঃ, অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যে অনেক সময় নষ্ট হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতে নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের হিড়িক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আইনসভার সদস্যদের অনবরত দলত্যাগের ফলে কোন কোন রাজ্যে গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ইহার ফলে তখন ছয়টি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল।

অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নষ্ট হইতে পারে

উপসংহার—যদিও পার্লমেণ্টারী সরকারের বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে তবুও বর্তমানকালে পার্লামেণ্টারী সরকার খুবই জনপ্রিয়। ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অপর কোন দেশে নাই। ইংলণ্ডেই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের কার্যকারিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। ভারতেও এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জাতীয় সরকারের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেইগুলি সংশোধনের অতীত নহে। এই জাতীয় সরকারে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয় না বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তাহার উত্তরে বলিতে হয় বর্তমানকালে কোন দেশেই সঠিকভাবে এই নীতি অনুসৃত হয় না। অথচ ইংলণ্ড এবং ভারতের জনগণ সর্বাধিক পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেন। এই জাতীয় সরকারে দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন নীতি অনুসৃত হয় না অথবা সরকারের স্থিতিশীলতা থাকে না,—এই ধরনের অভিযোগ যে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নহে, ভারতের পার্লামেণ্টারী সরকারের অভিজ্ঞতাই ইহা প্রমাণ করে।

পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত (Conditions for the success of the Parliamentary System): পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রধান শর্ত হইতেছে একটি সুগঠিত বিরোধীদল, যদি একাধিক বিরোধী দল থাকে, তবে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ সুগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদল না থাকিলে এবং সেই দলের শক্তি অন্ততঃ সরকার পক্ষীয় দলের সমপর্যায়ে না হইলে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে। ঐক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষ সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমতকে সর্বদা সচেতন রাখিতে পারে এবং সরকারপক্ষীয় দলের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বেশী রাজনৈতিক দল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। দলীয় শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকাও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জনসাধারণের যে সমস্ত প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সুতরাং কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও দূরদর্শিতার উপর। এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Presidential System of Government) : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জাতীয় সরকারে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহার অধস্তন সচিবগণ আইনসভার সদস্য নহেন কিংবা আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। শাসন বিভাগের প্রধান কতদিনের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহা নিরূপণ করার ক্ষেত্রেও শাসন বিভাগ আইনসভার উপর নির্ভরশীল নহে। ক্যাবিনেট প্রথার সহিত এই জাতীয় সরকারের এইখানেই পার্থক্য।[১৫] এই জাতীয় সরকারে শাসনবিভাগের যিনি প্রধান, তিনি একাধারে নামসর্বস্ব প্রধান এবং প্রকৃত প্রধান। আইনসভার দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করান যায় না। সি. এফ্. ষ্ট্রং-এর ভাষায় তিনি হইতেছেন "an elected real executive unmovable by the action of the legislature"।

রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন, এবং আইনসভার নিকট দায়ীও নহেন

তিনি একাধারে নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে একটি ক্যাবিনেট থাকিতে পারে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে), কিন্তু সাধারণতঃ সেই ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন কিংবা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ দায়ী থাকেন রাষ্ট্রপতির নিকট; রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের নিকট। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের নিকট এবং নির্বাচিত হন জনগণের একটি নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে যতটা সম্ভব সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করার চেষ্টা করা হয়। তবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সম্পূর্ণভাবে কোন দেশেই সম্ভব হয় নাই। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে অনেক ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর, বিশেষতঃ সিনেটের উপর, নির্ভর করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি

যতটা সম্ভব ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করার চেষ্টা করা হয়

১৫। "What has been called 'Presidential Government' as contradistinguished from Cabinet or Parliamentary government, is that system in which the executive (including both the head of the state and his ministers) is constitutionally independent of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policy."—Garner. Political Science and Government P. 111

যে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন তাঁহাদের নিয়োগ অনুমোদন করে সিনেট। অবশ্য সিনেট ভদ্রতা করিয়া ("Senatorial courtesy") রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিয়োগে বাধা দেয় না। কিন্তু যদি সিনেট এই ব্যাপারে কখনও রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করে, তবে রাষ্ট্রপতি অসহায় বোধ করেন। অর্থসংক্রান্ত বিল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে—কংগ্রেসের উভয় কক্ষের উপর এবং আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি, এবং যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে সিনেটের উপর রাষ্ট্রপতিকে নির্ভর করিতে হয়।[১৩] তবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে বিচারবিভাগের যতটা সম্ভব স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়, এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আমরা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের' (checks and balance) নীতি দেখিতে পাই।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে যে রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেই দল হয়ত আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইসেনহাওয়ার যখন প্রজাতন্ত্রী দলের (Republican Party) পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তখন সিনেটে গণতন্ত্রীদলের (Democratic Party) সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তবুও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের ক্ষে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে যে সহযোগিতা থাকে না তাহা নহে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণ (Merits of the Presidential System of Government)**:** রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব। দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা কঠিন হইয়া পড়ে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভবপর।

সরকারের স্থায়িত্ব

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কেননা, এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের উভয় বিভাগের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর সীমারেখা করিয়া দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে বলিয়া এই ধরনের সরকারে শাসনবিভাগের দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

শাসনবিভাগের দক্ষতা, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সংঘাত কম থাকে

১৩। এজন্যই লাস্কি বলেন "Unaided by the Senate, the American President is a sailor on an uncharted ocean."

তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বিশেষ উপযোগী। কারণ জরুরী অবস্থায় দ্রুততার সহিত সরকারকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং সেই সময়ে সরকারের সমুদয় নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য যদি প্রকৃত ক্ষমতাশালী একজন রাষ্ট্রপতি থাকেন, তবে দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের ভিতরে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। কারণ, সেই অবস্থায় পার্লামেণ্টে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র-পতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশের শাসন কাজের ভার গ্রহণ করেন।

বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা উপযুক্ত

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটি (Demerits of the Presidential System of Government): প্রথমত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের একটি বিশেষ ত্রুটি হইতেছে এই যে এই জাতীয় সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা খুব বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, যদি মার্কিন কংগ্রেস, বিশেষতঃ সিনেট, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা না করে তবে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে অসুবিধায় পড়িতে হয়।

শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সংঘাত

দ্বিতীয়তঃ, যদি কখনও আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি একনায়কের ন্যায় নিজের খুশীমত শাসনকাজ চালাইয়া যান, তবে দেশে কুশাসনের আশংকা থাকে, স্বৈরাচারিতারও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে শাসনতন্ত্র লংঘন না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে নিজের কাজের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। ইহাতে স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ইহাতে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টকে নেতৃত্ব প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইন-বিভাগ যেভাবে আইন প্রণয়ন করে, তাহা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সর্বদা গ্রহণযোগ্য না-ও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আইনসভার উপর অর্পিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজের ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইনপ্রণয়নে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসৃত না-ও হইতে পারে

ভারতে সরকারের স্বরূপ,—রাষ্ট্রপতি-চালিত না মন্ত্রিসভা-চালিত? (Nature of the Indian Government—Presidential or Parliamentary?): ভারতে আমরা যে ধরনের সরকার দেখিতে পাই তাহা হইতেছে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার অথবা সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy)। যদিও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হইতেছেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, তবুও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। কারণ, রাষ্ট্রপতি সব কাজেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চালিত হয়। দেশের প্রকৃত শাসনভার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত এবং প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন সরকারের প্রকৃত প্রধান (real head of the Government)। আমাদের দেশে রাজ্যসরকারগুলির ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ধারা অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের যে-সব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সবগুলিই ভারতে আমরা দেখিতে পাই। এমন কি জাতীয় জরুরী অবস্থা চলা কালে অথবা কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলেও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ীই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সব কাজ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে ধরনের রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার দেখিতে পাই, ভারতে তাহা নাই। ভারতে বৃটেনের ন্যায় পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিসভার যে সম্পর্ক থাকে, ভারতেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। মন্ত্রী হওয়া কালে তাঁহারা যদি পার্লমেন্টের সদস্য না থাকেন তবে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাদের পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীই পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেন্টের সদস্যগণ যদি সরকারের নীতি অথবা কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্ত্রিদের কোন প্রশ্ন করেন, তবে মন্ত্রিগণ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। তবে তিনি যে কক্ষের সদস্য, শুধু সেই কক্ষেই ভোট প্রদানকালে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কক্ষে তিনি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেও ভোট প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

মন্ত্রিদের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্যপদ অপরিহার্য

মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট সরকারের কাজের জন্য যুক্তভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি কখনও এজন্য দায়ী থাকেন না। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে

যে নীতি গ্রহণ করেন, সেই নীতি সব মন্ত্রিকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুসরণ করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী ইহার বিরোধিতা করেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য তিনি লোকসভার স্পীকারের সম্মতি লইয়া পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর যখন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর সি. ডি. দেশমুখ অন্যান্য ক্যাবিনেট সদস্যগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন, তখন তিনি পার্লামেণ্টে তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনুকরণেই আমাদের দেশে মন্ত্রিদের লোকসভার নিকট যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যৌথ দায়িত্ব

লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবের প্রভাব

লোকসভার অন্ততঃ ত্রিশ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব আনিতে পারেন এবং যদি এই প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্রিদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এবং মন্ত্রিগণও সেইগুলির জবাব দিতে বাধ্য। যদি কোন বেসরকারী বিল মন্ত্রিদের আপত্তি সত্ত্বেও লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, অথবা মন্ত্রিদের প্রস্তাবিত কোন বিল যদি পার্লামেণ্ট অনুমোদন না করে, অথবা মন্ত্রিদের সম্মতি ব্যতীত যদি লোকসভা মন্ত্রিদের বেতন কমাইয়া দেয় তবে মন্ত্রিগণ তাহা নিজেদের উপর আইনসভার অনাস্থা বলিয়া মনে করেন এবং সেইক্ষেত্রে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইহাই প্রথা। সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য শুধু প্রভাব বিস্তার নয়, এই ব্যাপারে যে মন্ত্রিসভা অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী সেকথা বলাও অসঙ্গত হইবে না। সরকার কোন ব্যয় অথবা কর ধার্য করিতে পারেন তখনই যখন এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিলে রাজ্যসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ লোকসভার অনুমোদনকে রাজ্যসভা বাতিল করিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা লোকসভার। অন্যভাবে বলা যায় লোকসভাই আয়-ব্যয় নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রিদের পরিচালিত করে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে লোকসভা পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা কর্তৃকই এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া লোকসভায় উত্থাপিত হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই কোন অর্থসংক্রান্ত বিলের উত্থাপনে অনুমতি দান করেন। আবার মন্ত্রিপরিষদের দলীয় সদস্য-সংখ্যার জোরেই উক্ত বিলটি

আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার প্রাধান্য ও তাহার কারণ

লোকসভায় অনুমোদন করাইতে তাহাদের মোটেই অসুবিধা হয় না। আবার এমন কতিপয় সরকারী ব্যয় আছে যাহা লোকসভার ভোটে রদবদল হয় না।

যদি কখনও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে লোকসভায় উক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি অগ্রাহ্য হইল, তাহা হইলে তাহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের অনাস্থা সূচনা করে। অবশ্য ভারতে এই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি এখনও হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও আইনসভা অপেক্ষা মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। দলীয় শৃংখলা বজায় থাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করা মোটেই অসুবিধাজনক ব্যাপার হয় না। লোকসভায় সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার পক্ষে সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে অনুমোদিত করাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই। পার্লামেণ্টে সরকার গঠনকারী দলের শৃংখলা ও সংহতিও দলের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী বা দলীয় নেতার নির্দেশ পালন করিতে অনুপ্রাণিত করে। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ জানেন যে মন্ত্রিসভা যদি চরম সংকটের সম্মুখীন হন, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার উপদেশ দিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে যদি পুনরায় সাধারণ নির্বাচন হয় তবে বর্তমান সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচিত না-ও হইতে পারেন। সেইজন্য কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করিতে চাহেন না। যদি মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে কখনও সংকটের সম্মুখীন হন, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। ইহা হইতেছে পার্লামেণ্টের উপর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা। জেনিংস (Jennings) ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র পার্লামেণ্টে ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্কের আলোচনাকালে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা তাহা প্রয়োগ করিতে পারি,—"The House of the people (The House of Commons in England) makes the Ministry, the Ministry also can unmake the House".

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভেদের পর ক্ষমতায় আসীন নব কংগ্রেস দল লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। তখন প্রধানমন্ত্রীর হাতে লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেওয়ার যে ক্ষমতা আছে তাহারই বলে বলীয়ান হইয়া ও কয়েকটি বামপন্থী দলের সমর্থনে মন্ত্রিসভা কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ হয়। সংসদের অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইয়া তখন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত হইতে হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ১৯৭০ সালে ২৭শে ডিসেম্বর চতুর্থ লোকসভা

বাতিল করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তখন লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেন।

সরকার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পার্লামেণ্টের মাধ্যমে জনগণকে দেন তাহা ঠিক ঠিক পালন করার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। এই প্রতিশ্রুতি তাহারা পালন না করিলে লোকসভায় বিরোধী পক্ষ নানারূপ সমালোচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করিতে পারে। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ সরকার গঠনকারী দলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিয়া পরবর্তী নির্বাচনের সময়ে নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠন করিতে পারেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেণ্টই দেশের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে। আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হইয়াছে বলিয়া দেশের শাসনতন্ত্রকেই সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধনের ফলে আমাদের পার্লামেণ্ট এত ক্ষমতাশালী হইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে ইহাই দেশের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে সেজন্য সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এখন মন্ত্রিসভা কর্তৃকই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের সব বৈশিষ্ট্যই ভারতে সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রাজতন্ত্র (Monarchy): রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন "I am the State"। তাঁহাকে "Grand Monarch" বলা হইত। আজকাল চরম রাজতন্ত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবে সৌদী আরব, ইথিওপিয়া, নেপাল, ভুটান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী। মিশরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে রাজা ফারুক এবং রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জার অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে চরম রাজতন্ত্র ইতিহাসের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই বর্তমানকালে বিশেষভাবে দেখা যায়। ইংলণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহার ঐতিহাসিক রূপ। রাষ্ট্র বিবর্তনের আদি যুগে চরম রাজতন্ত্রই ছিল সরকারের একমাত্র রূপ। জাতীয় রাজতন্ত্রের (National Monarchy) সমর্থনেই জাতীয়তা-

চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি, ইহার ঐতিহাসিক সমর্থন এবং আধুনিককালে ইহার উপকারিতা

বোধের সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহার পিছনে ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে এই শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠনের সরলতা, শাসনকাজে ঐক্য, রাজার দল-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গুণাবলীর জন্য চরম রাজতন্ত্র এখনও উপযোগিতা হারায় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল এই যে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব চলিতে থাকায় একজন ভাল রাজার উত্তরাধিকারীও যে ভাল রাজা হইবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। চরম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পরিপন্থী। কারণ, চরম রাজতন্ত্র যদি স্বেচ্ছাচারিতার রূপ গ্রহণ করে তবে দেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইতিহাসে এই জাতীয় বহু নজির আছে। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে রাজতন্ত্র কখনই সমর্থনযোগ্য নহে, ইহা গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা সেই ক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য রাজা যদি ভাল লোক অথবা ভাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে;—যেমন প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দিক গ্রেট্ এবং অষ্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় যোসেপ (Joshep II) কল্যাণকারক স্বৈরতন্ত্র (Benevolent Despotism) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চরম রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের সরকার; শুধু রাজতন্ত্রই নহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে, ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সরকারের যতই সংস্কার করা হউক না কেন, সরকার মূলতঃ রাজতন্ত্রই থাকিয়া যায়। যদি জনমতের সমর্থন না পাওয়া যায় অথবা জনগণ যদি অংশ গ্রহণ না করে, কোন প্রকার সংস্কারই ভাল ফল দিতে পারে না। তাহা ছাড়া, রাজতন্ত্র যে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজতন্ত্রে প্রত্যেক রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy) কখনই সক্রিয় নহে। কারণ এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। রাজা শুধু একজন "আড়ম্বরপূর্ণ সাক্ষীগোপালের" (magnificent cipher) ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। ("He reigns, but does not govern.") ইংলণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সর্বদা সমর্থনযোগ্য নহে

প্রজাতন্ত্র (Republic) **:** গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Republic) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটো যে ধরনের প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সেই ধরনের প্রজাতন্ত্র বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না। 'প্রজাতন্ত্র' কথাটির অর্থ হইতেছে 'প্রজা'-দের অর্থাৎ, সাধারণ নাগরিকদের সরকার। প্রজাতন্ত্র হইতেছে নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত একটি শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি হইতেছে প্রজাতন্ত্রের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই তিনটি প্রজাতন্ত্রেই রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন; নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণ আবার জনসাধারণেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রজাতন্ত্রী সরকার রাষ্ট্রপতি-চালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত উভয় প্রকারই হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে প্রজাতন্ত্রী সরকার দেখিতে পাই তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ভারতে আমরা যে গণতান্ত্রিক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র দেখিতে পাই তাহা হইতেছে প্রধানতঃ মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে অথবা ফরাসী প্রজাতন্ত্রে মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা আছে এবং একজন প্রধানমন্ত্রী সেই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে প্রজাতন্ত্র দেখিতে পাই তাহাতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্রিসভা নাই; তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন সচিব (Secretary) নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই সচিবমণ্ডলী ক্যাবিনেট হিসাবে পরিচিত যদিও আমেরিকার শাসনতন্ত্রে ক্যাবিনেট গঠনের কথা বলা হয় নাই। এই ক্যাবিনেটের কোন প্রধানমন্ত্রী নাই এবং ইহার সদস্যগণ নিজেদের কাজের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কাছে দায়ী থাকেন না, তাঁহারা নিজেদের কাজের জন্য শুধু রাষ্ট্রপতির কাছেই দায়ী থাকেন। ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক হইলেও সোভিয়েত-যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনের প্রজাতন্ত্রে আমরা একদলীয় শাসন দেখিতে পাই। মিশরের প্রজাতন্ত্রেও আমরা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেখিতে পাই।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র (Indian Republic) **:** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ (Preamble) অনুযায়ী ভারত হইতেছে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (A Sovereign Democratic Republic)। সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। ভারত একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবেই কমনওয়েলথের সদস্য, এবং সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত যে-

কোন সময় কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারতে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে। পার্লামেণ্টে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যে দলের সদস্যগণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেন সেই দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। মন্ত্রিসভাও নিজের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট, অর্থাৎ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই সংসদীয় গণতন্ত্র এবং বহু রাজনৈতিক দল। এই প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি হইতেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধান।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধ অনুযায়ী আমাদের শাসনতন্ত্রটি একটি "প্রজাতন্ত্র" গঠন করিয়াছে। প্রজাতন্ত্রে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন চিহ্ন থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতও একটি প্রজাতন্ত্র। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের প্রধান। ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন মূল রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়াছে; রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজপরিবার হইতে রাজপ্রমুখ নিযুক্ত করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করা হইয়াছে। পূর্বের জম্মু ও কাশ্মীরের যিনি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' অর্থাৎ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন তিনিও রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন এবং সেই নির্বাচন ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। বর্তমানে কাশ্মীরে সদর-ই-রিয়াসৎ পদটি তুলিয়া দিয়া রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যপালগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হইতেছেন নির্বাচিত রাষ্ট্র-প্রধান। তাঁহার উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা হইতেছেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং ভারতে সর্বস্তরেই প্রজাতন্ত্রের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।

"প্রজাতন্ত্র"

Exercise

1. যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির সহিত এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির তুলনা কর।

[Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State.]

2. যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি? এককেন্দ্রিক সরকারের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়?

[**What are the features of a Federal State? How is it distinguished from a Unitary System?**]

[**ইঙ্গিত :** এই প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তরে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখাও যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা কি পরিমাণে পৃথক।]

3. যুক্তরাষ্ট্রের গুণ ও অপগুণ আলোচনা কর।

[**Discuss the merits and demerits of a Federal State.**]

4. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও অপগুণ আলোচনা কর।

[**Discuss the merits and demerits of a Unitary State.**]

5. "যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে রাজ্যসমূহের অধিকার বজায় রাখার মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি রাজনৈতিক কৌশল"—উক্তিটি আলোচনা কর।

["**A Federal State is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of State rights." Discuss the statement.**]

6 যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[**Discuss the nature and characteristics of a Federal Union.**]

7. যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য কি কি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক? যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি ভারতে কতটা বর্তমান?

[**What are the conditions essential to the formation of a Federal Union? Explain the necessity of a written constitution for a Federal Union. How far do the conditions essential to the formation of a Federal Union exist in India?**]

8. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনা কর এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলি প্রকৃতই ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে কিনা আলোচনা কর।

[**Discuss the nature of the Indian federation and state whether it strictly conforms to the principles of federation.**]

9. ভারতীয় শাসনতন্ত্র যতটা যুক্তরাষ্ট্রীয় তাহা অপেক্ষা বেশী এককেন্দ্রিক—এই উক্তিটি আলোচনা কর।

[**"The Indian Constitution is more unitary than federal."—Discuss.**]

10. ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে, সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিকও নহে, ইহা উভয়েরই একটি সংমিশ্রণ—এই উক্তিটি আলোচনা কর।

[**"The Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both."—Discuss.**]

11. মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও এবং এই ধরনের সরকারের আইনসভা কি কি পদ্ধতিতে শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।

[**Point out the characteristic features of the Parliamentary form of Government and discuss the different ways by which the legislature exercises its control over the executive under this form of Government.**]

12. মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the characteristics of Cabinet Government and the essential conditions for its success.]

13. রাষ্ট্রপতি-চালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। শেষোক্ত সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিস কি কি?

[Distinguish between the Presidential form of Government and Cabinet Government. What are the essential requisites of the latter ?]

14. মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে তুলনা কর।

[Compare the Cabinet form of Government and the Presidential form of Government.]

15. সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দাও। কি কি অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে?

[Explain the meaning of Parliamentary Democracy. What are the conditions of its success ?]

16. মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের গুণ গুণগুলি কি কি?

[Distinguish between Parliamentary and Presidential Governments. What are the elements of strength and weakness of Parliamentary Government ?]

17. ভারতে সরকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ভারতের সরকার কি রাষ্ট্রপতি-চালিত না মন্ত্রিসভা-চালিত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Discuss the nature of the Indian Government—Is the Indian Government Presidential or Parliamentary ? Give reasons for your answer.]

18. ভারতে প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

D[iscuss the features of Parliamentary Democracy as introduced in India]

19. টীকা লিখ :—(ক) রাজতন্ত্র ও (খ) প্রজাতন্ত্র

[Wrie notes on :—(a) Monarchy and (b) Republic]

20. ভারতে প্রবর্তিত প্রজাতন্ত্রের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ।

[Write a short note on India as a Republic.]

দ্বাদশ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
(Democracy and Dictatorship)

গণতন্ত্রের অর্থ (Meaning of Democracy) **:** গণতান্ত্রিক সরকার ও 'গণতন্ত্র' বলিতে একই জিনিস বুঝায় না। 'গণতন্ত্র' হইতেছে একটি আদর্শ। আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক। আবার গণতন্ত্র শব্দটির দ্বারা বিশেষ একটি সমাজব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা একটি শাসনব্যবস্থা বুঝাইতে পারে।

গণতন্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার। গ্রীক শব্দ "Demos' হইতে "Democracy" কথাটি আসিয়াছে। "Demos" কথাটির অর্থ হইল জনসমূহ। সেইজন্য গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' ("Government of the People, by the People and for the People".) কিন্তু, গণতন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তানায়ক বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের আদর্শ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। মূলতঃ ইহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। কিন্তু ইহার সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করে। ইহার মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারেরও একটি বিশেষ স্থান আছে কিন্তু, শুধু গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে গণতন্ত্রের সব দিক বুঝায় না,—ইহা গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে জড়িত, আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র আরও ব্যাপক। সিলির (Seely) মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেরই একটি অংশ আছে।[১] ডাইসির (Dicey) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ।[২] লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না,—ইহা দেওয়া হয় সামগ্রিক-

গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক আদর্শ

১। "...a government in which everyone has share." —Seely

২। "...one in which the governing body is a comparatively large fraction of the total population." —Dicey

ভাবে সমাজের সদস্যদের।[৩] উপরের সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করে। কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু একপ্রকার সরকার নয়,—ইহা একটি বিশেষ ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা। গণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকেও গঠন করিতে পারে।

বার্ণসের (Burns) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত সমাজ নয়-—গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী,—যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজে অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।[৪] সমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই সমান অধিকার।

বার্ণস্ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও তাৎপর্য বুঝিতে পারি।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না, অথবা তাহাদের মধ্যে সেইজন্য সুযোগ-সুবিধার তারতম্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা আইনত অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার তারতম্য করা হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার, ইত্যাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরিচালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়াসে (free private enterprise) কোনপ্রকার গোলযোগ অথবা শিল্প-বিরোধের (industrial disputes) কারণগুলি দূর করা যায়। কোন কোন চিন্তানায়কের মতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning)

৩। "...a form of government in which the ruling power is largely vested not in any one particular class or classes but in the members of the community as a whole." —Bryce

৪। "...a society, not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."—Burns

পরস্পর-বিরোধী কর্মসূচী। অষ্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক হায়েক (Professor Hayek) বলেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইতেছে দাসত্বের রাস্তা ;[৫] কিন্তু ভারতবর্ষে গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) চালু করা হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এই তিন প্রকার গণতন্ত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা, নৈতিক ধারণা ও সামাজিক অবস্থা

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা (a political status), একটি নৈতিক ধারণা (an ethical concept) এবং একটি সামাজিক অবস্থা (a social condition)। রাজনৈতিক মর্যাদা বলিতে বুঝায় যে গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিলে সব সরকারকেই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। সাম্য হইতেছে গণতন্ত্রের ভিত্তি; তবে সেই সাম্য রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক সাম্য হইবে; অর্থনৈতিক সাম্য নহে। গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণ হইতে মুক্তি; কিন্তু ইহাতে অর্থনৈতিক সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

নৈতিক ধারণা হিসাবে গণতন্ত্র একটি মহান আদর্শের ধারক ও বাহক। সব মানুষই সমান এবং প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। একক স্বার্থে কেহ চলিতে পারে না। এই নৈতিক ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি বিশেষ রূপ।

সামাজিক অবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। সামাজিক বৈষম্য গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী। গণতন্ত্রে সব লোকেরই সমান অধিকার, কিন্তু সেইজন্য প্রত্যেকেই সমান নহে—প্রত্যেককে সমান অধিকার প্রদান করিয়া যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুঁজিয়া লওয়া হয়।[৬] তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া সরকারকে কাজ করিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য "সকলের তরে সকলে আমরা" এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। সরকার যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসন-ব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত হয়।

৫। "Economic planning is a road to serfdom".

৬। "Democracy in practice is the hypothesis that all men are equal which is used in order to discover who are the best." —C. D. Burns.

গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Democracy) **ঃ** প্রাচীন গ্রীসে আমরা বিভিন্ন শহর-রাষ্ট্রে (city states) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাইতাম। এরিষ্টটল সরকারের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহাতে গণতন্ত্রকে স্বাভাবিক রূপ এবং বিকৃত রূপ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল; স্বাভাবিক গণতন্ত্রকে এরিষ্টটল "Polity" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং বিকৃত গণতন্ত্রকে তিনি "Democracy" আখ্যা দিয়াছিলেন। বর্তমানে সেই শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য নহে। প্রাচীন গ্রীসে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পরিলক্ষিত হইত তাহাতে নির্দিষ্ট সময় নাগরিকগণ কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্তমানকালে সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি ছাড়া অথবা কোন কোন দেশে ক্ষেত্র বিশেষে খুবই সীমিতভাবে গণভোট গ্রহণ ছাড়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কয়েকটি স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের খুবই সীমিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান কালে বড় বড় রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোট প্রদান করিয়া আইনসভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভাকে ইহার কাজের জন্য আইনসভার সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, কিন্তু জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠিত হয়। সেই আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। সরকারের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক সরকার যেমন মন্ত্রিসভা-চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত হইতে পারে,—সেই প্রকার ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং এককেন্দ্রিক সরকার, এই দুইভাগেও বিভক্ত হইতে পারে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক সরকারের তাৎপর্য (Significance of a Democratic Government) **ঃ** গণতান্ত্রিক সরকারকে বলা হয় জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা

সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার (Government of the people, by the people and for the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। জনগণের সরকার বলিতে বুঝায় (১) জনগণই সরকারের উৎস এবং (২) সরকারকে জনগণ হইতে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে শুধু জনগণের আনুগত্য (obedience) বুঝায় না। গণতন্ত্র হইতেছে 'জনগণের দ্বারা সরকার'। এই কথাটির তাৎপর্য হইতেছে এই যে—গণতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। বাস্তব জীবনে গণতন্ত্র হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল তাৎপর্য হইতেছে এই যে ইহা জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল। জনগণের প্রত্যেকের অধিকার থাকে সরকারের ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করার, এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর। 'গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের জন্য' কথাটির অর্থ অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ইইতেছে সামগ্রিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা,—ব্যক্তিবিশেষের অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের স্বার্থসিদ্ধি করা নহে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তাৎপর্য

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (direct democracy) ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ড আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোন সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকেলেরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার সকলকেই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে

গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারে অথবা নিজ নিজ কর্মনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)—গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান কারণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বদাই ইহার ক্রিয়া-কলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্ব না থাকিলে কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ইহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না

পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং জনগণের স্বার্থে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজন হইল একটি সদা সচেতন, সুশিক্ষিত এবং সুদৃঢ় জনমত।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। কোন সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবী করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণই সেইগুলি সংরক্ষণের জন্য সতর্ক থাকে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয় এবং ইহাতে দেশের শাসন-ব্যবস্থা উন্নত হয়। হিতবাদীদের (utilitarians) মতে এইজন্য গণতন্ত্রই হইতেছে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।

রাজনৈতিক শিক্ষা পূর্ণতা অর্জন করে

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে যদি গণতন্ত্রের আদর্শ

সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব নাগরিকেরই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ সুদৃঢ় করিতে পারে। কোনও বিশেষ দল অথবা শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণতন্ত্রে কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর।

নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা অপরিহার্য

পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকারক। নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে গণতন্ত্রের বিশেষ শিক্ষামূলক মূল্য আছে। গণতন্ত্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি উন্নত করে, সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দেয় এবং শাসনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া স্বদেশপ্রেম বাড়াইয়া দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাভ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিশেষভাবে সম্মানিত হয়,—কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়, ইহা তাহাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে।[৭] সব রকম সরকারই মানুষের শিক্ষার বাহক; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার হইতেছে নিজের পরিচালিত সরকার এবং তাহাই গণতন্ত্র।[৮]

ইহা জনসাধারণের মানসিক উন্নতি অর্জনে সহায়ক

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে। কারণ, জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি এবং মন্ত্রিমণ্ডলী এবং সরকারী কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র। গণতন্ত্র দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধ গভীর করে। সেইজন্য গণতন্ত্রে আইন ও শৃংখলা বজায় থাকে। জনপ্রিয় সরকারে এমন ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্ক্ষা সরকার জানিতে পারে এবং সেইভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যদি কখনও সরকারের সহিত জনগণের মতভেদ হয় তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার শান্তিপূর্ণ

গণতান্ত্রিক সরকারই সর্বাধিক জনপ্রিয় ইহা জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে

৭। **"The manhood of the individual is dignified by his political enfranchisement and he is usually raised to a higher level by the sense of duty which it throws upon him." —Lord Bryce.**

৮। **"All government is a method of education, but the best education is self-education; therefore, the best government is self-government which is democracy." —C. D. Burns.**

মীমাংসা করা সম্ভবপর। ইহাই জনপ্রিয় সরকারের সার্থকতা এবং এইজন্যই জনপ্রিয় সরকার হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিতে পারি। জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতার জন্যই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।

বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

অধ্যাপক বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে গণতন্ত্রেই একমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[১] স্বাধীনতা (Liberty) সাম্য (Equality) এবং ন্যায়ের (Justice) আদর্শ কার্যকর করা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাহা অনুসরণ করা একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভবপর। বার্কার গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়েই জনসাধারণের সর্ববিধ মানসিক উন্নতি সম্ভবপর। জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার "Representative Government" বইয়ে গণতন্ত্রের এই বিশেষ গুণটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits of Democracy) : গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহা অযোগ্যতার পরিচালনাধীন। ("Democracy is the cult of incompetence")। এরিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। Ausburg'-এর একটি রূপকচিত্রে গণতন্ত্রকে এক হল্লাকারী জনতা কর্তৃক পরিবৃত মাতাল, Cleon-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। Cleon ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের একজন জননেতা। এই চিত্রাঙ্কন খুবই অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গণতন্ত্রে অনেক নাগরিকই সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে খুব বেশী উৎসাহ বোধ করে না।

গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য এবং অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হয়

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র যদি প্রকৃতই অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে ইহা জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থার অভাব সূচিত করে। কিন্তু এই সমালোচনা যে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। গণতন্ত্রের পরিচালনাভার বর্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর

১। এইক্ষেত্রে Henry B. Mayo-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "It (democracy) is the system best able to produce justice."

—Henry B. Mayo : An Introduction to Democratic Theory

ন্যস্ত হয়। তাহারা প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহা নহে। যদি গণতন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে আমরা গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক,—প্রত্যেকেই যেখানে সমান অধিকার ভোগ করে, সেখানে যোগ্যতার সমাদর হইবেই। গণতন্ত্রের আর একটি দোষ হইতেছে, ইহা শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ মনে করেন, গণতন্ত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসাধারণের বিপ্লবাত্মক ক্রিয়া-কলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা গিয়াছে। স্যার হেনরী মেইন বলেন যে বিভিন্ন ধরনের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রই হইতেছে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল, দলাদলি পূর্ণ, অসহনশীল এবং সমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন।[১০]

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকারে অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গণতন্ত্রে সর্বদাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা) পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার্যকর করেন। আইনসভার ভিতরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

দলপ্রথার জন্য ত্রুটি

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে শাসকগণ যে সর্বদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকেন তাহা নহে। যদিও শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা নিজের কাজের জন্য আইনসভার সদস্যগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও শুধু মাত্র দলীয় রাজনীতি-প্রসূত সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রিগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই দেন না। এই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভাব দেখা যায়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার দিকে জনগণের

১০। "...of all forms of government, democracy is the most intelligent and extravagant, the most factional and intolerant, the most hostile or indifferent to true progress." —Sir Henry Maine

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আগ্রহ বেশী দেখা যায়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের জন্য অলীক স্বাধীনতায় পরিণত হয়। সাধারণ জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির দরকার, সাধারণ জনগণের তাহা নাই। তাহারা গতানুগতিকভাবে নিজেদের কাজ করিয়া যায়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার প্রয়াস তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক মেইন, লেকি প্রমুখ চিন্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে কলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি উদাসীন। ইহা হইতেছে একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা।

ইহা একটি রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ অন্যান্য শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা নিম্নস্তরের সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠন করে। এই রকম বলা হয় যে সাধারণ লোকের ত্রুটিগুলি সমস্ত সামাজিক জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে।[১১]

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয়-বাহুল্য খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের জন্য কেহই চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়মানুবর্তিতাও অল্প থাকে।

অষ্টমতঃ, অনেকে মনে করেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার মূলতঃ ধনতান্ত্রিক। ইহা পুঁজিবাদ এবং কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য দেয়। কারণ যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শাসক প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারকে পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহারা সর্বদাই নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে সমাজে রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে

কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য ও পুঁজিবাদের প্রশ্রয়

১১। "Common man's defects corrupt all social life and destroy the excellences of the exceptional." —Burns.

অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে,—সেই সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের কোনই সার্থকতা নাই। তাহা ছাড়া, শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথাটিও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। একজন লোক কখনই অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না।

সর্বশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা (committee system) দেখিতে পাই। কোন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে। তাহাতে আইন প্রণীত হইতে যথেষ্ট দেরী হয় এবং বিশেষতঃ রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইহা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

আইন প্রণয়নে বিলম্ব

উপসংহার ঃ গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণতন্ত্রের সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। এখনও গণতন্ত্রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনববস্থা। গণতন্ত্রে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান আশানুরূপ উন্নত হয়না এবং গণতন্ত্র একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা,—একথা যে আদৌ ঠিক নয় তাহা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকাইলেই পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন দেশে (যেমন, মিশর, ইরাক ইত্যাদি) রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে; অবশ্য ইহাদের সব রাষ্ট্রই যে গণতান্ত্রিক তাহা নহে। তবে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত, গণতন্ত্রের এই মূলনীতিকে সব রাষ্ট্রই সম্মান করে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। জনসাধারণের যদি উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মোদ্যোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকে, তবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপায় (Conditions for the success of Democracy) ঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, যদি গণতন্ত্রকে সফল করিতে হয় তবে (১) জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে; (২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি রক্ষা করিতে হইবে।

এই শর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি থাকা

উচিত। প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে এবং সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা, এবং পরস্পরের প্রতি সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর অনুভূতি (feeling of fraternity) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহা সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

জনগণের সদা-সতর্কতা

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। নাগরিকদের আলস্য এবং উদাসীনতা গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক। গণতন্ত্র নাগরিকদের নিকট হইতে সহিষ্ণুতাও দাবী করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে যদি সহনশীলতা না থাকে তবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানিয়া লইতে হইবে, সেই প্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভার সংখ্যাধিক্যের অভিমত অনুযায়ী প্রণীত আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন করা।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। জনসাধারণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলা উচিত এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। জনসাধারণের যাহা কিছু ভাল এবং সুন্দর তাহার যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয় সেইদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি না হইলে জনসাধারণ কখনই গণতন্ত্রের সাফল্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) ঃ একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। স্বৈরাচারের প্রথম রূপ দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র কথাটি তখন ব্যবহৃত হইত না। তখন 'স্বৈরাচার' ('Tyranny') কথাটি ব্যবহৃত হইত। একনায়ক বা ডিক্টেটর কথাটি রোমান শাসনতান্ত্রিক আইনে (Roman Constitutional Law) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাতন্ত্রী রোমে একনায়কতন্ত্র বলিতে বুঝাইত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা যাহা ভাবি তাহা প্রাচীনকালের রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের ধারণা হইতে পৃথক

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন বা অল্প কয়েকজন লোকের একচ্ছত্র শাসন যিনি বা যাঁহারা সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে বিনা বাধায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।[১২] কিন্তু রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্র ছিল একটি সংকটকালীন শাসনব্যবস্থা।

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য হইতেছে এই যে রাজা উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী হন এবং তিনি কোন বিশেষ দলের নেতা নহেন। কিন্তু একনায়ক সামরিক শক্তির জোরে অথবা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া ক্ষমতার শিখরে আসেন এবং তিনি নিজেই তাঁহার অনুগামীদের লইয়া দল গঠন করেন। হিটলার এবং মুসোলিনী যদিও একনায়ক ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন, নিজেদের দলের একমাত্র অধিনায়ক।

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টির পক্ষে একনায়কগণ কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একটি শ্লোগানের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালীতে মুসোলিনী যথাক্রমে নাৎসীবাদ (Nazism) এবং ফ্যাসীবাদ (Fascism) প্রচার করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সমুদয় ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। গণতন্ত্র যখনই মানুষের সমুদয় চাহিদাকে পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়, যখন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শুধু নিজেদের স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে,—জনস্বার্থের কথা ভুলিয়া যায়, তখনই সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক ধনিকতন্ত্র (Economic oligarchy)। সেই অবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ তিনি নিজের সামরিক ,ক্ষমতার জোরেই হউক বা দলগত সমর্থনের জোরেই হউক নিজে সব ক্ষমতার ভার গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রের ব্যর্থতাই একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে

পাকিস্তানে আয়ুব খাঁন ও পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খান এবং প্রজাতন্ত্রী মিশরে কর্নেল নাসের সামরিক শক্তির জোরে ক্ষমতা হস্তগত করেন। পরে অবশ্য পাকিস্তানে আয়ুব খান এবং মিশরে প্রেসিডেন্ট নাসের নিজের নিজের দেশে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন। দেখা যাইতেছে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং গণতন্ত্র বজায়

১২। **By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the State exercising it without restraint.**

Veuman—*Democratic and the Authoritarian State.*

রাখিবার জন্য জনগণের মধ্যে সামর্থ্য ও আগ্রহের অভাবই একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারের দুর্বলতাই যদি প্রকট হইয়া উঠে এবং ইহা যদি সাধারণ মানুষের মনে শুধু অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি করিয়া গণতন্ত্রের আদর্শ অবলম্বনে বাধার সৃষ্টি করে, ক্ষমতালোভী শাসক এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের শাসন কায়েম করেন।

একনায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন

একনায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন দেখা যায় জার্মান দার্শনিক নীটশের (Nietzsche) লেখায়। তাঁহার মতে যাহা মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলে তাহাই বর্জনীয়। তাঁহার মতে গণতান্ত্রিক সাম্য মানুষকে নিষ্ক্রিয় করিয়া পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করে; অর্থাৎ মানুষ ইহাতে নিবীর্য হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মহৎ কিছু সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনি ছিলেন বীরপূজার (Hero-worship) সমর্থক। নীটশের মতে নেপোলিয়ন ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি হত্যাকারী ছিলেন না মানব জাতির উপকারী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকে সামরিক মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে তিনি মৃত্যুকে জর্জরিত করেন নাই।[১৩] তাঁহার মতে উচিত সব দুর্বলতা পরিহার করিয়া যিনি যোগ্যতম এবং বীর, তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া নিজেকে সবল করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তা করিয়া নীটশে মনে করেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিই (Superman) মানবজাতিকে এই ভাবে পরিচালিত করিতে পারেন।

নীটশের যুক্তি

একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different types of Dictatorship): একনায়কতন্ত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে আমরা তিন প্রকার একনায়কতন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। যথা (১) সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship), (২) ফ্যাসীবাদী কিংবা নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Fascist or Nazi Dictatorship) এবং (৩) সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্র (Communist Dictatorship)। উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আমরা একনায়কতন্ত্রের অন্যান্য রূপ দেখিতে পারি। যেমন, চরম রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজা তাঁহার রাজত্বকালকে একনায়কতন্ত্রের রূপ দিতে পারেন। আবার, পার্লামেণ্টারী শাসনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য মন্ত্রিসভাভিত্তিক একনায়কতন্ত্র (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বস্তুতঃ,

১৩। "Napoleon was not a butcher but a benefactor, he gave man death with military honours instead of death by economic attritions. Will Durant from Neitzsche's *Beyond Good and Evil*".

অধিকাংশ মন্ত্রিসভা পরিচালিত দেশগুলিতে আমরা মন্ত্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্ব বা Cabinet Dictatorship দেখিতে পাই। কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে বলা হয় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat)।

একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র এক জিনিস নহে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে,—এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্ট্র থাকে। একনায়কতন্ত্রের রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই নায়ক নির্বাচিত হন। একনেতা লইয়া গঠিত সমুদয় শাসন ক্ষমতা একজনের অথবা একটি দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এমন রাষ্ট্রকেই "Totalitarian State" বলা হয়। স্পেন এবং পর্তুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতন্ত্র মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

একনায়কতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করেন।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship): একনায়কতন্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র অনেক বেশী কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহা কার্যকর করিতে পারেন। বহুজনের মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য সুদৃঢ়ভাবে কার্যকর করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর।

এক নায়কতন্ত্রের কর্মকুশলতা বেশী

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। গণতন্ত্রে যদি কখনও শৃংখলাবোধ, ঐক্য এবং সংহতির অভাব দেখা যায়, একনায়কতন্ত্র তখন একটি সুদক্ষ এবং সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া শক্তির উৎস হিসাবে বিরাজ করে।

সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও সরকারী কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়কতন্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে কোনও হাত থাকে না। যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃবোধ থাকে না তাহা নহে। রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত হন না, দলীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রেও সরকার পক্ষের দলীয় নেতার নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হয়।

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয়

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি (Demerits of Dictatorship) ঃ

প্রথমতঃ, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা নাগরিকদের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদই একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হয়। ইটালী এবং জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহাই একটি প্রধান দোষ ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ইহা উগ্র জাতীয়তা-বাদকে প্রশ্রয় দেয়

তৃতীয়তঃ, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ যে একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারেন তাহা নহে। অনেকক্ষেত্রে একনায়কের কর্মকুশলতার অভাবে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। গণতন্ত্র যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা কম কর্মকুশল তাহা নহে।

ইহা সর্বদা কর্মকুশল নহে

চতুর্থতঃ, ক্ষমতার লোভ একনায়ককে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতাশালীও করে। তাহা ছাড়া, একনায়ক যদি কোন ভুল করেন তবে সমগ্র দেশকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়। অথচ একনায়কের ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা বা বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে থাকে না।

ইহা দুর্নীতি গ্রস্ত

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য (Distinction between Democracy and Dictatorship) ঃ গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী,—কিন্তু একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করে না। একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত; কিন্তু গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হইয়া জনগণেরই হাতে ন্যস্ত।

সার্বভৌমত্বের অবস্থা বিভিন্ন

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না,—শুধু একটি দলই থাকে। একনায়কতন্ত্রে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে পারে; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। কোন কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায়; যেমন আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে দেখিয়াছিলাম।

গণতন্ত্রে দলব্যবস্থা থাকে এবং বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে নাগরিকদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে। জনগণ স্বাধীন সরকারের সমালোচনা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। একনায়কতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার থাকে না বলিয়া জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অবদান থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে পদদলিত করা হয়।

গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করা যায় এবং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়

চতুর্থতঃ, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আড়ালে গণতন্ত্রেও যে মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে আইনসভায়

জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্বশীলতাই সরকারের দক্ষতা সূচিত করে। একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল হইতে পারে যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু হয়। সরকারের ভালমন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা কতটা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে তাহার উপর। জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে অর্জিত করা যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (constitutional rule) একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাল।

গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল ; একনায়কতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল সরকার দায়িত্বশীল নহে

পঞ্চমতঃ, তত্ত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তত্ত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রে সার্বভৌম বহুত্ববাদ (Pluralistic theory of Sovereignty) সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একস্থানে কেন্দ্রীভূত (monistic)। একনায়কতন্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তিশীল। যেমন, হিটলারের একনায়কতন্ত্র নাৎসীবাদের উপর, মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্র ফ্যাসীবাদের উপর এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দলের একনায়কতন্ত্র সাম্যবাদের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু গণতন্ত্রে এই প্রকার নির্দিষ্ট তত্ত্বের স্থান থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্র একদিকে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে, অপরদিকে গণতন্ত্রের আদর্শকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। একনায়কতন্ত্রে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতার শিখরে আসিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে উচ্ছেদ করে, কিন্তু গণতন্ত্রে বিরোধীদলের অস্তিত্ব থাকে।

তত্ত্বের দিক হইতে পার্থক্য

Exercise

1. গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? ইহার গুণ এবং দোষ কি কি? ইহার সাফল্যের শর্ত কি কি?

[What do you mean by Democracy ? What are its merits and demerits ? What are the conditions of its success ?]

2. গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[Distinguish between Democracy and Dictatorship.]

3 একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

[Discuss the merits and demerits of Dictatorship.]

4. আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের অর্থ আলোচনা কর।

[Discuss the meaning of Democracy as an ideal.]

5. সরকার হিসাবে আধুনিক গণতন্ত্রের গুণ, গুণের বিবরণী দাও।

[Estimate the strength and weakness of modern Democracy as a form of Government.]

6. 'গণতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরনের সরকার।" "গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় অজ্ঞ এবং অসমর্থ লোকের সরকার।"—উক্তি দুইটির উপর মন্তব্য কর।

["Democracy is the best form of Government." "Democracy means government by the ignorant and unfit." —Comment on the statements.]

7. গণতন্ত্রের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। কোন্ অবস্থায় গণতন্ত্র সফল হইতে পারে ?

[Discuss the value and limitations of Democracy. Under what conditions is Democracy successful ?]

8. একনায়কাধীন রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য ও আদর্শ আলোচনা কর। এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ হইতে কতটা পৃথক ?

[Discuss the aims and ideals of totalitarian States. How far do these ideals differ from those of democratic States ?]

9. গণতন্ত্র এবং একনায়কাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[Distinguish between Democracy and "Totalitarian State."]

10. একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ কি কি ? একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

[What are the different types of Dictatorship ? Discuss the merits and demerits of Dictatorship.]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্ব

(Functions of the Organs of Government and Theory of Separation of Powers of the Government)

আধুনিক সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে,—যথা, আইনপ্রণয়ন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচারবিভাগ। আইনপ্রণয়ন বিভাগের (Legislature) প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। অবশ্য আইন প্রণয়ন করা ছাড়াও এই বিভাগের অন্যান্য কাজ থাকিতে পারে। শাসনবিভাগের (Executive) প্রধান কাজ হইতেছে আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করা ও কার্যকর করা। দেশের শাসন সম্পর্কিত সব কাজ নির্বাহ করার দায়িত্ব এই বিভাগের। দেশের আইন ঠিকভাবে কার্যকর হইতেছে কি না তাহা বিচার করিবার এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচারবিভাগের (Judiciary)। সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের বৈচিত্র্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ।

আইন পরিষদের কাজ (Functions of the Legislature) **:** সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। তবে সব গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভার সমান গুরুত্ব নাই। মন্ত্রিসভাচালিত সরকারে আইনসভার যতটা গুরুত্ব রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে আইনসভার ততটা গুরুত্ব নাই। সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ :** আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন পরিষদগুলির আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে দেশের শাসন-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আইন পরিষদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা

(২) **শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ :** আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্রের

সংশোধন করিয়া থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও প্রায় আড়াই বৎসর পর্যন্ত আইনসভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান (মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান সহ) সংশোধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে আইনসভা শাসনতন্ত্র সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবেও কাজ করিয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতার র উপর কোন আইনসভার সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে। বিটেনের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট একটি সার্বভৌম আইনসভা।

আইন পরিষদ অনেকক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে

(৩) **শাসন-কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন করার কাজঃ** অনেক সময় আইন পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (electoral college) পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনপরিষদের উভয় কক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলির আইনপরিষদের নিম্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব মার্কিন কংগ্রেসের।

আইন পরিষদ নির্বাচনী সংস্থা হিসাবে শাসনকর্তৃপক্ষকে নির্বাচিত করিতে পারে

(৪) **আইন প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক কমিশন নিযুক্ত করার কাজঃ—** আইনপরিষদ সরকারের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, শাসনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের রিপোর্ট এবং সুপারিশ লইয়া আইনসভা আলোচনা করিতে পারে।

আইনপরিষদ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে

(৫) **আইনসভার অর্থসংক্রান্ত কাজঃ—**সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে আইনপরিষদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-পরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা সিনেট সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল আলোচনা, সমালোচনা, পরিবর্তন এবং অনুমোদন করিতে পারে। ভারতে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা

সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত সকল বিল আইন পরিষদ অনুমোদন করে

রাজ্যসভা (Council of States) সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা অথবা সমালোচনা করিতে পারে ; কিন্তু ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন করিতে পারে না।

(৬) **আইন সভার শাসনসংক্রান্ত কাজঃ** তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে আইন প্রণয়ন বিভাগের কোন শাসনসংক্রান্ত কাজ থাকে না। কিন্তু যেহেতু কোন দেশেই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হয় না, সেইজন্য আইন-সভার কতিপয় শাসনসংক্রান্ত কাজ থাকে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে আইনসভা। মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইন পরিষদ সরকারের শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদের সদস্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন পরিষদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু, বর্তমানে অতি মাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হওয়ায় আইন পরিষদ যে পরিমাণে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মন্ত্রিসভা আইন পরিষদকে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারেও আমরা কিছু পরিমাণে আইন বিভাগের শাসনসংক্রান্ত কাজ দেখিতে পাই। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেট দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাঁহাদের নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে সিনেট। তাহা ছাড়া, সিনেটের সম্মতি ব্যতীত মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধিপত্র অথবা পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য দেশে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা নিম্নকক্ষ অনেক বেশী ক্ষমতাশালী।

মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইন পরিষদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে

আইন পরিষদের উচ্চকক্ষের ভূমিকা

(৭) **আইনসভার বিচারবিভাগীয় কাজঃ** আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পন্ন করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে লর্ডসভা বিচারবিভাগের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক আইন পরিষদই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ

আইন পরিষদের বিচার বিভাগীয় কাজ

ব্যক্তিদের (যেমন ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি) শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত (impeached) করিতে পারে।

(৭) **রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় আইন-প্রণয়ন বিভাগের অবদানঃ** আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে (একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত) বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠনের চেষ্টা করে। আইন পরিষদে সরকার বিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে আইনসভার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মশক্তি। আধুনিক মন্ত্রিসভাচালিত সরকারে আইন সভায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া সরকারের সমালোচনা করে। সরকারপক্ষীয় দলও শৃংখলা বজায় রাখিয়া সরকারের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

শাসনবিভাগের কাজ (Functions of the Executive): শাসন-বিভাগের পাঁচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,—(১) প্রশাসনিক ক্ষমতা (administrative functions) অনুযায়ী কাজ, (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (military functions) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (legislative functions) এবং (৫) বিচারবিভাগীয় কাজ (judicial functions)। এই পাঁচটি কাজকে আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি; যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শাসনবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ।

শাসনবিভাগীয় কাজ (Executive Functions): শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক সরকারে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই প্রশাসনিক কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সরকার গঠন করা

এই কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক (diplomatic relations) বজায় রাখিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কী সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসনবিভাগের। শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক চুক্তি

কূটনৈতিক কাজ

নিয়োগ করেন বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। শাসনবিভাগের কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকর করা এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এই রকম উপাদান দূর করিয়া রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকর করিবার জন্য শাসনবিভাগ চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য শাসনবিভাগ পুলিশবাহিনী পরিচালনা করে, আইনভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

আভ্যন্তরীণ প্রশাসন কাজ

অনেক রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় (যেমন ভারতবর্ষে) শাসন কর্তৃপক্ষ আইনবিভাগের কাজ বন্ধ রাখিয়া নিজের হাতে সমুদয় শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতে কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থায় সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা

সামরিক ক্ষমতা (Military Power): শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শাসনবিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণতঃ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। সেনাবিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদচ্যুত করার ক্ষমতা তাঁহার থাকে। পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া সেইগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সন্ধি, চুক্তি করার জন্য শাসনবিভাগকে আইন পরিষদের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করিবার জন্য শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার বিষয়ক ক্ষমতা থাকে।

শাসনবিভাগের কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা

যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত কাজ

বিচার বিভাগীয় কাজ (Judicial Functions) **:** অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিই নহে, রাজ্য হাইকোর্টের বিচারকগণকেও নিযুক্ত করিতে পারেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণীও এই ক্ষমতা ভোগ করেন। অবশ্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাণী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। ভারতের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে জেলার ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে কিছু পরিমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিচার বিভাগীয় কাজ

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (Legislative Functions) **:** যদিও রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগকে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। পরে ইহাকে আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিতে শাসনকর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে সেগুলি প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায়। ভারতে রাষ্ট্রপতিই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের মধ্য দিয়া পরোক্ষ-ভাবে আইনপরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকর করা হইতে সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে। বিশেষতঃ মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে আইন-প্রণয়নের কাজে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মন্ত্রিগণই অধিকাংশক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপিত করেন এবং সরকারপক্ষীয় দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে তাহা অনুমোদিত করাইয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ছাড়াও অতিরিক্ত ক্ষমতা অনুযায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উপ-আইন (by-laws) প্রণয়ন করিতে পারে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ

আর্থিক ক্রিয়াকলাপ (Financial Functions) ঃ সরকারের শাসনবিভাগের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে কর সংগ্রহ করা এবং বাজেট অনুযায়ী সরকারের পক্ষে অর্থব্যয় করা। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়, তাহাতে শাসনবিভাগ নিজের দায়িত্বে দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করে। সরকারের যে বিভাগের মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত কাজগুলি সম্পন্ন হয়, সেই বিভাগকে অর্থ দপ্তর বা রাজস্ব দপ্তর (Finance Department) বলে। যে কোন সরকারকেই আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের একটি সম্ভাব্য হিসাব বা বাজেট (Estimated Budget) প্রস্তুত করিতে হয়। গণতান্ত্রিক সরকারে আইনসভা অথবা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী এই বাজেট অনুমোদন করিলে শাসনবিভাগ বাজেট অনুযায়ী কর ধার্য করিতে পারে এবং অর্থব্যয় করিতে পারে। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ রাজ্যগুলির অর্থ-ব্যবস্থাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে (এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য)।

কর সংগ্রহ করা এবং সরকারী ব্যয় করা

বিচারবিভাগের কাজ (Functions of the Judiciary) ঃ কোন দেশের শাসনবিভাগের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে ইহার বিচারবিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবে বিচার বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। আমেরিকার শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নয়; কিন্তু বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়।

বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে

যদিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্যে, পারস্পরিক কলহ, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মূলরাষ্ট্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচারবিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃত পক্ষে বিচারবিভাগীয় কাজ বলা যায় না। যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানে ট্রাষ্টি অথবা প্রাপক (Receiver) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে

মামলা মোকদ্দমার সমাধান করা

অন্যান্য কাজ

ইন্‌জাংসন জারী করাও বিচারবিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করিতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" (declaratory Judgment) বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতার (original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। তাহা ছাড়া, বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ ও শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

আইনের বৈধতা ঘোষণা করা

আইনপরিষদের সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচারবিভাগের। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু, ব্রিটেনের বিচারবিভাগ এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। ব্রিটেনের লর্ড সভা আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়।

শাসন বিভাগের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক

অনেক ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড মকুব করার মত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারেন।

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers of the Government): সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালের কোন-কোন লেখকগণ সরকারের ক্ষমতা-গুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে জন-পরিষদ (Public Assembly), ম্যাজিস্ট্রেটস্ (Magistrates) এবং বিচারবিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

জন লক্ (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেস্কু (Montesquieu)। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মণ্টেস্কু এই মতামত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে; আইন-প্রণয়ন, শাসন-পরিচালন এবং বিচার-ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেজন্য তিনি সবকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মণ্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালের ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the Laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বার্থেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা উচিত।

মণ্টেস্কুর অভিমত

ম্যাডিসনও (Madison) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।[১]

ম্যাডিসনের উক্তি

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নহে।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে যুক্তি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগঃ বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি

১। "The accumulation of all powers...in the same hands...may justly be pronounced as the very definition of tyranny."—Madison

এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিশেষতঃ, আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনপরিচালন বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সে ক্ষেত্রে অর্জিত ও রক্ষিত হয়।[২]

ব্রিটেনে এই নীতি কার্যকর নয়

ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সকলেই আইন-সভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ড সভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ, কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাণী একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কখনই কার্যকর হয় নাই।

আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান কিছু পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে শাসন কাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব (secretaries) নিযুক্ত করেন। এই সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট

২। "In a democratic State, concentration of authority in the organ most directly representing the people may secure greater liberty than divided powers granted to independent and irresponsible organs"—Gettell

নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই। কারণ সরকারের শাসনবিভাগ যে টাকা খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার। সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে বড় জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্মতিপ্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচারবিভাগের আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি, যিনি শাসনবিভাগের দ্বিতীয় প্রধান, কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের (সিনেট) সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই।

আমেরিকায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকর, সম্পূর্ণভাবে নয়

ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই। জরুরীকালে এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন না-চলা কালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণও আইনসভার সদস্য; সুতরাং আইনপ্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগসূত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসনবিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেলা

ভারতের শাসনতন্ত্রে এই নীতি কার্যকর নয়

শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসন বিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অর্পিত হইয়াছে। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড হইতে কাহাকেও রেহাই দেওয়া প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতি (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

ভারতের জেলাশাসক যুগপৎ শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করেন

দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান ইংলণ্ড, আমেরিকা অথবা ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই।

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the theory of Separation of Powers of the Government) **:** সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। আমরা এই উভয় যুক্তিরই সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া অর্জিত অথবা রক্ষিত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমেই চাই একটি সচেতন জনমত।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির পক্ষে যুক্তি ; ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানে নাগরিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না

তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগে মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সুসমঞ্জস নীতি অনুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করা দরকার। ব্রিটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু বরাবরই ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রিটেনে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্য নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুন্ন হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই। সুতরাং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতটা স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অর্জিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে সরকারের যে বিভাগ, সেই বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার এবং ইহা কার্যকরী করিবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়।[৩] যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপর পক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ছাড়াও নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় থাকে

ইহা সর্বদা কাম্য নহে

৩। "The government of each state is a unit, engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various, organs, no matter how extensively differentiated, is essential."—Gettell

সুতরাং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সর্বদা কাম্য নহে।[৪] এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই নমনীয় (flexible) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও অনেক কম।

ইহা কার্যকর করার অসুবিধা

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, বাস্তবে ইহা কার্যকর করার মধ্যে অনেক অসুবিধাও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন।

অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ আছে, তিনটি নহে

অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ; যথা, নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসনপরিচালন বিভাগের প্রধানগণ অথবা মন্ত্রিসভা, সরকারের বাঁধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (administrative officials or bodies) এবং বিচার বিভাগ; এককভাবে এই পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্যক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে,—ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইনসভাই হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দিতে হইবে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধাননীতির পরিবর্তে সরকারের ক্ষমতাগুলির পারস্পারিক "প্রতিরোধ ও ভারসাম্যের" (checks and balance) নীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেশের শাসনবিভাগ যে অর্থব্যয় করিবে তাহা অনুমোদন করার

৪। আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে জেম্‌স্ ম্যাডিসন (James Madison) বলিয়াছিলেন, "The powers properly belonging to one department ought not to be directly and completely administered by either of the other departments and no department ought to possess, directly or indirectly, an overruling influence over the others in the administration of their respective powers."

দায়িত্ব আইনসভার। যদি পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সরকারপক্ষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তবে মন্ত্রিসভার পক্ষে বাজেট অনুমোদিত করাইয়া লওয়া কঠিন হইতে পারে। কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমস্যাটি একটু অন্য ধরনের। রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে দিয়া হয়ত একটি ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাহেন ; কিন্তু এমন হইতে পারে, রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, আইনসভায় সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই বলিয়া আইনসভা রাষ্ট্রপতির সুপারিশে কোন ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন না করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতীতে এইরূপ ঘটিয়াছে। ক্ষমতার প্রতিরোধ ও ভারসাম্যের নীতি আরও একটি ক্ষেত্রে অনুভূত হয় ; তাহা হইতেছে, শাসনবিভাগ যাহাতে নিজের খুশীমত কোন কিছু না করিতে পারে এবং শাসনতন্ত্রের বিধান যাহাতে কোন অবস্থায় লঙ্ঘিত না হয়, বিচারবিভাগ সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট "আইনের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" (Judicial Review of Legislation) করিবার ক্ষমতা ভোগ করে।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের অর্থ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পৃথকীকরণ নহে

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে বর্তমানে দুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা, শাসনবিভাগ অথবা বিচারবিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা। মন্টেস্কু (Montesquieu) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার-বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগ এবং আইনসভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে।

Exercise

1. আইন পরিষদের বিভিন্ন কাজ আলোচনা কর।
[Discuss the functions of a legislature.]

2. "আইন পরিষদের কাজ শুধু আইন-প্রণয়নই নয়।" গণতান্ত্রিক দেশে আইন পরিষদ আর কি কি কাজ করে ?

["The function of the legislature is not merely the making of law." What other functions does legislature in a democratic country discharge ?]

3. সরকারের শাসনবিভাগীয় কাজ বর্ণনা কর।

[State the functions of the Executive of a Government.]

4. শাসনবিভাগের রাজনৈতিক, শাসন সম্পর্কিত এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ কি কি ?]

[What are the political, and administrative and legislative functions of the Executive ?]

5. একটি আধুনিক সরকারের বিচারবিভাগের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।

[Discuss the functions of the judiciary of a modern government.]

6. ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটির একটি সমালোচনামূলক বিবরণী দাও।

[Give a critical estimate of the Theory of Separation of Powers.]

7. "ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয় নয়।"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।

[Strict Separation of Powers is neither possible nor desirable"—Discuss the statement.]

8. ভারতে কি পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান দেখিতে পাও ?

[How far do you find Separation of Powers in India ?]

9. ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি ব্যাখ্যা কর। এই নীতি ভারতে কতটা বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে ?

[Explain the theory of Separation of Powers. How far has this theory been translated into practice in India ?]

10. "ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান" নীতি এবং বিভিন্ন ক্ষমতার পারস্পরিক 'প্রতিরোধ ও ভারসাম্য" বজায় রাখার ব্যবস্থা ক্ষমতার বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করে এবং সরকারের ক্ষমতার মধ্যে ঐক্য সাধন করে,—এই উক্তিটি সযত্নে ব্যাখ্যা কর।

[Explain carefully the statement that the system of "Separation of Powers" and 'check and balance ' prevent chaos of authority and unify governmental powers.]

11. ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধাননীতির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

[Discuss the value and limitations of the doctrine of Separation of Powers.]

12. "কঠোর ক্ষমতাবিভাজন নীতি সম্ভবও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়",—উদাহরণ সহকারে এই উক্তিটি আলোচনা কর।

["A rigid theory of Separation of Powers is neither possible nor desirable".—Discuss the statement with illustrations.]

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের শাসনবিভাগ—রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

(Executive in India—President and Prime Minister)

ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসনবিভাগ (Executives in the Union and States in India) **:** ভারত সরকারের শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হন। মন্ত্রিসভার প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতে আমরা তিন ধরনের মন্ত্রী দেখিতে পাই,—যেমন, ক্যাবিনেট (Cabinet) পর্যায়ের মন্ত্রী. প্রতিমন্ত্রী বা রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Minister)। তাহা ছাড়া আছেন কয়েকজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। রাষ্ট্রপতির নীচে একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা ছাড়া শাসনবিভাগের আরেকটি অঙ্গ হইতেছে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। উচ্চপদস্থ সরকারী প্রশাসকগণ শাসনবিভাগের দৈনন্দিন কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল দেশের রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। অর্থাৎ, কোন রাজ্যের শাসনবিভাগের প্রধান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান দ্বারা নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহায্য দ্বারা চালিত হন। ভারতে কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসাবে আছেন লেফটেনাণ্ট গভর্নর অথবা ক্ষেত্রবিশেষে চীফ কমিশনার (যেমন অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এলাকায়)। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যের ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের প্রকৃত ক্ষমতা থাকে রাজ্যের মন্ত্রিসভার হাতে, মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহায্য দ্বারা রাজ্যপাল চালিত হন। তবে রাজ্যপালের কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers) থাকে। রাজ্য বিধানমণ্ডল কোন বিল অনুমোদন করিলে রাজ্যপাল তাহাতে নিজে সম্মতি প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্যপাল প্রেরিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপতি জানিতে পারেন যে, কোন রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে কিনা।

ভারতে তত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাষ্ট্রপতি হইতেছেন শাসনবিভাগের প্রধান। কিন্তু এজন্য ভারতে একক শাসন কর্তৃপক্ষ বজায় আছে একথা আমরা বলিতে পারি না। ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে দেশের শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহাই রাষ্ট্রপতির আদেশে বাস্তবে রূপায়িত হয়। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে যে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহা অনুযায়ী কাজ করেন।

একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive) : যখন শাসনবিভাগের শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, তখন ইহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন ব্যক্তি। তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী অথবা সচিবমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি শাসন-কাজে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে একক শাসনকর্তৃপক্ষ থাকায় যে কোন সময় দেশে স্বৈরাচারের সূচনা হইতে পারে।

সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) : যখন শাসন পরিষদ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। এই প্রকার শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)। সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত। এই সাত জনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন হইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। কোন দেশে সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ থাকিলে সেই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই যে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

সমষ্টিগত শাসন-কর্তৃপক্ষের গুণ ও ত্রুটি

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকায় সকলের একমত হইয়া শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমতা ও দায়িত্বে ভাগাভাগি হইলেই শাসনকর্তৃপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং দেশের শাসন-কাজ সম্বন্ধে কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায়ই অসুবিধাজনক হইবে।

ভারতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of the President of India): ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral college) কর্তৃক। এই নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হইতেছেন (১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং (২) রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ। এই নির্বাচন গোপন ব্যালটে একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে (the system of proportional representation by means of single transferable vote) অনুষ্ঠিত হয়।

পার্লামেন্ট এবং রাজ্যবিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য ভারতে একটি বিশেষ পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভাব নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হয় এবং সেই ভাগফলকে আবার এক হাজার দ্বারা ভাগ করিতে হয়। এই ভাগের দ্বারা যে ভাগফল পাওয়া যায় উক্ত রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেকটি নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ততগুলি করিয়াই ভোটপ্রদান করিতে পারেন। তবে এই ভাগের পর যে ভাগশেষ থাকে তাহা যদি পাঁচশত অথবা পাঁচ শতেব বেশী হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি সদস্যের ভোট সংখ্যা একটি করিয়া বাড়িয়া যায়। যদি ভাগশেষ পাঁচ শতের কম হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য করিতে হয়। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক, কোন রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২,৫০,০০০০০ এবং সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হইতেছে ২৫০। জনসংখ্যাকে সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হইতেছে (২৫০০০০০০÷২৫০) ১০০০০০। উক্ত ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে প্রত্যেক সদস্যের ভোটের পরিমাণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য (১০০০০০÷১০০০) ১০০টি করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের সংখ্যা নির্ধারণ করিবার জন্য রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হয়; ইহা হইতে যা ভাগফল বাহির হয় তাহা হইতেছে পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোটের পরিমাণ। যদি কোন ভাগশেষ থাকে এবং তাহা যদি ভাজকের অর্ধেকের বেশী হয় তবে সদস্যদের একটি করিয়া ভোট বাড়িয়া যায়; আবার যদি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির বিবরণ

ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের কম হয় তবে ভাগফলের সংখ্যাই প্রত্যেক সদস্যের ভোটের সংখ্যা হিসাবে গৃহীত হয়।

সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট প্রদান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে মোট ভোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী ভোট পাইতে হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে ভোটপত্রের উপর ১, ২, ৩, ৪, এইভাবে প্রার্থী অনুযায়ী পছন্দ অনুসারে ভোট প্রদান করিতে হয়। ভোটদাতাকে প্রথম পছন্দ (first preference) দেখাইতে হইবেই ; তাহা না হইলে ভোটপত্র বাতিল হইয়া যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পছন্দ দেখানো অথবা না দেখানো ভোট-দাতার ইচ্ছাধীন। প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিয়া যা সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে 'কোটা' (quota) বলা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে হইলে এই 'কোটা' পাইতেই হয়। যদি ভোট গণনায় দেখা যায় যে কোন প্রার্থীই 'কোটা' অনুযায়ী ভোট পান নাই তাহা হইলে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে নির্বাচন হইতে বাদ দিয়া তাঁহার ব্যালট কাগজগুলিকে ২, ৩, ৪, ইত্যাদি পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য প্রার্থীদের নিকট স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি পদে তিনজন প্রার্থী ছিলেন, যথা, শ্রী ভি. ভি. গিরি, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি এবং ডক্টর সি. ডি. দেশমুখ ; তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রথম গণনায় 'কোটা' লাভ করেন নাই। শ্রী সি. ডি. দেশমুখ সর্বাপেক্ষা কম প্রথম পছন্দের ভোট পাওয়ায় দ্বিতীয় গণনায় নির্বাচন হইতে বাদ যান এবং তাঁহাকে যাঁহারা প্রথম পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বিতীয় পছন্দের ভোট হস্তান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী ভোট গণনায় শ্রী ভি. ভি. গিরি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি অপেক্ষা ১৪৬৫০টি ভোট বেশী লাভ করিয়া 'কোটা' লাভ করেন এবং নির্বাচিত হন।

শাসনতন্ত্রের ৩৯তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন লইয়া কোন বিরোধের সৃষ্টি হইলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য সংসদীয় আইন অনুযায়ী সংসদের একটি ফোরাম (Forum) সৃষ্টি করিবার কথা বলা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা (Powers and Position of the President of India) **:** ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত

করা যায়, যেমন, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং জরুরী ক্ষমতা।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers) **:** শাসনতন্ত্রের ৫৩নং ধারা অনুযায়ী শাসন-বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সব কাজই রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহ করা হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন মুল রাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি ও হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, তাঁহাদের সকলকেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। আবার, আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণকে এবং কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বিদেশে দূত প্রেরণ করা এবং বিদেশ হইতে আগত দূতকে গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ। তবে শাসনতন্ত্রের ৫৩নম্বর ধারার ২নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে রাষ্ট্রপতির উক্ত ক্ষমতার উপর পার্লামেন্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে। পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থার ক্ষমতাগুলি কার্যকর করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রার উপদেশের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন মন্ত্রী, এটর্ণী জেনারেল, রাজ্যপাল এবং অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করিতে পারেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিবৃতি অনুসারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোন সদস্য অথবা সভাপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসনতন্ত্রের ৭৪নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। ৭৪নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কোন আইন যদি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত প্রণীত হয়, তবুও সেইজন্য রাষ্ট্রপতিকে কোন বিচারালয়ে জবাবদিহি করিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এইপ্রকার বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সমুদয় কাজে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ

দ্বারা পরিচালিত হইবেন।[১] শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সব কাজে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers) **:** রাষ্ট্রপতির কতিপয় আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি সেই বিলটিকে আইনে পরিণত করিতে সম্মতি প্রদান না করেন এবং যদি বিলটি দ্বিতীয়বার পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সমুদয় অর্থবিল (Money Bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। কোন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত বিলেও তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে এবং ভাঙিয়া দিতে পারেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে অথবা আলাদা অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান কবার সময় রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অধিবেশনের কার্যসূচী কী হইবে তাহা বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স (Ordinance) জারী করিতে পারেন। কিন্তু যখন পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন বসে তখন এই অর্ডিন্যান্স লইয়া আলোচনা করিবার, ইহা অনুমোদন করিবার অথবা না করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে। যখন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়, তখন যদি পার্লামেন্টের অধিবেশন না চলে, তবে পার্লামেন্টের পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই অর্ডিন্যান্সটি পার্লামেণ্টকে দিয়া অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে, নতুবা অর্ডিন্যান্সটি কার্যকর হইবে না।

১। শাসনতন্ত্রের এই বিধানটি প্রণীত হইবার সময় গণপরিষদের সভাপতি (এবং পরবর্তী কালে ভারতের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, "Although there is no specific provision in the constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his ministers, it is hoped that the convention under which in England the King always acted on the advice of his ministers would be established in this country also. The President would become constitutional President in all matters."

আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যদিও পার্লামেণ্টই সর্বেসর্বা, তবুও আমাদের শাসনতন্ত্র একমাত্র রাষ্ট্রপতিকে একটি বিশেষ ক্ষমতাপ্রদান করিয়াছে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা।

রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা

ভারতের রাষ্ট্রপতি যে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহাতে তিনটি ভেটো ক্ষমতার সংমিশ্রণ হইয়াছে, যথা চূড়ান্ত ভেটো (Absolute veto), সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (Suspensive veto) এবং পকেট ভেটো। (Pocket veto)। প্রথমতঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করেন, তবে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। যদিও আমাদের দেশে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, তবুও আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। তবে মনে হয় শুধু বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিলেই হয়ত রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন। যদি এমন হয় যে পার্লামেণ্ট কোন বিল অনুমোদন করিবার পর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে অথচ বিলটি তখনও রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় নাই, তবে পরবর্তী মন্ত্রিসভা ইচ্ছা করিলে এই বিলটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিলে চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি যদি ইহার কোন অংশ অথবা সম্পূর্ণ বিলটিকেই পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টে ফেরত পাঠাইয়া দেন এবং পার্লামেণ্ট যদি সাধারণ সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে পুনরায় বিলটিকে অনুমোদন করে তবে বিলটি আইনে পরিণত হইবে। এই ধরনের সীমিত ভেটো (Qualified veto) প্রয়োগ করা হইলে পার্লামেণ্টের সদস্যদের শুধু বিশেষ সংখ্যাধিক্যের (extra-ordinary majoriy) জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো প্রয়োগ করা হইলে পার্লামেণ্টের সাধারণ সংখ্যাধিক্যের (ordinary majority) জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এই ক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (Suspensive Veto) প্রয়োগ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি প্রদান করা হইতে রাষ্ট্রপতি কত দিনের জন্য বিরত থাকিতে পারেন, সেই বিষয়ে অর্থাৎ পকেট ভেটো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের শাসনতন্ত্রে কোন সময়ের সীমারেখা নাই। শাসনতন্ত্রের ১১১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি ফেরত পাঠাইতে চাহেন, তবে যতশীঘ্র সম্ভব বিলটি ফেরত পাঠাইবেন। দেখা যাইতেছে,

রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যতদিন খুশী নিজের কাছে বিলটি রাখিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ যদি রাষ্ট্রপতি দেখেন যে মন্ত্রিসভার পতনের আশু সম্ভাবনা আছে তবে তিনি সংশ্লিষ্ট সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন।

শাসনতন্ত্রের ২০০নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল যদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠান তবে রাষ্ট্রপতি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য তাহা রাজ্য বিধানসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers of the President) **ঃ** রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমাপ্রদর্শন করিবার ক্ষমতাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইরূপ কিছু কিছু ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্র-প্রধানেরই হাতে কম-বেশী পরিমাণে ন্যস্ত থাকে। সংবিধানের ৭২নং ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিগণের দণ্ড মকুব করা, দণ্ডের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া, ক্ষমা করা, প্রভৃতি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন। সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত অপরাধীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে অথবা তাহাদের দণ্ড লঘু করিতে পারেন। যুগ্মবিষয়ক আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অনুরূপ অপরাধীর দণ্ড তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মকুব করিতে অথবা কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করিতে অথবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া অন্য দণ্ড দান করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি হ্রাস অথবা একজাতীয় দণ্ডের পরিবর্তে অন্য জাতীয় দণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারেন; তবে এইরূপ অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই আছে। রাজ্যসরকার-গুলির আইন লঙ্ঘনজনিত দণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য দণ্ডে ক্ষমা প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত নাই।

বিচার বিষয়ক ক্ষমতাসমূহ

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers) **ঃ** রাষ্ট্রপতি কতিপয় অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও (Financial powers) ভোগ করেন। আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথমেই সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয় হিসাব বাজেট আকারে পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থিত করান। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থ দাবি সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না। তাহা ছাড়া, আয়কর, মৃত্যুকর,

কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, রেলযাত্রীর উপর করের মাশুলের অংশ এবং অন্যান্য সাহায্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়।

রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers of the President) ঃ জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। মনে রাখিতে হইবে, দেশের সামগ্রিক জরুরী অবস্থা এবং দেশের কোন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এক জিনিস নহে। জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে রদ করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, জরুরী অবস্থায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (Maintenancc of Internal Security Act) প্রয়োগ করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করা যায় না। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইতে পারে ; এজন্য নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রদ করা যাইতে পারে না। (১) শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধের সময় অথবা (২) যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলে এবং (৩) দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, তাহা ছাড়া, (৪) কোন রাজ্যে আর্থিক সংকট উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কায় সমগ্র দেশে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। ভারতে যুদ্ধ ছাড়া অন্য সময়ে সামগ্রিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার নজির এই প্রথম।

যদি জরুরী ঘোষণা পার্লামেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত হয়, তবে ইহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে। জরুরী অবস্থায় দরকার হইলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার পাঁচ বৎসরের মেয়াদকে আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে পার্লামেণ্ট রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের রাজস্ব বণ্টনের যে অবস্থা বরাবর প্রচলিত থাকে, তাহারও রদবদল হইতে পারে। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলিও জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিটি ঘোষণাও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করিতে হয়। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতি না থাকিলে জরুরী অবস্থা মাত্র দুই মাস কাল বজায় রাখা চলে। যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ জরুরী অবস্থা মানিয়া লয় তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থা চলিতে পারে। ১৯৬২ সালের ৩০শে অক্টোবর

চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে বাতিল করা হয়। যদি পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর দুই মাসের ভিতর যদি পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ হয়, তবে পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৩০ দিন পর জরুরী ঘোষণাটি বাতিল হইয়া যায়। তবে যদি ইতিমধ্যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ ইহা আরও অধিককাল চালু রাখা সমর্থন করে, তবে ইহা চালু থাকে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৮তম সংশোধন অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে, এই সংশোধন অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি "অভিরুচি"-ই যথেষ্ট এবং ইহা বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার বহির্ভূত থাকিবে।

জরুরী অবস্থার বৈধতা বিচারের অধিকার আদালতের নাই। যুদ্ধের সময়ে জরুরী অবস্থা এবং শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ পার্থক্য নাই।

কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পান অথবা অন্য কোনভাবে যদি রাষ্ট্রপতির এই বিশ্বাস হয় যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তবে শাসনতন্ত্রের ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী তিনি এই মর্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন, এবং হাইকোর্ট ছাড়া রাজ্যের সমুদয় শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবে, ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পেপ্সু, ১৯৫৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৯৫৬ সালে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন, ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৫ সালে কেরালায়, ১৯৬৭ সালে হরিয়ানায় এবং ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যেও রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু হইতে দেখা যায়। ১৯৭৬ সালে তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে রাষ্ট্রপতির শাসন আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন? (Can the President become a Dictator?)—রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা করিলে যে প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কে পরিণত

হইতে পারেন কি না। শাসনতন্ত্রের ৭৪নম্বর ধারার ১নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন।[২] কিন্তু আইনত, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।[৩] সুতরাং অনেকের মতে রাষ্ট্রপতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত হইতে পারেন না, এ রকম জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু, এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে হইবে। কিন্তু যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়া চলেন, তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অন্য একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি বড় জোর লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (Impeach) করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলেই একনায়ক হইতে পারেন না। লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ব্যতীত, ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিগণকে সম্মিলিতভাবে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করিয়া ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভার পুনর্গঠনের আদেশ দান করেন। লোকসভার কোন দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করিলে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতার কিরূপ প্রয়োগ করিবেন তাহা একমাত্র ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠা কোন প্রথাগত বিধানই স্থির করিবে।

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক

২। "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice the President in the exercise of his functions."

৩। শাসনতন্ত্রের ৪৪ তম সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং তখন রাষ্ট্রপতির একনায়কে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা-ই থাকিবে না।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একজন উপরাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচিত করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীর যে যোগ্যতা ও শর্ত থাকা উচিত, সাধারণভাবে উপরাষ্ট্রপতিরও সেই যোগ্যতা ও শর্ত থাকা উচিত। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য যেখানে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা উচিত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য সেখানে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনও আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। শাসনতন্ত্রের ৩৯তম সংশোধন অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন লইয়া কোন বিরোধের সৃষ্টি হইলে তাহার মীমাংসা করিবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত একটি ফোরাম। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রথার ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ক্ষেত্রেও একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদানের নিয়ম অনুসৃত হয়। পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্য বিধানসভার সদস্যের পক্ষে উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে বাধা নাই। তবে একই সঙ্গে দুইটি পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট আইনসভার সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে সাধারণ পর্যায়ে অপসারণ পদ্ধতির (Process of impeachment) আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও চলে। রাজ্যসভার সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা চলে অবশ্য যদি লোকসভার ইহাতে সম্মতি থাকে। রাষ্ট্রপতির পর মর্যাদার দিক হইতে উপরাষ্ট্রপতির পদই শ্রেষ্ঠ। শাসনবিভাগের দ্বিতীয় প্রধান হইয়াও তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষের কাজ পরিচালনা করেন। উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ রাজ্যসভার (Council of States) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। শাসনতন্ত্রের ৬৫নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি কাজ না করিতে পারিলে রাষ্ট্রপতি কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইবেন। পদত্যাগ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে যখন রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। তবে অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যনির্বাহ অসমর্থ হইলে তাঁহার স্থলে যদি উপরাষ্ট্রপতি কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। শাসনতন্ত্রে এই পার্থক্য বজায় রাখার জন্য বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ

করিবেন ("shall act as President") ; এবং অন্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন ("shall discharge the functions of the President")। এই সকল ক্ষেত্রে এই পার্থক্য উপরাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শপথের ধরন—"I will faithfully execute the office of the President", এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শপথের ধরন—"I will faithfully discharge the functions of the President" উপরাষ্ট্রপতি যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন, তখন তিনি আর রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন না। সেইক্ষেত্রে রাজ্যসভার উপ-সভাপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন।

মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ (Functions of the Council of Ministers) —সাধারণত পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে, ভারত সরকারের মন্ত্রিসভাও সেই কাজগুলি করে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে, মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। ১৯৭০ সালে লোকসভা বাতিল করার পর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পূর্বে সুপ্রীম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয় যে পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকার দরুন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের মন্ত্রীত্ব থাকা অবৈধ। সুপ্রীম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যান্য মন্ত্রিদের লোকসভা ভাঙিয়া যাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব থাকা সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলিয়া রায় দান করিয়াছেন।

ভারতে তিন প্রকার মন্ত্রী

ভারতে আমরা তিন প্রকারের সদস্য দেখিতে পাই। যথা, ক্যাবিনেট সদস্য, প্রতিমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)। রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। এই তিন প্রকার মন্ত্রী ছাড়াও কতিপয় পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (Parliamentary Secretary) আছেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রে শুধু মন্ত্রিসভার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে; ক্যাবিনেটের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ভারতে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে।

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই একটি-না-একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভার অর্পিত হয় ক্যাবিনেট সদস্যগণের হাতে। মন্ত্রিগণের সাহায্যের জন্য থাকেন উপমন্ত্রিগণ। শাসন পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন এবং সরকারের আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি কার্যকর করা মন্ত্রিসভার কাজ। সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং

সরকারের আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি কার্যকরী করা মন্ত্রিসভার কাজ। সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ বিল তৈয়ার ও উত্থাপন, মন্ত্রিসভাকেই করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসনবিভাগের কাজ চালিত হয় বটে; কিন্তু সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিসভাকেই বহন করিতে হয়। পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্বও মন্ত্রিসভার। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যে সকল দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহারা যে বিশেষজ্ঞ তাহা নহে। সেজন্য মন্ত্রিদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের (Permanent civil servants) উপর নির্ভর করিতে হয়। সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্ব থাকে বলিয়া সরকারের কোন নীতি গৃহীত হইবার পূর্বে ক্যাবিনেটের বৈঠকে তাহা অধিকসংখ্যক সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিদের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের। সমগ্র মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সদস্যগণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সরকারের সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিদের, রাষ্ট্রপতির নহে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister of India)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৪(১) নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কাজে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবে।[৪] ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন।[৫]

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক সংশোধন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন লইয়া কোন বিরোধের সৃষ্টি হইলে তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত একটি ফোরামের

৪। "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his function."

৫। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীও "keystone of the cabinet arch." ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া এ্যাসকুইথ (Asquith) বলিয়াছেন, "The office of the Prime Minister in England is what its holder chooses to make it." ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমরা অনুরূপ মন্তব্য করিতে পারি।

(Forum) হাতে। তাহা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের ৭৫(১)নং ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নিযুক্তির জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তখন অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী এমন কতিপয় সহকর্মী নিয়োগ করেন যাঁহাদের নিয়োগ করিলে আইনসভায় তাঁহার নেতৃত্ব এবং তিনি যে দলের সভাপতি সেই দলের ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। লোকসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। দলের মর্যাদা এবং দলীয় নেতার মর্যাদা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

দলীয় নেতা হিসাবে নিজের দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারের পক্ষে সর্বদা দলীয় সমর্থন অর্জন করা এবং নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দল জয়যুক্ত হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি কখনও দলের ভিতরে উপদলের সৃষ্টি হয়, তবে সেই উপদলগুলি যাহাতে দলের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়, সেইদিকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী সরকারগঠনকারী পার্লামেণ্টারী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে প্রায়ই দলীয় সদস্যদের সভা আহ্বান করেন এবং দলের নীতিগুলিকেই সবকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতির মধ্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের দলের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা হন, তবে তিনি দলীয় শৃঙ্খলা অনায়াসে বজায় রাখিতে পারেন। ভাবতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

লর্ড মর্লি (Lord Morley)' ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে *"First among Equals"* বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা অনুরূপভাবে অভিহিত করিতে পারি। কারণ ক্যাবিনেট সদস্যদের সকলেরই মর্যাদা সমান। তবুও দলীয় নেতা এবং মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলি তাঁহাকে ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন করে। মন্ত্রিসভার সভায় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক

ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রিসভার জন্য সরকারী নীতি কি হইবে, তাহা বিবেচনা করেন এবং মন্ত্রিসভার সব সদস্যদেরই সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী সরকারের গৃহীত নীতি অনুসরণ না করেন অথবা ইহার বিরোধিতা করেন, তবে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দিতে পারেন। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৭৫(২)নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, "The minister shall hold office during the pleasure of the President." এই বিধানের তাৎপর্য হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশক্রমে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। যদি ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সরকারী নীতি লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ; কেননা তিনিই ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসূচীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ক্যাবিনেটকে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনাধীন থাকিতে হয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারায়[১] বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্য হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইন-প্রণয়নের প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে যখন যাহা জানিতে চাহিবেন, তাহা জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

তাহা ছাড়া, যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচিত না হয় তবে রাষ্ট্রপতির জানা দরকার হইলে তাহা রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ৭৫ (১)নং ধারা অনুযায়ী

১। শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারাটি নিম্নরূপ :—

"It shall be the duty of the Prime Ministers—(a) to communicate the President all decision of Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation ; (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for ; and (c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council."

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সাহায্য ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই সাহায্য এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া মূল শাসনতন্ত্রে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে শেষপর্যন্ত হয়ত তিনি নিজেই শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ ডাকিয়া আনিবেন। কারণ, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন তবেই বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। সেইক্ষেত্রেও যদি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ না করেন তবে বুঝিতে হইবে যে শাসনতন্ত্রের ৬১নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ (impeached) করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরিচালিত করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রধান শাসনকর্তা। শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকিবেন।

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। লোকসভার অধিবেশন কখন আহ্বান করা হইবে, কতদিন ইহার অধিবেশন বজায় রাখা হইবে এবং কখন ইহা ভাঙিয়া দেওয়া হইবে প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে পরামর্শ প্রদান করেন, তাহাই এইক্ষেত্রে কার্যকর হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেণ্টের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে পার্লামেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেইদিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। পার্লামেণ্টকে কোন ব্যাপারে স্বমতে আনিতে না পারিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে লোকসভা বাতিল করিয়া লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের আদেশ দান করিয়াছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে নূতন লোকসভার পুনরায় অধিবেশন বসে; দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারের শাসন-বিভাগের প্রকৃত

লোকসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হইতেছেন জাতির প্রতীক এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রধান।

Exercise

1. ভারতের রাষ্ট্রপতি কিরূপে নির্বাচিত হন ?

[How is the Indian President elected ?]

2. ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[Describe the position and powers of the President of India.]

3. ভারতের রাষ্ট্রপতি কি কখনও একনায়ক হইতে পারেন ?

[Can the Indian President ever become a dictator ?]

4. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা এবং ক্ষমতা আলোচনা কর।

[Discuss the position and powers of the Indian Prime Minister.]

5. "ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদটি যেমনভাবে চান সেভাবেই তৈরী করিতে পারেন"—উক্তিটি আলোচনা কর।

["The office of the Indian Prime Minister is what its holder chooses to make it.' ' Discuss the statement.]

6. ভারতের মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।

[Discuss the functions of the Council of Ministers of India.]

7. ভারতের রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার উপর একটি টীকা লিখ।

[Write a note on the legislative and judicial powers of the Indian President.]

8. ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার উপর একটি টীকা লিখ।

[Write a note on the emergency powers of the Indian President]

9. (ক) একক শাসন কর্তৃপক্ষ ও (খ) সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

[Write short notes on (a) Single Executive and (b) Plural Executive.]

পঞ্চদশ অধ্যায় | এক-কক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা —ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা

এক-কক্ষবিশিষ্ট অথবা দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ (Unicameral or Bi-cameral Legislature)ঃ কোন কোন দেশে যেমন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ দেখা যায়; একটি হইতেছে নিম্ন কক্ষ (Lower House) এবং অপরটি হইতেছে উচ্চ কক্ষ (Upper House)। ভারতের পার্লামেন্টে নিম্ন কক্ষের নাম লোকসভা (House of the People) এবং উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States)। ভারতে কোন কোন রাজ্যে (যেমন কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি) এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা আছে, এইগুলিকে বিধানসভা বলা হয়। যে সব রাজ্যে দুই-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে, সেগুলির নিম্নকক্ষকে বলা হয় বিধানসভা এবং উচ্চকক্ষকে বলা হয় বিধান পরিষদ।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of a bi-cameral legislature)ঃ আইন পরিষদ এক-কক্ষবিশিষ্ট হইবে অথবা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইবে, এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-সভার পক্ষে যুক্তি

লেকি (Lecky) তাঁহার "Democracy and Liberty" বইয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উচ্চতর কক্ষ নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে। নিম্ন কক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার সময় পাওয়া যায়।[১]

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১। সেইজন্য লেকি বলেন, "The necessity of Second Chamber to exercise a controlling, modifying and retarding influence, has acquired almost the position of an axiom."

প্রথমতঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত আইন-প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদস্যগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। তাহাতে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে ইহাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত না হইয়া বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, তবে যে কোনও একটি কক্ষের সদস্যগণের পক্ষে সর্বদা জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে বলা হয় যে ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক। যদি আইন পরিষদে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা যে কোন সময়েই স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। অপরপক্ষে আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিতে পারে। লর্ড ব্রাইস মনে করেন যে, কোনও একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোন পরিষদ থাকা উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। এইজন্যই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন।[২]

লর্ড ব্রাইস ও জন স্টুয়ার্ট মিল-এর অভিমত

কিন্তু এক্ষেত্রে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি অনুধাবন যোগ্য। মিল দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা স্বীকার করেন না।[৩] নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সেইভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে।

২। "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly is to become hateful, tyrannical and corrupt, and needs to be checked by the existence of another House of equal authority."—Bryce

৩। "I see little value on any check which a second chamber can apply to a democracy otherwise unchecked."—Mill

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে। ডুগুইটের (Duguit) মতে শ্রেষ্ঠ আইন পরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে একটি কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জনসমষ্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই সুবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি মূলরাষ্ট্র সিনেটে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইন পরিষদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদারনৈতিক মতবাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্মপ্রতিভা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং শাসনব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইন পরিষদের প্রধান কাজ শুধু আইন-প্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকেও আইন পরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ ব্যবহারজীবী প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সর্বশেষে, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, ইহা শাসনবিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। যদি আইন পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু, যদি আইন পরিষদে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও পক্ষেই শাসনবিভাগের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভব নহে। যদি কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে শাসন-বিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অনুকূল হয়।

উচ্চকক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তিও সদস্য হইতে পারেন

উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের বিপক্ষে এবং এক-কক্ষবিশিষ্ট

আইন পরিষদের পক্ষে যুক্তি—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন কোন লেখক এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের সমর্থক ছিলেন। আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (Benjamin Franklin) এবং ইংলণ্ডে বেন্থাম্ (Bentham) মনে করিতেন যে আইন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শুধু এমন একটি কক্ষ থাকা উচিত, এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে ন্যস্ত করা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করিবার নীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত অনেক নূতন রাষ্ট্রের যেমন, আধুনিক গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কস্টা রিকা (Costa Rica), হণ্ডুরাশ (Honduras) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদের মতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটি সাময়িক নীতি মাত্র। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইন পরিষদ, জাতীয় কেন্দ্রিকতার (national centralization) গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভার বিপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, যদি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়, শাসন-বিভাগের দায়িত্ব কোথায় থাকিবে তাহা ঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়।[8] অনেকে মনে করেন যে আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে, দায়িত্ব এবং কর্তব্যেরও বিভাজন হয়; ইহার ফলে দায়িত্ব ও কর্তব্য নষ্ট হইয়া যায়। কেননা, তখন পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়তঃ, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের জন্য মাত্র একটি আইন পরিষদই যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অনুভূত হয় না। অবশ্য মার্কিন সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের আইন পরিষদের

৪। "There is probably more truth in the contention that bicameralism divides responsibility and hence duties may even destroy it."—Dimock and Dimock: American Government in Action.

উচ্চতর কক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলিয়াছিলেন যে উচ্চ-পরিষদ যদি আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন-পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাহুল্য মাত্র, আর যদি ইহা নিম্ন-পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক। সুতরাং দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের কোন প্রয়োজন নাই।[৫]

তৃতীয়তঃ, আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে, কিন্তু মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিম্ন-পরিষদে আইন-প্রণয়ন করিবার সময় যে সব ব্যবস্থাই দ্রুত অবলম্বিত হয়, তাহা নহে। আইনসভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে যে কোনও আইন-প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেরই খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেগুলির উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয়। তাহা ছাড়া, নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন যে উচ্চ পরিষদ খুব বেশী সংশোধন অথবা আংশিক বাতিল করিতে পারে তাহা নহে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষেত্রে নহে)। সেজন্য অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদই যথেষ্ট। আধুনিক আইন পরিষদের নিম্ন-কক্ষে যথাসম্ভব বিতর্ক এবং বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। সুতরাং উচ্চ-কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম।

পঞ্চমতঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে চিন্তা করিলে আইন পরিষদে একটি কক্ষ থাকা উচিত।

ষষ্ঠতঃ, উচ্চ-পরিষদ যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে তাহা নহে। আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্টের গঠন (Composition of the Union Legislature or the Indian Parliament)—ভারতের কেন্দ্রীয় আইন-প্রণয়ন বিভাগ হইতেছে রাষ্ট্রপতি-সহ-পার্লামেণ্ট (President-in-Parliament)। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সদস্য নহেন; কিন্তু তিনি আইন-প্রণয়ন বিভাগের একটি

৫। "Of what use will a second chamber be? If it agrees with the Representative House, it will be superfluous, if it disagrees, mischievous."—Abbey Seieyes

অংশ। শাসনতন্ত্রের ৭৯নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ আছে। নিম্ন-কক্ষটির নাম লোকসভা (House of the People)। ইহার সদস্যসংখ্যা ৫৪০ জনের বেশী হয় না, এবং ভোটাধিকার আছে এই রকম নাগরিকদের ভোটে (ভোটারের অন্তত ২১ বৎসর বয়স হওয়া চাই) ইহার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। অনধিক ৫২০ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন বিভিন্ন মূলরাজ্য হইতে, এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইতে অনধিক ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন। পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States)। ইহার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হয় না। তন্মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য সমাজসেবা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হইতে হয়। রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ এবং পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যসভার অনধিক ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচন করিতে পারেন (৮০নং ধারা)। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত স্পীকার। রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হিসাবে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হয়। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য নহেন। তিনি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

দুইটি কক্ষ

পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে; রজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে অন্তত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইতে হইলে অন্তত পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। মন্ত্রী অথবা পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত কোন পদাধিকার ব্যতীত পার্লামেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারত সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক কাজ গ্রহণ করা চলিবে না। কোন আদালত কর্তৃক কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘোষিত হইলে অথবা কেহ দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যপদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন না। যদি কেহ দুইটি কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্ট নির্বাচিত হন, তবে তাঁহাকে একটি কেন্দ্রের সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হয়।

পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার যোগ্যতা

পার্লামেণ্টের অধিবেশন এবং স্থায়িত্বকাল (Session of the Parliament and the duration of the Parliament): রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ৮৫নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ইহার অধিবেশন

(adjourn) রাখিতে পারেন, এবং ইহার অধিবেশন শেষ করিয়া দিতে পারেন এবং ইহা ভাঙিয়া দিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ৮৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং কোন পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হইল সেই কথা সদস্যদের জানান। শাসনতন্ত্রের ৮৫ (১)নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন এমনভাবে আহ্বান করিতে হইবে যেন গত অধিবেশনের শেষ বৈঠক এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয় মাসের বেশী না হয়। পার্লামেন্টের নিম্ন-কক্ষকেই অর্থাৎ শুধু লোকসভাকেই রাষ্ট্রপতি ভাঙিয়া দিতে পারেন; উচ্চ-কক্ষ অথবা রাজ্যসভাকে নহে। শাসনতন্ত্রের ৮৫নং ধারার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুইটি কারণে লোকসভার অধিবেশন ভাঙিয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা অনুযায়ী সময়ের মেয়াদবৃদ্ধি অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৮৫ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে।

সাধারণত যতদিন লোকসভার অস্তিত্ব থাকে, ততদিন লোকসভার সদস্যগণও নিজপদে আসীন থাকেন। কিন্তু পূর্বে পার্লামেন্টের প্রার্থীদের যোগ্যতার যে শর্তগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির কোন একটির অভাব দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পার্লামেন্টের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে বলা হয়। পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সভার অনুমতি না লইয়া দুই মাসের জন্য যদি কোন সদস্য পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদান করা হইতে বিরত থাকেন, তবে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ আবর্তনের মাধ্যমে (by rotation) নির্দিষ্ট সময়ান্তর অবসর গ্রহণ করেন। পার্লামেন্টের সাধারণ স্থায়িত্বকাল হইতেছে পাঁচ বৎসর; তবে জরুরী অবস্থায় ইহার মেয়াদ বাড়ানো যাইতে পারে; একেবারে এক বৎসরের বেশী পার্লামেন্টের মেয়াদ বাড়ানো যায় না এবং শাসনতন্ত্রের ৮৩নং ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা শেষ হইয়া গেলে ছয় মাসের বেশী পার্লামেন্টের মেয়াদ অতিরিক্ত বাড়ান যায় না।

পার্লামেন্টের সদস্যদের স্থায়িত্বকাল

পার্লামেন্টের কাজ (Functions of the Parliament): সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রথম কাজ হইতেছে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ভারতে লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই একজন নেতা নির্বাচন করিতে হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সেই পদে নির্বাচিত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ

করা। সরকারের কাজের জন্য মন্ত্রিসভা যৌথভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য সাহায্য করা, এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার কাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া সরকারের কাজ বা নীতির সংস্কার করাও পার্লামেণ্টের কাজ। মন্ত্রিসভাকে সব সময়েই লোকসভার আস্থাভাজন থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট হইতেছে সংবাদ পরিবেশনের বাহন (an organ of information); সমগ্র দেশে কি হইতেছে না হইতেছে, ইত্যাদি সব ব্যাপারে পার্লামেণ্ট খোঁজ-খবর রাখিতে পারে এবং পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মন্ত্রিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণয়ন করা হইতেছে পার্লামেণ্টের শ্রেষ্ঠ কাজ। মূলতঃ পার্লামেণ্ট হইতেছে আইন-প্রণয়ন বিভাগ। সর্বশেষে, সরকারের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারেও পার্লামেণ্টের অনেক কর্তৃত্ব থাকে।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের কাজ (Functions of the Parliament regarding Law-making) : পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য এই কাজে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হন।

পার্লামেণ্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইনপ্রণয়ন করা। সরকারী এবং বে-সরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া ও সেইগুলি অনুমোদন করিয়া রাজ্যসভার নিকট প্রেরণ করাই লোকসভার মুখ্য কাজ। কিন্তু, অর্থ সংক্রান্ত বিল শুধু লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই ইহার সংশোধন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল লইয়া রাজ্যসভা বিতর্ক করিতে পারে বটে; কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, অথবা কোন আন্তর্জাতিক সন্ধির বিভিন্ন শর্ত পালন করিবার জন্য প্রয়োজন হয় অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক পার্লামেণ্ট অনুরুদ্ধ হয়, তবে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। যদি রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কখনও এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন-প্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্ট সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় লইয়া রাজ্য বিধানমণ্ডল এবং পার্লামেণ্টের প্রণীত

আইনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায়, তবে পার্লামেন্টের আইনটি কার্যকর হইবে এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনটি বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত তালিকার উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ যে কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা (Residuary Powers) পার্লামেন্টের হাতে রহিয়াছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of the Parliament): সম্প্রতি শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদ সহ শাসনতন্ত্রের যে কোন অংশ সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্রের যে সংশোধন করিবে তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে না। পার্লামেন্টের হাতে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টেরই সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব (Parliament's control over Union Finances): কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ। কেননা, সরকারের সুপারিশ ব্যতীত কোন নূতন কর ধার্যের দাবি অথবা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করা যায় না। লোকসভার ক্ষমতা হইল ব্যয় হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার অথবা কর হ্রাস বা বিলোপ করার—ইহা ছাড়া, সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সমালোচনা করিবার এবং কৈফিয়ৎ তলব করিবার অধিকার লোকসভার আছে। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটির (Public Accounts Committee) রিপোর্টের উপর লোকসভার বিতর্কের অনুষ্ঠান হয় এবং যদি দেখা যায় যে সরকার পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়াই কোন খাতে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, অথবা সরকারী অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তবে তাহার জন্য লোকসভা সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারে। তাহা ছাড়া, ব্যয় মঞ্জুর কমিটি বা Estimates Committee (যাহা লোকসভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়) সরকারী ব্যয়ের কর্মসূচী পূর্ব হইতেই খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিতে পারে; সরকারের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত লোকসভার সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সরকারের কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে। যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) হইতে খরচ করা হয়। এইগুলি পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়

(votable expenditures) নহে ; কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ এইগুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারে।

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Two Houses of the Parliament) **:** অর্থ-সংক্রান্ত ব্যতীত যে কোন বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে, এবং এক কক্ষে ইহা অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষে ইহা প্রেরিত হয়। উভয় কক্ষই বিলটির রদবদল করিতে পারে। কিন্তু অর্থ-বিলগুলি (Money Bills) প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রাজ্যসভা এই বিলগুলি লইয়া বিতর্ক করিতে পারে, কিন্তু লোকসভার সিদ্ধান্তের উপর বিলগুলির কোনও প্রকার সংশোধন করিতে পারে না। অর্থ-বিলগুলি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে ইহার সুপারিশসহ বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করা অথবা না-করা লোকসভার উপর নির্ভর করে। যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি ফেরত না পাঠায়, তবে বিলটি অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং যথারীতি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহাকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য বিলগুলিকে আইনপ্রণয়ন করার ব্যাপারে দুইটি কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। অর্থ-বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। যদি একটি কক্ষ কোন সাধারণ বিল অনুমোদন করে অথচ অপর কক্ষ ইহা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় অথবা একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও বিলটি অনুমোদন না করে, তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে বিলটিকে অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। রাজ্যসভার কোন কোন সদস্য লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাহা ছাড়া, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভা অধিকতর শক্তিশালী।

অর্থ-বিল প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়

লোকসভার স্পীকার (Speaker of the House of the People) **:** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৯৩নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই সদস্যগণ একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁহাকে স্পীকার (Speaker) বলা হয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৯তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় লোকসভার স্পীকারের পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচনও আদলেতে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। স্পীকারের নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধের মীমাংসা করিবার দায়িত্ব থাকিবে এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত একটি ফোরামের (Forum) উপর।

স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের কাজের মেয়াদ থাকিবে লোকসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। কিন্তু যদি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ স্পীকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তবে স্পীকারকে পদত্যাগ করিতে হয় (৯৪নম্বর ধারা)। কিন্তু এই জাতীয় অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করিবার পূর্বে অন্তত ১৪ দিনের একটি নোটিশ দিতে হইবে। যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া লোকসভায় আলোচনা চলিবে, তখন স্পীকার আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না অথবা তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের অনুমোদনে লোকসভায় সরকার পক্ষ এবং উভয়পক্ষের সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিতে পারিবেন না।

স্পীকারের কার্যকাল ও অপসারণ

লোকসভায় অন্যান্য সমুদয় অধিবেশনেই স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। কোনও বিল অনুমোদিত হইবার সময় প্রথমেই স্পীকার ভোট প্রদান করেন না। যদি বিলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কখনও সমান সংখ্যক ভোট হয় তবে স্পীকার নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করেন। লোকসভায় স্পীকার সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ থাকেন এবং তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতেও যোগদান করেন না। তাঁহার প্রধান দায়িত্ব হইতেছে লোকসভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ইহার ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা প্রদান করা। যদি লোকসভার অধিবেশনে প্রয়োজনীয় কোরাম (quoram) বা যতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন ততজন সদস্য উপস্থিত না থাকেন, তবে স্পীকার লোকসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ১২২নম্বর ধারা অনুযায়ী লোকসভার স্পীকারের আচরণ সম্বন্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। শুধু লোকসভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়াও স্পীকার আরও কতিপয় ক্ষমতা ভোগ করেন যেগুলি রাজ্যসভার সভাপতি (উপরাষ্ট্রপতি) ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রের ১১৮নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারেন শুধু স্পীকার। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল

স্পীকারের ক্ষমতা

স্পীকার এবং রাজ্যসভার সভাপতির মধ্যে পার্থক্য

লোকসভা হইতে রাজ্যসভায় পাঠাইবার সময় শাসনতন্ত্রের ১১০নম্বর ধারার ৪নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার সেই বিলটি যে অর্থ-বিল তাহা অনুমোদন করেন। স্পীকার হইতেছেন লোকসভার নির্বাচিত ব্যক্তি; কিন্তু রাজ্যসভার সভাপতি (উপ-রাষ্ট্রপতি) পদাধিকার বলে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন।

পার্লামেণ্টের এবং ইহার সদস্যদের কতিপয় সুবিধা (Privileges of the Parliament and its members)**:** ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যাহাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সহিত নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি আছে বলিয়াই তাঁহারা নির্ভয়ে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে তাঁহাদের যদি সম্পূর্ণ বাক্-স্বাধীনতা না থাকিত তবে তাঁহারা ঠিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন না। পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা একটি উচ্চ শ্রেণীতে তাঁহাদের ফেলা হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এবং ঠিকভাবে করিয়া যাইতে পারেন সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এবং পার্লামেণ্টের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার অথবা নিয়মের অধীন থাকিয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশনে কোন সদস্য সরকার সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলুন না কেন, তাহা লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। পার্লামেণ্টের বিতর্কের বিবরণীও আদালতে প্রেরণ করা যায় না। শুধু বাক্-স্বাধীনতাই নহে, সমষ্টিগতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের লিখিতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের (Right of Publication) স্বাধীনতা আছে। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টের ভিতরে যদি কোন সদস্যের আচরণ অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। তাহা ছাড়া, বাহিরের কোন লোক যদি পার্লামেণ্টের কোন সদস্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও পার্লামেণ্টের আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯৬১ সালে পার্লামেণ্টের সদস্য আচার্য কৃপালনীর অভিযোগক্রমে লোকসভা বোম্বাইয়ের 'Blitz' কাগজের সম্পাদককে ভৎর্সনা করে। ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্যদের তিনটি অধিকার আছে, যথা—(১) গ্রেপ্তার না হইবার অধিকার, (২) জুরী অথবা সাক্ষী

হিসাবে আদালতে উপস্থিত না থাকিবার অধিকার এবং (৩) বাক্-স্বাধীনতার অধিকার। পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং ১৪ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টের কোন সদস্যকে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা নাশকতামূলক কোন ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা যায় না।

পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ণ পদ্ধতি (Process of law-making in the Parliament)—শাসনতন্ত্রের ১০৭(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ-বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। সরকারী বিল হইলে কোন মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করিবেন এবং বে-সরকারী বিল হইলে পার্লামেন্টের যে কোন সদস্য বিলটি উত্থাপন করিবেন। মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য যদি বিলটি উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে এই ব্যাপারে পূর্বেই নোটিশ দিতে হয় এবং সভার অনুমতি লইতে হয়। কিন্তু কোন বিল যদি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইবার পূর্বেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়, তবে তাহা পার্লামেন্টে উত্থাপন করিবার জন্য সভার অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

কোন বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইবার পর সেই বিলটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যথা—(ক) বিলটি বিবেচিত হউক। (খ) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হউক। (গ) অপর কক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষে বিলটি উভয় কক্ষের একটি যৌথ-কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক। (ঘ) জনমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচারিত হউক।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কোন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিলটির আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। যদি বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় তবে সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনা করিয়া পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট কক্ষে ইহার রিপোর্ট প্রদান করে। তখন সেই কক্ষ সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিলটি বিবেচিত হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভার সদস্যগণ বিলটির বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করিতে পারেন এবং ইহার সংশোধন করিতে পারেন।

যদি বিলটির কোন সংশোধন না হয়, অথবা যদি বিলকে সংশোধিত করা হয় এবং ইহা সংশোধিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় তখন সেই কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইয়া গেলে অপর কক্ষে বিলটি প্রেরিত হয়। অপর কক্ষে বিলটিকে অনুরূপভাবে অনুমোদিত হইতে হয়। অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে

বিলটিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে শাসনতন্ত্রের ১০৮(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে সংশোধিত করিয়া ইহা অনুমোদন করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে বিলটি প্রথম যে কক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল সেই কক্ষে ইহাকে পুনরায় ফেরত পাঠান হয়। যদি প্রথম কক্ষ এই সংশোধন অনুমোদন করে, তবে ইহা শাসনতন্ত্রের ১১১নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার যদি প্রথম কক্ষ এই সংশোধন গ্রহণ না করিতে চাহে, তবে, শাসনতন্ত্রের ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। সর্বশেষে এক কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর যদি অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও ইহা টেবিলে ফেলিয়া রাখে এবং ইহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তবে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ১০৮(১) (গ) নম্বর ধারা অনুযায়ী উভয়-কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে কি করা হইবে?

যখন উভয় কক্ষ কর্তৃক এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিলটি অনুমোদিত হয় তখন রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহা প্রেরিত হয়। যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করেন তবে, বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি অবশ্য পুনর্বিচারের জন্য বিলটিকে পার্লামেন্টের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া না গেলে যদি বিলটি পুনরায় পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং যদি পুনরায় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক ইহা অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন না।

অর্থ-বিল এবং অর্থসংক্রান্ত বিল (Money bills and Financial bills) ঃ অর্থ-বিল হইতেছে সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল। কর ধার্য করা, কর তুলিয়া দেওয়া, করের হার পরিবর্তন করা এবং কোন ক্ষেত্রে করের নিয়ম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত কোন বিল, সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল এবং Consolidated Fund of India অথবা Contingency Fund of India অনুযায়ী খরচ সংক্রান্ত কোন বিল, Consolidated Fund of India খাতে কোন অর্থপ্রাপ্তি, ভারতের Public Account সংক্রান্ত কোন বিল অথবা মুদ্রানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল ইত্যাদি সবই অর্থ-সংক্রান্ত বিলের (Financial bills) আওতায় পড়ে। অর্থ-বিল অথবা অর্থসংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা

যায় না। যদি কোন বিল প্রকৃতই অর্থসংক্রান্ত বিল কিনা এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে, তবে স্পীকার সেই বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

লোকসভায় অর্থ-বিল উত্থাপিত হইলে স্পীকার একটি দিন ধার্য করেন, সেই দিনের মধ্যে বিলটির অনুমোদনের কাজ শেষ করিতে হয়। যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে লোকসভার বিতর্ক শেষ না হয় এবং অর্থ-বিলটি অনুমোদিত না হয়; তবে স্পীকার গিলোটিন প্রয়োগ করিয়া নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিলটি বিতর্ক ব্যতিরেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিল অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর ইহা রাজ্যসভা কর্তৃক সমর্থিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা কোন অর্থ সংক্রান্ত বিল অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বিলটি পাইবার ১৪ দিনের মধ্যেই রাজ্যসভা নিজের সুপারিশসহ ইহাকে লোকসভায় পাঠাইয়া থাকে। লোকসভা ইচ্ছা করিলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ কবিতে পারে অথবা না-ও করিতে পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থ সংক্রান্ত বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত না পাঠায়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে উভয় কক্ষ কর্তৃকই বিলটি অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা (Legislative Assembly of West Bengal) **:** পশ্চিমবঙ্গে আমরা এক-কক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা দেখিতে পাই। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলের দুইটি কক্ষ ছিল, তখন উচ্চতর কক্ষকে বলা হইত বিধান পরিষদ। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা হইতেছে ২৮৪ জন। অন্যান্য রাজ্যের রাজ্য বিধানসভার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যগণও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকাগুলিকে (Territorial Constituency) এইরূপভাবে বিভক্ত করিতে হইবে যেন ৭৫ হাজার জনসাধারণের জন্য অনধিক একজন সদস্য নির্বাচিত হন। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০ জনের কম এবং ৫০০ জনের বেশী হইতে পারে না। রাজ্যপাল শাসনতন্ত্রের ৩৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হয়।

বিধান সভার গঠন

শাসনতন্ত্রের ১৭১নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় স্থায়িত্বকাল ৫ বৎসর;

রাজ্যপাল এই সভাকে ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারেন।

বিধান সভার স্থায়িত্ব

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা থাকা কালে পার্লামেণ্ট রাজ্য বিধানসভার কার্যকাল প্রতিবারে এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারেন; তবে উহার স্থায়িত্বকাল কোনক্রমেই জরুরী অবস্থার প্রত্যাহারের পর ৬ মাসের অধিক বাড়ান চলে না।

বিধানসভার সদস্য পদের যোগ্যতা

বিধানসভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার জন্য নির্বাচন প্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হইতে হয় এবং বিধানসভার ভোটার হইতে হয়। তাহা ছাড়া বিধানসভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইতে হইলে কোন সদস্যকে ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য হইতেই একজন স্পীকার এবং একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার পার্লামেণ্টের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের অনুরূপ কাজ করিয়া থাকেন এবং অনুরূপ ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন। বিধানসভার অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করেন এবং ইহার যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন ও অধিবেশন চলাকালে বিধানসভার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

রাজ্যবিধানসভার ক্ষমতা (Powers and Functions of the State Legislature)ঃ রাজ্যবিধানসভার প্রধান কাজ রাজ্যতালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি, কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যবিধানসভার আইনসমূহ এইসব ক্ষেত্রে

রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে ক্ষমতা

প্রযুক্ত হয় না। শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার ঘোষণা হইলে সমস্ত রাজ্যের উপর শাসনতন্ত্রের ২৫০ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই ভাবে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্যবিধানসভার আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সীমিত করা হইয়াছে। যুগ্মতালিকার বিষয় (Concurrent List) সম্পর্কেও রাজ্যবিধানসভা আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তবে রাজ্যবিধানসভা কর্তৃক প্রণীত যুগ্মতালিকার কোন বিষয় সম্পর্কিত আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত উক্ত বিষয়ের আইনের বিরোধী হইলে রাজ্যের বিধানসভার প্রণীত আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যায় এবং পার্লামেণ্টের আইন কার্যকর হয়। অবশ্য রাজ্যবিধানসভা যদি এই আইন সম্পর্কে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ

করে তাহা হইলে সেই আইন পার্লামেণ্টের আইনের সহিত আপাত-বিরোধী হইলেও উহা বাতিল হইবে না।

রাজ্যসরকারের মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিগণকে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোন প্রকার প্রশ্ন করিবার অধিকার বিধানসভার আছে। বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থামূলক অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। তবে যদি রাজ্যমন্ত্রিসভা কখনও বিধানসভায় সংকটের সম্মুখীন হয় তবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশে চরণ সিং মন্ত্রিসভার পদত্যাগকালে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেন।

মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বিধানসভার নিকট

যে কোন বিলই আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যমন্ত্রিসভা কর্তৃক বিধানসভায় বিলটি উত্থাপন করিতে হয়। রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া আর্থিক বৎসর সুরু হইবার আগে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় অর্থবিল বা বাজেট উত্থাপন করেন। আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার আগেই বিধানসভা কর্তৃক বাজেট অনুমোদন করিতে হয়। ইহা ছাড়া যে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল রাজ্য-বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। সাধারণভাবে কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে পার্লামেণ্টের ন্যায় রাজ্যবিধানসভায়ও বিলটির তিনটি পাঠ (Three Readings) হইতে পারে। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে একটি বিল আইনে পরিণত করার পথে তিনটি পাঠের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। কোন বিল বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যপাল বিলটিতে সম্মতি প্রদান করিলে ইহা আইনে পরিণত হয়। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিলটিতে সম্মতি প্রদান না করিয়া ইহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাইতে পারেন। তখন রাষ্ট্রপতি ইহা অনুমোদন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিধানসভায় অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা সীমাহীন নহে। এমন কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি বিধানসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে, যেমন রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং রাজ্যের ঋণ-সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। এইগুলি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of the State) হইতে নির্বাহ করা হয়।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যদের বিভিন্ন অধিকার (Privileges of the members of the State Legislature) ঃ পার্লামেণ্টের সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিধানসভার সদস্যগণও কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। যে-সব রাজ্যের বিধানমণ্ডলে দুইটি কক্ষ আছে সেগুলিতে উভয় কক্ষের সদস্য-গণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্রের ১৯৫ নম্বর ধারায় ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যদের আইনসভায় বাক্-স্বাধীনতা থাকিবে। এই ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বিধানসভায় অথবা বিধানপরিষদে কিছু বলিবার জন্য অথবা ভোটপ্রদানে নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী চলিবার জন্য রাজ্যবিধান-মণ্ডলের কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না। বিধানসভার কোন সদস্য যদি সভার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত কোন রিপোর্ট অথবা কাগজপত্র প্রকাশ করেন তবে তাহা আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত থাকিবে। কিন্তু স্পীকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বিধান-সভার ক্রিয়াকলাপের কোন অংশ প্রচারের জন্য এই অব্যাহতি পাওয়া যায় না। রাজ্য-বিধানমণ্ডলেব কোন সদস্য যদি বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করিবার দাবিতে এমন কোন কথা বলেন যে ইহাতে আইনসভার শৃঙ্খলা নষ্ট হয় তবে স্পীকাব তাঁহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যদের অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডেব পার্লামেণ্টের কমন্সসভা অথবা ইহার বিভিন্ন কমিটির অধিকারগুলি অনুসৃত হয়।

ভারতে রাজ্যবিধানমণ্ডলেব কোন সদস্যকে রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৪০ দিন পূর্ব হইতে ৪০ দিন পর পর্যন্ত ফৌজদারী অথবা নিবর্তনমূলক আটক আইন ছাড়া গ্রেপ্তার করা চলে না। যখন বিধানমণ্ডলের অধিবেশন চলে, তখন কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষী প্রদান করিবার জন্য কিংবা জুরী হিসাবে কাজ করিবার জন্য আহ্বান জানানো যায় না। রাজ্য বিধানসভা অথবা পরিষদের কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেই তৎক্ষণাৎ ইহা রাজ্যবিধানমণ্ডলকে জানাইতে হয়। বিধানসভার অভ্যন্তরে স্পীকারের সম্মতি ব্যতীত এবং বিধান পরিষদের অভ্যন্তরে উক্ত পরিষদের সভাপতির সম্মতি ব্যতীত কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। রাজ্যবিধান-মণ্ডলের কোন ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আদালতের নাই। কেহ যদি বিধানসভা বা বিধান পরিষদের অবমাননা করেন তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার অধিকার বিধানসভার বা বিধান পরিষদের আছে। ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভার অধিকার লইয়া একটি চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভার স্পীকার জিনজ-

সমাজতন্ত্রী কর্মীকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করেন যে তাঁহাদের প্রণীত একটি পুস্তিকা বিধানসভার অবমাননা করিয়াছে। এই তিনজন কর্মীর দুইজন বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া স্পীকার কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। কিন্তু অপরজন, শ্রীকেশব সিং, বিধানসভায় উপস্থিত না হওয়ায় স্পীকার তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। সাতদিনের কারাদণ্ডের পরোয়ানা পাইবামাত্র শ্রীকেশব সিং জনৈক অ্যাডভোকেটের সাহায্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নিকট বন্দীকে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন (Habeas Corpus Petition) জানান। বিচারক শ্রী এন. ইউ. বেগ (N. U. Beg) এবং বিচারক শ্রী জি ডি. সেহ্‌গল (Sehgal) আবেদনটি শুনিয়া আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান সাপেক্ষে শ্রীকেশব সিংকে জামিনে মুক্তি দান করেন। স্পীকার তখন উক্ত নাগরিক, অ্যাডভোকেট এবং বিচারপতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে স্পীকারের আদেশের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ লইবার চেষ্টা করিবার দরুন তাঁহারা সকলেই স্পীকারের তথা বিধানসভার অবমাননা করিয়াছেন। সুতরাং স্পীকার তাঁহাদের সকলকেই বিধানসভায় উপস্থিত হইয়া স্পীকার কর্তৃক ভর্ৎসিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২৮ জন বিচারপতি পূর্ণ অধিবেশনে স্পীকারের এই আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন। পরবর্তী একটি আদেশে স্পীকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (warrant) তুলিয়া লন, এবং সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি (১৪৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ) সমুদয় বিষয়টি প্রেরণ করেন। ১৯৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন যে আইনসভার অধিকার বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা শুধু উক্ত মামলাটিই বিবেচনা করিয়াছেন এবং এই বিবেচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট এবং বিচারপতিদ্বয় বিধানসভার অবমাননা করেন নাই। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যবিধানমণ্ডল প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে নাই। লোকসভায় স্পীকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে শাসনতন্ত্রের ১৯৪(৩)নং ধারাকে উপযুক্তভাবে ব্যক্ত করিয়া আইনসভার অধিকারকে আরও স্পষ্ট করা উচিত, এবং সুপ্রীম কোর্টেরও শাসনতন্ত্রের নূতন বিধান রচনা করিবার অধিকার নাই।

যাহা হউক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি ডিভিসন ১৯৬৫ সালের ১০ মার্চ ঘোষণা করেন যে শ্রীকেশব সিং-কে শাস্তি প্রদান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার স্পীকারের ছিল এবং সে ক্ষেত্রে স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি আদালত নাকচ করিতে পারে না। সেইজন্য আদালতের রায় অনুসারে শ্রীকেশব সিং-কে সাতদিনের জন্য কারাদণ্ড ভোগ

করিতে হয় ; তবে আইনসভার স্বার্থে আদালত বনাম পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্র শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

Exercise

1. আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা কর।
[Examine the utility of the Second Chamber.]

2. "যদি উচ্চতর কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভার সহিত একমত হয়, তবে ইহার প্রয়োজন নাই। যদি ইহা একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক।" এই যুক্তিটির সারবত্তা আলোচনা কর।
["If the Second Chamber agrees with the Representative House, it will be super fluous, if it disagrees, mischievous."—Discuss the validity of this statement.]

3. আধুনিক সরকারের আইন-প্রণয়ন বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখিবার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss the problem of bicameralism in connection with the constitution of the legislative organ of modern governments.]

4. আইন-পরিষদ গঠনে "দ্বি-পরিষদ প্রথা" বলিতে কি বুঝ? এই প্রথার গুণাগুণের বর্ণনা দাও।
[What is Bicameralism ? Point out its merits and defects]

5. পার্লামেন্টের গঠন ও কাজকর্ম বর্ণনা কর।
[Describe the composition and functions of the Parl a nent.]

6. যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুইটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[Discuss the relation between the two Houses of the Union Legislature.]

7. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব বর্ণনা কর।
[Describe the Parliament's control over Union finances.]

8. ভারতে কিভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় এবং ইহা কিভাবে কাজ করে তাহা বর্ণনা কর।
[Describe how the Union Parliament is formed in India and how it works.]

9. ভারতীয় পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।
[Discuss the process of law-making in the Indian Parliament.]

10. লোকসভার স্পীকারের মর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।
[Discuss the position and powers of the Speaker of the House of the People.]

11. পার্লামেন্টের সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের একটি বিবরণী দাও।
[Give an account of the privileges of the members of the Parliament.]

12. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গঠন ও ক্রিয়াকলাপের একটি বিবরণী দাও।
[Give an account of the composition and functions of the West Bengal Legislative Assembly.]

13. রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধার উপর একটি টীকা লিখ।
[Write a note on the pivileges of the members of the State Legislature]

ষোড়শ অধ্যায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ভারতের বিচারবিভাগ
(Independence of Judiciary and the Indian Judiciary)

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary): বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় বিচার করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্যাদা বজায় রাখা। এইজন্য বিচারবিভাগকে সর্বদাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হয়। যদি বিচারবিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের মর্যাদা রক্ষা

দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই স্বৈরাচারের প্রশ্রয় না দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচারবিভাগকে ইহার কাজ করিতে হয়। বিচারবিভাগ হইতেছে শাসনতন্ত্রের সংরক্ষক। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। বিচারবিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্য ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে। যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার কতটা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখিতে পারিয়াছে এবং শাসনতন্ত্রে বর্ণিত জনগণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছে তাহার মূল্যায়ন করিবার অন্যতম উপায় হইল সেই দেশে বিচারবিভাগ কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তাহার মূল্যায়ন করা। কারণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

শাসন সংরক্ষণ

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির যদি কোনও সময়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিচার-বিভাগকে পক্ষপাতদুষ্ট হইলে চলিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারের বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার উপায়ঃ বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় নিম্নলিখিত উপায়ের সাহায্যে। **প্রথমতঃ**, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যে বিচারকগণ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন, তবে শাসনবিভাগ অথবা আইন-পরিষদ ইহাদের কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অথবা কর্মোন্নতির কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে বিচারপতি নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা খারাপ। কারণ, ইহাতে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না, তাঁহাদের দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবার আশংকা থাকে। যদি বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি যথাসম্ভব বিভিন্ন শর্ত হইতে মুক্ত রাখা হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন।

বিচারক নিয়োগ করার নীতি

বিচারকগণ নির্বাচিত হওয়া উচিত নহে

দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন অবস্থায়ই তাঁহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকদের কখনই অন্য কোনও কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। তবেই তাঁহারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন।

বিচারকদের অপসারণ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে

তৃতীয়তঃ, বিচারকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেশী দিতে হইবে যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং তাঁহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন।

বিচারকদের ভাতা বেশী হওয়া উচিত

চতুর্থতঃ, বিচারকগণ অবসর গ্রহণ করিলে অন্য চাকুরি পাইবেন এই জাতীয় প্রলোভন যাহাতে শাসনবিভাগ না দেখাইতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে বিচারকগণ নিজেদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এইজন্য বিচারকগণ যাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে অবসরকালীন পেন্সন পান সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অবসর গ্রহণের পর বিচারকদের চাকরি গ্রহণ করা উচিত নহে

সর্বশেষে, বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারেন, সেজন্য তাহাদিগকে শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। আমেরিকা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না।

বিচারকদের শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বদা মুক্ত রাখিতে হইবে

বিচারপতিদের যোগ্যতা (Qualifications of the Judges): বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কতিপয় যোগ্যতা থাকা চাই।

আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য

প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা উচিত যাহাতে তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হইতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধারণার বশবর্তী তাঁহারা না হন।

রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষতা

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাষ্যকার হিসাবে বিচারপতিগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের সর্বদাই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয়।

দলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court in India): ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আরও বারজন বিচারপতি আছেন; তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সহিত অথবা বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে এই বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন; তাঁহাদের ৬৫ বৎসর বয়সে কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে গেলে বিচারপতিকে (১) ভারতের নাগরিক হইতে হইবে; এবং একটি হাইকোর্টে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতি থাকিতে হইবে; অথবা (২) দশ বৎসরের জন্য কোন হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট হিসাবে

বিচারপতির যোগ্যতা

কাজ করিতে হইবে; অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে তাঁহাকে একজন উঁচুদরের আইনশাস্ত্র-বিশারদ হইতে হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ কোন হাইকোর্টের আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের মাসিক বেতন সাড়ে চার হাজার টাকা। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিচারপতি নিয়োগ করা যায়। যেমন, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন ট্রাইবুন্যালের বিচারকরূপে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি-গণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদি কখনও কখনও বিচারপতি শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন অথবা অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হন, তবে পার্লামেণ্টের প্রতি কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ (Impeach) করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

বিচারপতির অপসারণ

সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা এবং ক্ষমতা (Position and Powers of the Supreme Court): সুপ্রীম-কোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original powers), আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা (Appellate powers) এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা (Advisory powers) আছে। (১) ভারত সরকারের সহিত কোন অথবা কতিপয় রাজ্য সরকারের গোলযোগ হইলে, অথবা (২) কোন ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং একাধিক মূল রাজ্য একদিকে থাকিলে এবং অন্যান্য রাজ্য অপরদিকে থাকিলে অথবা (৩) বিভিন্ন মূল রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মূল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সব বিবাদের বিচার করিয়া থাকে।

মূল ক্ষমতার প্রয়োগ

বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বা এক রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসীদের বিবাদের বিচার সুপ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতার আওতায় পড়ে না।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রে আপীল হইতে পারে; যথা,—(১) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আপীল, (২) দেওয়ানী মামলার এবং (৩) ফৌজদারী মামলার আপীল। কোন মামলা সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট এমন কোনও মন্তব্য করে যে উহাতে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন নিহিত আছে, তবে

আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা

সেই মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যদি কোন দেওয়ানী মামলার বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা (অথবা, যে পরিমাণ টাকা এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা ধার্য করিবে) হয়, তবে সেই মামলা সম্বন্ধেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। যদি হাইকোর্ট কোনও মামলার রায় প্রদানকালে এমন কোন মন্তব্য করে যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির মধ্যে আইনের প্রশ্ন নিহিত আছে তবে সেই মামলার জন্য সুপ্রীম কোর্টের কাছে সেই সম্বন্ধে আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া অথবা মামলাটি নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কার্টে আপীল করা চলে। তাহা ছাড়া, যদি কোন ফৌজদারী মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট এমন কোন প্রমাণপত্র (Certificate) দেয় যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে আপীলযোগ্য, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

সুপ্রীম কোর্ট
শাসনতন্ত্রের রক্ষক

সুপ্রীম কোর্ট আমাদের শাসনতন্ত্রের রক্ষক; সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন বিষয়ের আইনগত অথবা শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারে। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কেরালা সরকারের শিক্ষাবিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাহিয়াছিলেন। সরকার যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করে, তবে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের বিচার দাবি করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনমত বন্দীকে আদালতে দেখা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া (Habeas Corpus), চরমাদেশ প্রদান করা (Mandamus), নিষেধ করা (Prohibition), অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করা (Quo Warranto) প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারেন; পার্লামেণ্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি শাসনতন্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের। ইহাকে আমরা "আইন-প্রণয়নের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" (Judicial Review of Legislation) বলিতে পারি।

আইনপ্রণয়নের
বিচারবিভাগীয়
সমীক্ষা

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভারতীয় পার্লামেণ্টের উপর কোন প্রাধান্য নাই। অনেকক্ষেত্রে আইনসভা প্রণীত-আইনের বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে এবং আইনসভাও সেই বিধান অনুযায়ী আইনের সংশোধন করিয়াছে।[২] কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ভারতের সুপ্রীম

কোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করিতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের পর আমরা প্রত্যেক রাজ্যে হাইকোর্ট (High Court) এবং অন্যান্য আদালত দেখিতে পাই।

রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ (High Court): রাজ্যের প্রধান আদালতের নাম হইতেছে হাইকোর্ট (High Court)। একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, ততজন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত হয়। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, এবং ৬২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করেন। শুধু অকর্মণ্যতা, অসদাচরণ অথবা শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে পার্লামেণ্টের মোট সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত অপসারণ প্রস্তাবের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। কাহাকেও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসর তাঁহাকে ভারতের বিচার-বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, অথবা অন্তত দশ বৎসর কোন হাইকোর্টে এড্‌ভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চার হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান। কোন কোন রাজ্যের হাইকোর্টগুলির, যেমন বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের, কিছু মূল ক্ষমতা (Original powers) আছে। এই ক্ষমতাবলে ইহারা রাজ্যের প্রধান দেওয়ানী আদালত। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দেশ, আদেশ অথবা কোন কিছুর কারণ দেখাইবার জন্য নোটিশ দিতে পারে। যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে, কোন মামলার সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা জড়িত, তবে সেই ধরনের মামলা ইহা নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট হইতেছে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে আপীল করা চলে। মূল এলাকায় ফৌজদারী মামলার বিচার সম্প্রতি বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। একমাত্র কলিকাতা হাইকোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। আদালত অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে হাইকোর্ট শাস্তি প্রদান করিতে পারে।

হাইকোর্টের গঠন

হাইকোর্টের ক্ষমতা

রাজ্যের হাইকোর্ট ভারতের সু-সম্বদ্ধ বিচার-ব্যবস্থার (integrated judicial system) একটি অঙ্গ; শাসনতন্ত্রের ২২০নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালত কিংবা কর্তৃপক্ষের সামনে ওকালতি করিতে পারিবেন না।

সংবিধান-সম্মত মৌলিক অধিকার কার্যকর করিবার জন্য এবং যে-কোন উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ, আদেশ, অথবা পরোয়ানা (writ) জারি করিতে পারে। রাজ্যের হাইকোর্ট একটি অভিলেখ আদালত (court of record) হিসাবেও কাজ করে।

অন্যান্য আদালত (Other Courts): দেওয়ানী আদালত হিসাবে হাইকোর্টের অধীনে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন জিলা-শহরে জর্জ-কোর্ট, ইহার নীচে প্রতি মহকুমায় অথবা কোন কোন জিলা-শহরে মুন্সেফ কোর্ট থাকে। এমন কি বর্ধিষ্ণু গ্রাম অথবা যেখানে থানা আছে, এই রকম স্থানেও মুন্সেফ-আদালত দেখা যায়। বড় বড় শহরে ছোট ছোট মামলার জন্য ছোট আদালতও (Small Causes Court) দেখিতে পাওয়া যায়। জজকোর্ট-গুলিতে মূল এবং আপীল সংক্রান্ত বিচার উভয়ই হয়। অনুরূপভাবে ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই হাইকোর্টের পর প্রতি জিলায় দায়রা জজ এবং ইহার পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। ইহার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত হইল গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতগুলি। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের হাইকোর্টসমূহ জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচার করে।

অন্যান্য আদালত

Exercise

1. 'স্বাধীন বিচার-বিভাগ' বলিতে তুমি কি বুঝ? বিচার-বিভাগের স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন কেন? বিচারকদের যোগ্যতা কি হওয়া উচিত?

[What do you understand by the term "Independence of Judiciary"? Why is it necessary that the Judiciary should be independent? What should be the qualifications of the judges?]

2. ভারতের বিচার-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

[Give a brief outline of the Judicial System of India.]

3. ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন এবং বিভিন্ন কাজের আলোচনা কর।

[Discuss the composition and the functions of the Supreme Court of India.]

সপ্তদশ অধ্যায়

আমলাতন্ত্র
(Bureaucracy)

ব্যুরোক্রেসী (Bureaucracy) কথাটি আসিয়াছে ব্যুরো (Bureau) হইতে। ব্যুরো বলিতে বুঝায় কোন একটি বিশেষ পদ; সুতরাং ব্যুরোক্রেসী বলিতে বুঝায় আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার। এইজন্য বর্তমানে ব্যুরোক্রেসী বলিতে বুঝায় আমলাতন্ত্র। অধ্যাপক লাস্কির মতে আমলাতন্ত্র কথাটি এমন একটি সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যাহার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্মচারী বা আমলাদের হাতে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত যে তাহা সাধারণ নাগরিকদের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে। সরকারী আমলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন।[১] সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিগণ সরকারের নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করা এবং ইহা বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব হইতেছে সরকারী আমলাদের। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও সরকারের দৈনন্দিন কাজ প্রকৃতপক্ষে আমলাগণই নির্বাহ করিয়া থাকেন। বর্তমানে সরকারী প্রশাসনে জটিলতা এত বাড়িয়াছে এবং সরকারের কাজের পরিমাণ এত বাড়িয়াছে যে, দেশের প্রশাসনে সবকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব (Importance of Bureaucracy) : বর্তমানকালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে সরকারী আমলা অথবা সরকারী কর্মচারীদের উপরই বর্তমানকালের যে-কোন রাষ্ট্রের শাসন-সংগঠন ভিত্তিশীল। লাওয়েলের (Lowell) "Government of England" গ্রন্থে আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসীর ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুত্ব

দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন এত জটিল হইয়াছে যে উপযুক্ত সেক্রেটারীদের সাহায্য ছাড়া কোন দেশের সরকারের পক্ষে অথবা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শাসন কাজ চালান সম্ভবপর নয়।

১। "Bureaucracy is a term usually applied to a system of government, the control of which is so completely in the hands of the officials that their power jeopardises the liberties of the ordinary citizens."

H. J. Laski—Article in the "Encyclopaedia of the Social Sciences."

প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকারের কাজ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলে সরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে সরকারী আমলাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ভারতে কেন্দ্র-শাসিত এলাকায়ও সরকারী কর্মচারিগণের উপরেই প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন আর সচিবদের (Secretaries) সাহায্য ছাড়া কাজ চালান সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় হয়ত এমন একজন ব্যক্তি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রী হইলেন যিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অথবা সরকারের আয়-ব্যয় নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নহেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে কোন অসুবিধা হয় না, যেহেতু তিনি উপযুক্ত সচিবদের সাহায্যেই তাঁহার দপ্তরের কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন। Finer-এর ভাষায় "In a Parliamentary democracy the minister must of necessity be a paramount amateur, and the civil servant a permanent expert." যাঁহারা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তাঁহারা যে নিজ নিজ দপ্তরের কাজেও অভিজ্ঞ হইবেন এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই ফাঁকটুকু পূরণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারী কর্মচারিদের। দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনার সহিত মন্ত্রিদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার এবং দেশের সমস্যাগুলির একটি সঠিক চিত্র সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিবার মুখ্য দায়িত্ব হইতেছে সরকারী কর্মচারিদের; আবার রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজ সরকারী কর্মচারিদের সম্পন্ন করিতে হয়। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্বের আড়ালে সরকারী আমলাগণ দৈনন্দিন প্রশাসনের খুঁটিনাটি কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ীই তাঁহাদের কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকবর্গের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য সেই বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নতা থাকা প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীদের সেজন্য এই সম্পর্কেও গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সর্বস্তরের নাগরিকগণের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা এবং আইনকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারিদের।[২]

২। "They translate law into action from one end of the country to the other and bring the rank and file of the citizenry into daily contact with the Government"

সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করার নিয়ম (Methods of Employing Public Servants) ঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competitive Examinations) মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদের মধ্য হইতে পরীক্ষার ফল, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারিদের জন্য লোক বাছাই করা হয়। সেইজন্য আধুনিককালে ভাল ভাল ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী পাইবার সুযোগ লাভ করে। আধুনিক-কালে এই বাছাইয়ের মারফৎ কর্মচারী নিয়োগ করা হয় বলিয়া সরকারী কর্মচারিদের দক্ষতা বাড়িতেছে এবং শাসনব্যবস্থারও উৎকর্ষ বাড়িতেছে। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইলেও সরকারী কর্মচারিদের কাজ সর্বদাই বজায় থাকে। যে সংস্থার মাধ্যমে সবকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন বলে।

সরকারী কর্মচারিদের যোগ্যতা (Qualifications of Public Servants) ঃ (১) সরকারী কর্মচারিদের সুশিক্ষিত হইতে হইবে। (২) সমুদয় রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদের মুক্ত থাকিতে হইবে। (৩) তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না। আইনসভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হইলে তাঁহাদের সরকারী কাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। (৪) সরকারী কাজ করিবার সময় তাঁহাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন সরকারী নীতিকে কার্যকর করিতে হইবে। তবে সরকারী নীতির জন্য তাঁহাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না, সেই দায়িত্ব থাকিবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার। (৫) সরকারী কাজের জন্য যে মাহিনা পান তাহা ছাড়া অন্য কোনভাবে আয়ের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। (৬) সরকারী কর্মচারীকে সবরকমের দুর্নীতি ও অসাধুতা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। (৭) সরকারী কাজকর্মের যাবতীয় তথ্য তাঁহাদের গোপন রাখিতে হইবে। সরকারী কর্মচারিগণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতনামা থাকিতে হয়।

সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা

সরকারী আমলা বা কর্মচারিদের ক্ষমতা ও কাজ (Powers and Functions of the Public Servants) ঃ আমলাতন্ত্র অথবা সরকারী কর্মচারিদের ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত। একটি হইতেছে, মন্ত্রিসভার পিছনে আড়াল হইতে আমলাগণ কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন, এবং অপরটি হইতেছে, সরকারীভাবে তাঁহাদের কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে যিনি যে বিভাগে বিশেষ কাজে পারদর্শী, তাঁহার পরামর্শ এবং সাহায্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী সর্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপরদিকে

দেশের আইন সরকারী প্রশাসকদের কিছু ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ আয়কর বিভাগের উচ্চপদস্থ আমলা অথবা সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন সচিব অথবা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকারী কর্মচারিদের মুখ্য কাজ হইতেছে দৈনন্দিন শাসনকাজ পরিচালনা করা। এই ব্যাপারে মন্ত্রিদের দায়িত্ব আছে; কিন্তু প্রকৃত করণীয় যাহা কিছু আছে, তাহা সরকারী কর্মচারিদেরই সম্পন্ন করিতে হয়।

দৈনন্দিন শাসনকাজ পরিচালনা করা

শাসন পরিচালনায় সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রথম পর্যায়ে সরকারী কর্মচারিগণই করিয়া থাকেন; পরে ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শাসনতন্ত্র, দেশের প্রচলিত আইন এবং সরকার পক্ষের সাধারণ নীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী কর্মচারিগণ দৈনন্দিন শাসনকাজ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সরকারী কর্মচারিদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে দেশের শাসনকাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবে মন্ত্রিদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটি মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর অপর মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা একটি সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে দেশের শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারিগণই গ্রহণ করেন।

শাসনকাজে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা

শাসনকাজে বিশেষীকরণ (specialisation) করিবার দায়িত্বও সরকারী কর্মচারিদের, এবং তাঁহারা এই দায়িত্ব নির্বাহ করিয়া থাকেন নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে। দেশের শাসনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই জটিলতার মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে বিভাগীয় দপ্তরগুলির কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। তাহা সম্ভবপর হয় সরকারী কর্মচারিদের সাহায্যে।

শাসনকাজের বিশেষীকরণ করা

সরকারী কর্মচারিদের প্রাপ্ত সুবিধা (Benefits derived by Public Servants)**:** সরকারী কর্মচারিগণ নিজেদের কাজের জন্য ভাল মাহিনা পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে সরকার হইতে তাঁহারা পেন্সন ও অন্যান্য ভাতা পাইয়া থাকেন। অতি গুরুতর দোষ না করিলে এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে কোন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা যায় না।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজ যতই বাড়িতেছে, সরকারী কর্মচারীর

সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। এইভাবে তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতের আমলাতন্ত্র (Bureaucracy in India) **:** সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠন করাই ভারতের আদর্শ। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের (Welfare state) সমুদয় নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য রাষ্ট্রকৃত্যককে সুসংগঠিত এবং সুসংহত করা প্রয়োজন। এইজন্য সরকারী কর্মচারিদেরও উপযুক্তভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দরকার। সরকারী কর্মচারিদের সম্পর্কে যে সকল বিধান ভাবতীয় শাসনতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ভিত্তিশীল। ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Services) এবং রাজ্যকৃত্যক (State Services)। *Indian Foreign Service, Indian Railway Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Income-Tax Service, Indian Postal Service* প্রভৃতি হইতেছে কেন্দ্রীয় কৃত্যক। যদিও রাষ্ট্রকৃত্যককে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তবুও কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যকের (All India Services) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। *Indian Administrative Service* এবং *Indian Police Service* শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যক হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও সিভিল সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই এই দুই ধরনের কৃত্যকের প্রয়োজন আছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১২ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, যদি রাজ্যসভায় উপস্থিত এবং ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ এমন কোন প্রস্তাব সমর্থন করেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক প্রবর্তন করা দরকার, তবে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষে প্রযোজ্য এরূপ এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যকের সৃষ্টি করিতে পারে। দেশের শাসনব্যবস্থায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেখানে সর্বভারতীয় কৃত্যকের প্রয়োজন।[৩]

সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ, সেই সমস্ত কর্মচারী

৩। এই প্রসঙ্গে ডক্টর আম্বেদকর বলেন, "The Constitution provides that without deprivin the States of their rights to form their own civil services there shall be an all-Indi service recruited on all-India basis common qualifications, with uniform scale o pay, and members of which alone can be appointed to the strategic posts throughou the Union."

আছেন যাঁহাদের চাকুরীর শর্ত, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত (যেমন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, ইলেকসন কমিশনার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্যবৃন্দ ইত্যাদি)। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সমস্ত কর্মচারী আছেন যাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালের খুশীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, ইহার অর্থ এই নয় যে, যে-কোন সময়েই তাঁহাদের চাকুরী চলিয়া যাইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণ করা চলে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মচারিগণকেও যথেচ্ছভাবে অপসারণ করা যায় না। যে কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্মচারীকে নিয়োগ করেন, তাহার নিম্নপদস্থ কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরকারী কর্মচারী পদচ্যুত হইতে পারেন না (সংবিধানের ৩১১ (১) নং ধারা)। তাহা ছাড়া, যে সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হইবে অথবা যাহার পদমর্যাদা হ্রাস করা হইবে, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে ইহার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ (reasonable opportunity) দিতে হইবে। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে প্রথম পর্যায়ে ইহা লইয়া অনুসন্ধান (enquiry) করা হইবে; সেই সময়ে সরকারী কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইয়া থাকেন। অনুসন্ধান শেষ হইয়া যাইবার পর অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুপারিশ প্রদান করেন এবং সরকার যদি সেই পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াসী হন, তবে সরকারী কর্মচারীকে সেই শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে।[৪]

সরকারী কর্মচারিদের অপসারণের ব্যবস্থা এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

অবশ্য ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পাইলে কোন কর্মচারীকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যায়। তবে যদি সরকার মনে করেন যে জনস্বার্থের খাতিরে অথবা দেশের নিরাপত্তার খাতিরে সরকারী কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিগণ শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন না। এইরূপ সুযোগ দেওয়া যায় কি না সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ; আদালতের এই বিষয়ে প্রশ্ন

৪। High Commissioner vs. Lal (1948)
John vs. State of Travankore & Cochin (1955)

করার কোন এক্তিয়ার নাই।[৫] আমরা এই ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলিতে পারি যে সরকারী কর্মচারিদের রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের দ্বারা পদচ্যুত করাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ মন্ত্রিদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু, এই ধরনের পদচ্যুতি ঘটাইবার পূর্বে একটি বিচার-বিভাগীয় অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Union Public Service Commission of India) **:** সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে দক্ষতা ও সততার সহিত কাজ করিতে পরেন, তাহার জন্য তাঁহাদের স্বার্থসংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই স্বার্থসংরক্ষণ করিতে হইলে তাঁহাদের নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্ব সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের হাতে রাখা কর্তব্য। ভারতের পাবলিক সার্ভিস কমিশন এইরূপ একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

কমিশনের গঠন ও সভ্যগণের যোগ্যতা

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে গঠিত ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের সদস্য কতজন থাকিবেন বা তাঁহাদের চাকুরীর শর্ত কী হইবে তাহা নিরূপণ করেন রাষ্ট্রপতি। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের কাজের মেয়াদ ছয় বৎসর। তবে উক্ত ছয় বৎসরের পূর্বেই কোন সদস্যের ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বাকী অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উপাচার্য বা অনুরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে লওয়া হয়। অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি অন্য কোন সরকারী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। কমিশনের অন্যান্য সভ্যগণ সভাপতির পদে উন্নীত হইতে অথবা রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগ দিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোন সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারেন না।

সদস্যগণের অপসারণ পদ্ধতি

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি অথবা সদস্যগণ যদি কমিশনের সদস্য থাকাকালে অন্য কোন বেতনভুক চাকুরী গ্রহণ করেন, অথবা যদি কেহ দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন, অথবা যদি মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতাহেতু কেহ সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকার অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, অথবা যদি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরিত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে

৫। সংবিধানের ৩১১(৩) নং ধারা।

অসদাচরণের অভিযোগ অনুসন্ধানের পর উহা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সমর্থিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সেই সদস্যকে পদচ্যুত বা অপসারিত করিতে পারেন।

সদস্যগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা

সদস্যগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাঁহাদের বেতন ইত্যাদি লইয়া সংসদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। ইহা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (charged on the Consolidated Fund of India)। আবার তাঁহাদের নিয়োগের পর স্বার্থের হানি করিয়া তাঁহাদের পদের শর্তাদির পরিবর্তন করা যায় না। সদস্যগণের বেতন ইত্যাদি লইয়া সংসদে কোনরূপ ভোটের ব্যবস্থা না রাখা, তাঁহাদের অপসারণ ব্যবস্থা অনায়াসসাধ্য না করা এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁহাদিগকে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া প্রভৃতি স্পষ্টই সূচিত করে যে কমিশন সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার বিষয়টির উপর গণপরিষদে এইচ্. ভি. কামাথ (H. V. Kamath) জোরালো বক্তৃতা করেন।[৬]

কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা

শাসনতন্ত্রের ৩২০ নম্বর ধারায় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন কাজ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কমিশনের প্রথম কাজ হইতেছে (১) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মৌখিকভাবে যাচাই করিয়া এবং অধস্তন কর্মচারিদের উর্ধ্বতন পদে উন্নীত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শূন্য পদগুলিতে উপযুক্ত কর্মচারি নিয়োগ করা এবং (২) কর্মচারি নিয়োগের নীতি এবং পদ্ধতি স্থির করা, সরকারী কর্মচারিদের বদ্‌লি অথবা উন্নত পদে বহাল করা, প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ প্রদান করা। (৩) সরকারী কাজে শৃংখলা বজায় রাখা সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মচারির যদি চাকুরীর শর্ত অনুযায়ী কোন আর্থিক ক্ষতি হয় তাহার প্রতিকার করা অথবা ক্ষতিপূরণ করা, কোন সরকারী কর্মচারির বিরুদ্ধে সরকারী কাজের আইনভঙ্গজনিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ইহার পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিদের স্বার্থ বজায় রাখা প্রভৃতি

৬। "It is imperative that whichever Government comes into power the permanent services should carry out the policy laid down by the Government for the time being in office......It is, therefore of the utmost importance that the Public Service Commissions that we contemplate under these Articles should be completely independent of the Government of the day whether at the Centre or in the States."

— H. V. Kamath.

কাজের দায়িত্ব ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর অর্পিত হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ করিতে পারে। (৪) শাসনতন্ত্রের ৩২১ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনীয় আইনের সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারিদের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দিতে পারে। (৫) শুধু শাসনসংক্রান্ত কাজের (Civil Services) ক্ষেত্রেই নহে, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে (Defence Ministry) প্রতিরক্ষা কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। (৬) সরকারী কর্মচারিদের চাকুরীর শর্ত অথবা বয়ঃক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠিলে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত চাহিয়া পাঠান হয়। (৭) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারি নিয়োগের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহার পাঠ্যসূচী পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করে।

রাষ্ট্রপতি কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ নির্দেশ দান করিতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোন কোন চাকুরী সম্পর্কে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ প্রয়োজন হইবে না। তবে ঐ বিষয়ের নিয়মকানুনকে পূর্বেই পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইয়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক গ্রহণ করাইতে হয়।

কমিশনের ক্রিয়াকলাপের বিবরণী প্রদান

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে প্রতিবৎসর ইহার ক্রিয়াকলাপের একটি বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি সেই বিবরণী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে উপস্থিত করেন। যদি কোনও ব্যাপারে সরকার ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন, তবে সরকারকে ইহার কারণ দেখাইয়া একটি লিপি (memorandum) পার্লামেণ্টে দাখিল করিতে হয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপকারিতা

গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বজায় রাখার বিরাট উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, এই কমিশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রকৃতই উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। সরকারী কর্মচারিদের নিয়োগ করিবার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ইহার মাধ্যমে প্রকৃতই মেধাবী ছাত্রদের সরকারী কাজে নিযুক্ত

হইবার সুযোগ থাকে। কোনও প্রকার দুর্নীতি অথবা আত্মীয়তোষণের প্রশ্ন ইহাতে উঠে না। ইহার ফলে আমেরিকার ন্যায় "Spoils System"-এর দোষ হইতে ভারত অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কর্মচারিগণও বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য, এবং চাকুরীর শর্ত সরকার ঠিকভাবে প্রতিপালিত করিতেছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ আছে। তৃতীয়তঃ, সরকারী কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ভার এবং তাঁহাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখিবার ভার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত হওয়ায় সরকার একটি গুরু দায়িত্বের বোঝা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। সর্বশেষে, সরকারের কাজে সুউচ্চ ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের মেধা, কর্মপ্রতিভা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সুপ্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন এবং শিক্ষাবিভাগে সুউচ্চ ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের যোগ্যতা দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন বলিয়া সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা সম্ভব হয়।

তবে কমিশনের ভূমিকা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহার কাজ কেবল সুপারিশ করা। উহা গ্রহণ করা অথবা না করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সরকারের। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়াছেন যে কমিশনের সহিত পরামর্শ করার অর্থ ইহা নয় যে কমিশনের সুপারিশ মানিতে সরকার বাধ্য। এ বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। তবে এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে সরকার কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার কারণ পার্লামেণ্টের সদস্যদের জানাইতে হয়, এবং অন্যায়ভাবে সুপারিশকে অগ্রাহ্য করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত জনমত সুসংগঠিত করা চলে। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কোন কোন নিয়োগ কমিশনের পরামর্শ ছাড়াই কার্যকর করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সরকারের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়তঃ, কমিশনের রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করার কোন নির্দিষ্ট সময় স্থির করা হয় নাই। সুতরাং কমিশনের রিপোর্ট আইনসভায় বিলম্ব করিয়া পেশ করিয়াও ইহাকে অনেক সময় মূল্যহীন করা হয়। সেইজন্য মনে হয়, এই রকম রিপোর্ট প্রদান করার একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া সংবিধানে এই মর্মে একটি ধারা লিপিবদ্ধ করা উচিত। সর্বশেষে, বহুক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ সরকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং নিয়োগ ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে বিষয়ে সুপারিশ চাওয়া হয় সেই ব্যাপারে সুপারিশ যাহাতে সরকার অগ্রাহ্য না করিতে পারেন সেইজন্য উক্ত মর্মে সংবিধানে একটি উপযুক্ত ধারাও সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা

রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন (State Public Service Commission)**ঃ** কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সম্পর্ক, রাজ্য সরকারের সঙ্গেও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেই সম্পর্ক। যে নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন, সেই ভিত্তিতেই রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণও নির্বাচিত হন। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণেরও কাজের মেয়াদ ছয় বৎসর, তবে ৬০ বৎসর বয়স ইতিমধ্যেই হইলে সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের নিয়োগ অথবা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই, রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের নিয়োগ অথবা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেই ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন; কমিশনের অন্ততঃ অর্ধেক সদস্যের পূর্বে সরকারী কাজে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবার জন্য রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক যাচাই অথবা প্রত্যক্ষভাবে অধস্তন পদ হইতে উর্ধ্বতন পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, চাকুরির শর্তাদি ঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত ব্যবস্থাবলম্বন প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেওয়াও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম কাজ।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে উপযোগিতা আমরা দেখিয়াছি রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও অনুরূপ উপযোগিতা আছে।

Exercise

1. ভারতে সরকারী কর্মচারিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[Discuss the qualifications of public servants in India.]

2. ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

[Discuss the composition and functions of the Union Public Service Commission of India.]

3. ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[Examine critically the utility of Union Public Service Commission of India.]

4. সরকারী কর্মচারিদের কাজ কি? তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[What are the functions of Civil Servants in India? How are the members of the Civil Service recruited?]

5. রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের উপর একটি টীকা লিখ।

[Write a note on State Public Service Commission.]

সপ্তদশ অধ্যায়

জনমত
(Public Opinion)

'জনমত' কথাটির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোমান যুগে "Consensus Populi" কথাটি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যবহার করা হইত। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশো সর্বপ্রথম জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হয়। জনমতের এই অবিরত ক্রিয়াকলাপই হইতেছে গণতন্ত্রের গতিশীলতার ইঙ্গিত। ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, "This incessant activity of popular opinion is the dynamic of democracy."[১]

জনমতের স্বরূপ (Nature of Public Opinion) **: অনেক সময়** বলা হয় জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণেরও নহে, এবং ইহা একটি প্রকৃত মতও নহে। (…"It is neither *public* nor *opinion.*") সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মাত্রেই জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবে এমন কোন কথা নাই। লোয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য কোন অভিমত সমাজের সকলেরই ঐক্যমত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও জনমতের জন্য যথেষ্ট নয়, কিংবা সকলের ঐক্যমতও যথেষ্ট নয় (·"a majority is not enough and unanimity is not required)"।

জনমত বলিতে সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না।

সংখ্যা অপেক্ষা বিশ্বাসের দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের কোন প্রকাশ কখনই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাপ করে না।[২] ইহার অর্থ এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কখনই জনমত বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে দৃঢ় আস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহা জনমত বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে যদি দৃঢ় আস্থার অভাব দেখা যায় তবে ইহা জনমত বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং জনমত গঠনের জন্য

জনমত গঠনে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

১। Mac Iver—The Ramparts we guard (Sp. Ed. 1963) P. 28.

২। "Public opinion is not strictly the numerical majority, and no form of its expression measures the mere majority, for individual views are always to some extent weighed as well as counted."—Lowell.

যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহা হইতেছে ইহার বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হওয়া এবং নিবিড়ভাবে গৃহীত হওয়া।[৩]

আবার অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের নেতৃবৃন্দ কতিপয় অভিমত পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাধারণও হয়ত সেই সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকে না। সেইদিক হইতে চিন্তা করিলে এই মত প্রকৃতপক্ষে জনমত নহে। যাহাকে আমরা মতামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কতিপয় বিশ্বাস অথবা ধারণা মাত্র। জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন নেতা গঠন করেন, তারপর ইহা দেশের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। যদি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতের সারমর্ম বুঝিয়া ইহা গ্রহণ করে এবং ইহা কার্যকর করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই আমরা ইহাকে জনমত বলিতে পারি। লিপম্যানের (Lippman) ভাষায় "The symbolism of public opinion usually bears the mark of balancing of interests."।[৪] জনমতের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে জননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার উপর। সরকারের জন্য কার্যকর জনমত বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় মত যাহা সুসংগঠিত এবং যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। কতজন লোক এই মত গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই মতের গভীরতা কত বেশী তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৫]

জনমতের স্বরূপ

ফাইনারের (Finer) মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লইয়া জনমত গঠিত।[৬]—(১) ঘটনা বা তথ্যাদি (perception of the facts), (২) তথ্যাদির মূল্যায়ন এবং ইহার ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা গঠন (logical inferences from the facts) এবং (৩) সেই ধারণার নৈতিক ব্যাখ্যা (moral interpretation of those inferences)। বিভিন্ন তথ্যের সম্যকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ এবং জনসাধারণ কতৃক ইহার নৈতিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার উপর জনমত বহুলাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য দরকার একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা।

ফাইনারের মতে তিনটি বিষয় লইয়া জনমত গঠিত

৩। "Public opinion is a composite of numbers and intensity."
—Munro and Ozanne.

৪। Lippman—Public Opinion.

৫। "The intensity of an opinion is often of more importance than the number of persons who compose it."—Gettell.

৬। "Public opinion is compounded of perception of the facts, logical inferences from them and moral interpretation of them."—Finer

জনমতের কার্যকারিতার শর্ত (Conditions of effectiveness of Public Opinion) **:** জনমতের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সুসংহত জনমত

প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। জনমতের সচেতনতা নির্ভর করে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের উপর। জনসাধারণের নিজের মধ্যে সর্বদা ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে, এবং বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মতৈক্য বজায় রাখিতে হইবে ; তবেই জনমত সুষ্ঠুভাবে নিজেকে কার্যকর করিতে পারে। জনসাধারণের চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ। এই সতর্কতা বিশেষ রূপ পায় কার্যকর জনমতের মধ্যে। জনমতের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণেরই রাজনৈতিক চেতনার উপর। সরকারে ক্ষমতাসীন দল অথবা ব্যক্তি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে সেদিকে জনসাধারণকেই সতর্ক থাকিতে হইবে।

বিভিন্ন স্বার্থের সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। শ্রেণীগত, ধর্মগত এবং জাতিগত বিরোধ অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। জনমতকে কার্যকর এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ধর্মগত, শ্রেণীগত, জাতিগত অথবা অন্যান্য সর্বপ্রকার বিরোধ ভুলিয়া সকলকেই সহনশীল হইতে হইবে। যখন জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে, তখনই জনমত বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়।

সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মতৈক্য

তৃতীয়তঃ, সরকার কী ধরনের হওয়া উচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মতৈক্য থাকা উচিত। সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যদি জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য না থাকে, তবে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ইহা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়। সেক্ষেত্রে জনমতের কার্যকারিতা কমিয়া যায়।

সংখ্যালঘিষ্ঠের মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা না

থাকিলে জনমত কখনই গঠিত হইতে পারে না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজের মতামত প্রকাশে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সেই মতের যাহারা বিরোধী, তাহাদেরও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবেই জনমত কার্যকর হয়।

পঞ্চমতঃ, অধিকাংশের যাহা ইচ্ছা তাহা যতদিন জনমত তীব্র থাকে ততদিন সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও মানিয়া লওয়া উচিত। আবার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠগণ কর্তৃক অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতও জনমতেরই একটি অংশ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা

ষষ্ঠতঃ, জনমত কার্যকর করার একটি বিশেষ শর্ত হইতেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা। সংবাদপত্রও যদি সরকারের কিংবা কোন দল বিশেষের কুক্ষিগত হয়, তবে ইহা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনমতকে ভ্রান্তপথে চালিত করিতে পারে। অপর পক্ষে সংবাদপত্র যত নির্ভুল এবং পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রকাশ করিবে, জনমতও তত সুস্থ এবং সবল হইয়া উঠিবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা থাকে। সেজন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে জনমতও স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সুস্থ এবং সবল জনমত গঠনের আরেকটি শর্ত হইতেছে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং জনসাধারণের চিন্তাধারা যাহাতে স্বচ্ছ হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা—যদি জনসাধারণ সুশিক্ষিত না থাকে, তবে স্বৈরাচারী নেতার পক্ষে অথবা স্বার্থান্বেষী নেতা কিংবা রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। যাহাতে কোন সরকার জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত না করিতে পারে সেজন্য জনমত সর্বদা শিক্ষিত থাকা চাই এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত কার্যকর জনমতে শিক্ষার ভূমিকা প্রতিভাত হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়া চাই

সপ্তমতঃ, সমাজে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে, অর্থাৎ, যদি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সমান সুযোগ না পায়, তবে জনসাধারণ বিভিন্ন সুবিধায় কোন-না-কোন দলীয় স্বার্থের সহিত নিজেদের জড়িত করে এবং ইহাতে সুস্থ জনমত গঠিত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্য

সর্বশেষে, সুস্থ ও সুসংগঠিত জনমত গঠনের আরও একটি শর্ত হইল বিভিন্ন

সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য হওয়া। জনমত যাহাতে কোন কায়েমী স্বার্থের ফাঁদে না পড়ে সেইদিকে জনগণকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। সদাসচেতনতা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের সাধারণ স্বার্থগুলির ক্ষেত্রে মতৈক্য সুস্থ ও সবল জনমত গঠনের অন্যতম শর্ত।

জনগণের মধ্যে ঐক্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় ধনতন্ত্রের আদর্শে; অনুরূপভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে। সমাজতন্ত্রে সরকার সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া জনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উপরোক্ত সংস্থাগুলি ধনীশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং জনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। জনমত স্বাধীন ভাবে গঠিত হইবার প্রধান শর্ত হইতেছে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস (Agencies for the creation and expression of Public Opini(n) ঃ ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ স্যার রবার্ট পীলের মতে জনমত হইতেছে "ভ্রান্তি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, গোঁড়ামি ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির একটি বিরাট সমন্বয়।"[৭]

জনমত প্রকাশ এবং গঠনের প্রধান উৎসগুলি হইতেছে (১) মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র, (২) বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, (৩) রাজনৈতিক দল, (৪) সভাসমিতি, (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং (৬) আইনসভা।

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং ইহাকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংবাদপত্রগুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ সরবরাহ এবং সরকারী কাজের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুব বেশী। সংবাদপত্রগুলি যদি বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকে, তবে জনমত ভ্রান্তপথে চালিত হয়। কিন্তু যদি সংবাদপত্রগুলি অবিকৃতভাবে নিষ্ঠার সহিত

সংবাদপত্রের গুরুত্ব

৭। "...the great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper propaganda." Quoted in Lippman's Public Opinion.

সত্য এবং নির্ভুল সংবাদ প্রকাশ করে তবে সুস্থ ও সরল জনমত গঠিত হইবার পথ সুগম হয় এবং ইহাতে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবাদপত্রগুলি যথাক্রমে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রচার করে। সুস্থ এবং শক্তিশালী জনমত গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

বেতার ও চলচ্চিত্র

সংবাদপত্রের পর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রগুলির যেমন নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা উচিত, বেতারে এবং টেলিভিশনে সেই-প্রকার নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার বক্তৃতার মারফৎ জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। বর্তমান সমাজে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব খুবই বেশি এবং ইহা গভীরভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রের দুইটি দিক, একটি শিল্পগত এবং অপরটি ব্যবসায়গত। শিল্পের দিক হইতে চিন্তা করিলে মানবিক আবেদন সম্পন্ন চলচ্চিত্র মানুষের শিল্প মানকে উন্নত করে। ব্যবসায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলেও চলচ্চিত্র মানুষের সমাজজীবনের আশা-আকাংখা, দুঃখ এবং উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ইহা জনমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রের আর একটি দিক আছে, তাহা হইতেছে ইহার শিক্ষার দিক। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র জনমতকে সুশিক্ষিত করে। সরকারের দিক হইতে যে তথ্যমূলক দলিল-চিত্রগুলি তৈয়ারী হয় তাহাও জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক দল

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়িক পত্র, বই, প্রচার পত্র প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়া নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় জনমতের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিই নানাভাবে জনমত গঠন করিয়া থাকে।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত খুবই প্রভাবিত হয়। মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার অন্যতম মাধ্যম হইতেছে সভাসমিতি।

সেইজন্য সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখনই কোন দেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে তখনই বিপ্লবী নেতাগণ সভাসমিতির মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির সবদিক বুঝিতে পারে না। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সভাসমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সহিত পরিচালিত হইবার এবং তাহাদের সহিত ভাব-বিনিময় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া অথবা শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝাইয়া জনমতকে গঠিত এবং শিক্ষিত করেন। আগামী দিনের নাগরিকদের তৈয়ার করিবার দায়িত্ব হইতেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শুধু সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতিক শিক্ষা অথবা কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই প্রদান করে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিতও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিচিত হয়, এবং ইহা জনমত গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রজীবনেই নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেওয়া হয় গণতন্ত্রের শিক্ষা; জনমতও সেইভাবে প্রভাবিত হয়।

সভাসমিতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব (Role of Public Opinion in a Modern Democratic Society): গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর। আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাঁহারা আইন-পরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের সদস্যগণও মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। জনমত যদি সর্বদা সচেতন না থাকে, তবে আইন পরিষদের সদস্যগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে। সেইক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পক্ষে

মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থায় সচেতন জনমতের প্রয়োজনীয়তা

স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য জনমত সর্বদাই সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়, তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে, যেমন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং সুদৃঢ় জনমত। কিন্তু, জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাস্কির মতে সদাসচেতনতাই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য ("Eternal vigilance is the price of liberty")। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের অধিকার বা স্বাধীনতা যাহাতে মোটেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইদিকে জনগণের নিজেদেরই খেয়াল রাখা উচিত। শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের কয়েকটি অন্যায়মূলক ক্রিয়াকলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে না, তখনই তাহারা কোন অন্যায় কাজ করা হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইন-পরিষদের সদস্যগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে পারেন। কোন একটা মত বা আদর্শকে আঁকড়াইয়া না ধরিয়া বর্তমানকালের আইনসভা জনমতের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া নিজেদের মতের পরিবর্তন করে।[৮] শিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। জনমতকে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া শাসকশ্রেণীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং জনস্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয়। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেইভাবে বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত জনমতের উপর

৮। জনমতের দ্বারা বর্তমানকালের আইনসভা কতটা প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ধে বার্কার (Barker বলেন, "Today we know that public opinion is always moving; and we believe that it is moving onward, and we conceive the law along its course. We divide representative legislatures to mediate between public opinion and law and acting as the organs and exponents of the former, to modify the latter accordingly." (Barker—Greek Political Theory,—Plato and his Predecessors. P. 44).

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী জনমতকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতও যথেষ্ট সচেতন থাকে।

রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উপর। রাষ্ট্রশক্তি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে, সেইজন্য জনসাধারণকে যাহাতে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। জনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহা নির্ভর করে জনমতের কার্যকারিতার উপর। জনমত হইতেছে গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ; গণতন্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর, জনমতের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ পায়; ইহা মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। সুস্থ ও সুসংগঠিত জনমত স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। জনমতের চাপে সরকারকেও অনেকক্ষেত্রে ইহার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের বাক-স্বাধীনতা থাকে বলিয়া জনমতের কার্যকারিতা অনেক বেশী হয়, এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুস্থ ও সবল জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

জনমতের শক্তি

Exercise

1. জনমতের স্বরূপ আলোচনা কর। জনমত গঠন এবং প্রকাশের বিভিন্ন উৎস কি কি?

[Discuss the nature of Public Opinion. What are the agencies for the creation and expression of Public Opinion?]

2. জনগণশাসিত সরকারে জনমতের স্বরূপ এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the nature and importance of Public Opinion in a popular Government.]

3. জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর এবং জনগণশাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব দেখাও।

[Explain the nature of Public Opinion and point out its importance in popular Government.]

4. জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। জনগণশাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি?

[Explain the nature of Public Opinion. What is its importance in popular Government?]

5. জনমতের কার্যকারিতার শর্তগুলি আলোচনা কর।

Discuss the conditions of the effectiveness of Public Opinion.]

অষ্টাদশ অধ্যায় | রাজনৈতিক দলব্যবস্থা
Party System

রাজনৈতিক দল (Political Party) : রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় একদল জনসমষ্টি, যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবর্তী হইয়া যৌথভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়।[১] এই জনসমষ্টি একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে একত্রিত হয় এবং নিজেদের ভোটাধিকারের সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং নিজেদের কতিপয় সাধারণ নীতি কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। বার্কার বলেন যদিও একটি রাজনৈতিক দল বিশেষ মতবাদের দ্বারা পরিচালিত, তবুও ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করে।[২] রাজনৈতিক দল গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলি একান্ত আবশ্যক।

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে ?

প্রথমতঃ যাহারা দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের পার্থক্য থাকিলেও রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের (Feeling of nationalism) ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। আবার সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্যও রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারেন।

দল গঠনের উপাদান

তৃতীয়তঃ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা।

১। "A Party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours the *national* interest upon some particular principle in which they are all agreed." —Burk.

২। 'A Party is a *particular* body of opinions (otherwise it wouuld not be a Party) which is nonetheless concerned with the *general national* interest, and which forms, and presents to the choice of the electorate, a programme of general scope and width."— Barker.

চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে। রাজনৈতিক দলের প্রতি বিভিন্ন সদস্যের আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। কিন্তু, প্রত্যেকেই যে সরকার গঠন করিয়া অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দলের কতিপয় সাধারণ মূল-নীতিকে কার্যকর করিতে সচেষ্ট থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রে আমরা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। রাজনৈতিক দলের এই বিভিন্নতার অন্যতম কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা মনে করেন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেই সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা উচিত, তাঁহারা হয়ত একটি সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিতে পারেন। আবার যাঁহারা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যাঁহারা ব্যক্তিগত উদ্যোগ (Private Enterprise) বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা হয়ত একটি আলাদা রক্ষণশীল দল গঠন করিতে পারেন। সমাজতন্ত্রী দল ও রক্ষণশীল দলের কর্মসূচী আলাদা থাকে। ভারতের কমিউনিষ্টদল এবং স্বতন্ত্রদলের কর্মসূচী পরস্পরের বিপরীত।

অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রীদল অথবা "faction" বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of the Party System in Democracy) **:** গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইতেছে দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকর করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্য দলের সদস্যগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। রাজনৈতিক দলের মূলনীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণের সময় জাতীয় সমস্যাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য সঠিক উপায় নির্দেশ করিতে হয়।

দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা ও নীতি নির্ধারণ করা

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কার্যসূচীর সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা

সরকার গঠন করা এবং প্রার্থী নির্বাচন করা

মন্ত্রিসভা চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিত হয়।

স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

যে সমস্ত দেশ এখনও স্বাধীনতা অর্জন করে নাই, সেই সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ হইতেছে স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা স্বাধীনতা অর্জিত হইলে যাহাতে ইহা সরকার গঠন করিতে পারে ও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করা।

বিরোধী দলের ভূমিকা

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আইন পরিষদে বিরোধীদলের ভূমিকা একটি নিছক ("idle phrase") নয়। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইনসভায় বিরোধী দল

দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কম থাকে

যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং সরকার পক্ষের শক্তির অনুপাতে বিরোধী দলের শক্তিও যদি খুব কম না হয়, তবে বিরোধী দল সরকারপক্ষীয় দলের স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। আইন পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। আইনসভায় নিজেদের কাজ-কর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করে। শুধু আইনসভায় নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই নহে, বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের দ্বারা সভাসমিতি

জনমতের উপর প্রভাব

অনুষ্ঠান করিয়া, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা প্রচার করিয়া, প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে প্রভাবিত

করিবার চেষ্টা করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকার পক্ষীয় অথবা সরকার বিরোধী দলের, যে কোন দলের) ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে।৩

সরকার স্থায়ী রাখার চেষ্টা

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ্ (whip) নির্বাচিত করে। তাহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। এইগুলিকে "Coalition Government" বলা হয়। যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকে সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারে ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে।

অধিকাংশ দেশেই সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কমিউনিষ্ট দলই শুধু একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।) তবে কোনও রাজনৈতিক দল যদি সরকার গঠন করে, তখন সেই সরকারকে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত (extra-legal) এলাকায় সীমাবদ্ধ। দলীয় সংগঠন কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত ধরণের এবং প্রত্যেকটি দলের সংগঠন খুব অনমনীয় ((rigid)। কিন্তু ফ্রান্সে অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন খুব নমনীয় (flexible)।

৩। ..."Political parties serve as the motive force in crystallizing public opinion, and the unifying agency that makes democracy workable over large areas" —Gettell.

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে। রাজনৈতিক কার্যসূচী হইতে অর্থনৈতিক কার্যসূচী বর্তমান কালের রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু শ্রমিক দল (Labour Party) অত্যাবশ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী। অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়; যেমন, ভারতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার সৃষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে হইয়াছিল।

রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে

গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, সদাসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য।" ("Eternal vigilance is the price of Liberty,")। জনসাধারণের রাজনৈতিক প্রসারণ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নহে গণতন্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে।

গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য দলব্যবস্থার গুরুত্ব

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে। কেননা, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে পাই, সেজন্য সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পূর্বে ফ্রান্সে এবং বর্তমানে ইটালীতে বহু-দল ব্যবস্থায় যে স্থায়ী সরকার গঠিত হয় না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার, এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের দ্বারা যুক্তফ্রণ্ট সরকার

একনায়কতন্ত্রে শুধু একটিই দল থাকে।

গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই রাজ্যগুলির বিধানসভার বহু সদস্য নিজ নিজ দল হইতে অন্য দলে যোগদান করায় যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলিতে ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে দলের সংখ্যা বেশী হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দেশে যদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে, রাজনৈতিক দল সেখানে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি সুসমঞ্জস শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির ক্ষেত্র রচনা করে।

দলীয় শাসনের সুবিধা (Advantages of Party Government) : রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাসনের একটি প্রধান সুবিধা হইল, সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষতঃ আইনসভায় সরকারবিরোধী দলগুলি সরকারকে কখনই স্বৈরাচারী হইতে দেয় না। এই দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইন-সভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনা সহ্য করিয়া সরকারপক্ষ কখনও নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজকর্ম করিতে চায় না।

সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না

দলীয় শাসনের আর একটি অসুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ সূত্র স্থাপিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। যে সকল লোক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে একই অভিমত পোষণ করেন, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজনৈতিক দলের মারফৎ আইন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদের বাইরে সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইন পরিষদের মধ্যে যে যোগসূত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহা শুধু দলীয় শাসনেই সম্ভব।

সরকারের সহিত জনগণের সম্পর্ক সহজ হয়

রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার

দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা তাহাদিগকে কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে দলব্যবস্থার গুরুত্ব

দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য, দলীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকিলে বিপ্লবের পথে না যাইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভবপর। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের বহুমুখী পরিবর্তন করিতে হইলে দলব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দলীয় শাসনের অসুবিধা (Disadvantages of the Party System) : গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহা দলীয় মত-বিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য ; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য দলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার অনুশাসন পালন করিতে হয়। বীর পূজার (hero worship) চাপে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে সদস্যগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের নীতিকে বড করিয়া তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় সদস্যগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। ইহাতে সদস্যগণের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হইয়া যায়। সদস্যগণ যদি দলীয় নেতার নির্দেশ অমান্য করেন, তবে তাঁহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ঝুঁকি থাকায় কোন সদস্যই অযথা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করিয়া দলীয় নির্দেশ অমান্য করিতে সাহসী হন না। সদস্যদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য জন-স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া ফেলে। গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ।

দলীয় মতভেদ বীরপূজা এবং দলীয় স্বার্থ সরকারের সংহতি নষ্ট করে

ইহাতে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়

তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন

প্রকারেই হউক, ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। দলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাপও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রিদলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন। এমনকি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় না,—সেখানেও দলীয় স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখা যায়। দল রাখিবার জন্য অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত সদস্যগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়। দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং সেই রাজনৈতিক দলগুলির শক্তিও প্রায় একরূপ, সেগুলিতে সরকার কখনই স্থায়ীভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

নৈতিক মানের অবনতি

দলীয় স্বার্থে উপযুক্ত ব্যক্তি উপেক্ষিত হইতে পারে

দলীয় শাসনের আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি দলের সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক দল যদি কুচক্রী দলে (faction) পরিণত হয়, তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না।

কুচক্রী দল

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against the two-party system): পৃথিবীর দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে [ব্রিটেনে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকিলেও দুইটি দলই প্রধান] আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ পরিচালনা করে। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) অথবা সিনেট সভার (Senate) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে না। মার্কিন

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহাদের মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না।

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। কিন্তু, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার গঠনকারী দল কখনই জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে প্রস্তুত থাকে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে নাগরিক তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে প্রয়োগ করিতে পারে।[৪] সাধারণ নির্বাচকদের পক্ষেও দুইটি দলের কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা সম্ভবপর হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য।

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে পূর্বে যখন ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং উদারনৈতিক দল (Liberal Party) শুধু এই দুইটি রাজনৈতিক দল ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে যদি শুধু একটি সরকারপক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (coalition ministry) গঠন করিতে পারে। বিশেষতঃ দুইটি দল থাকিলে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যায়,

সরকারের স্বৈরাচারিতা ব্যাহত হয়

৪। "The citizen will choose most freely, and his moral will can best be exercised, hen he has a clear choice between two alternatives."—*Barker*

বহুদল-সমন্বিত আইন পরিষদে সেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। দুই দল সমন্বিত আইন পরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃঙ্খলা খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদস্যগণ অনেক সময়েই নিজেদের বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

বহু-দল ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of multiple party system): বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক মত পোষণ করিলে সেইগুলি আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বহুদল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রিসভাও বহুদল সমন্বিত শাসব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সরকার পক্ষ অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে পারে। বহুদল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ করা খুব কঠিন নহে। দ্য গল (De Gaulle) রাষ্ট্রপতি হইবার পূর্বে ফ্রান্সে এবং সম্প্রতি ইটালীতে ইহা বহুবার হইয়াছে। জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যদি সরকার গঠিত হয়, (যেমন, ইংলণ্ডে হয়), তবে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায়।

বহুদল ব্যবস্থার সুবিধা

বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। অতীতে ফ্রান্সে এবং সাম্প্রতিককালে ইটালীতে বহুদল ব্যবস্থার জন্য অনেকবার মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। বহুদল শাসনব্যবস্থার যে স্থায়ী সরকার গঠিত হয় না, ইহার প্রমাণ আমাদের দেশেও সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন দলের দ্বারা যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু, বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভায় বহু সদস্য নিজ নিজ দল হইতে অন্য দলে যোগদান করায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলিতে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে দলের সংখ্যা বেশী

ইহার ত্রুটি, সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না; ভারতের উদাহরণ

হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, বহুদল-ব্যবস্থার পরিবর্তে দুই দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত। বিশেষতঃ, যদি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বহুদল ব্যবস্থায় এই সুবিধা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, আইন পরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্যকর করিতে অযথা সময় অতিবাহিত হয় এবং ইহা সর্বদাই কোন না কোন দলের সদস্যদের অসন্তোষের কারণ ঘটায়। বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোটদাতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্য বহুদল ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে বিভ্রান্ত করে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া কঠিন

উপসংহার: আমরা বলিতে পারি দুই দলীয় শাসনব্যবস্থা বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সরকারের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক। কিন্তু দেখিতে হইবে দুই-দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী না হয়।

বহু-দলীয় ব্যবস্থা হইতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা নানাদিক হইতেই ভাল। বহু-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠিত হয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা নির্বাচনের কাজকে সহজ করিয়া তুলে। কেননা দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে একটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করার কাজ নাগরিকের পক্ষে খুব সহজসাধ্য এবং সেক্ষেত্রে নাগরিক তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারে।[৫] তাহা ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষেও দুইটি দলের পারস্পরিক দোষ গুণ এবং কর্মসূচী লইয়া আলোচনা এবং বিতর্ক করা যতটা সহজ, বহু-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের কর্মসূচী লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা তত সহজ নয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নাগরিক শ্রেষ্ঠ যুক্তি প্রদান করিতে পারে এবং অপরের যুক্তিও অনুধাবন

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে ভাল হইতে পারে

৫। "The citizen will choose most freely, and his moral will can best be exercised, when he has clear choice between two alternatives."—Barker.

করিতে পারে।[১] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই একটি সুসংহত এবং দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা একান্ত পরিহার্য। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সরকারের স্থিতিশীলতা দেখিতে পাই। তাহা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দরুন সম্ভব হইয়াছে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিশেষভাবে কাম্য।[২]

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (One Party Rule and Democracy) : কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হয় না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার এবং একমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই। কিন্তু, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা কমিউনিস্ট সরকারের কোন বিরোধী দল দেখিতে পাই না। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট দলই সেখানে নিজের খেয়ালখুশীমত সরকার পরিচালনা করে ; জনগণের কোন ক্ষমতাই নাই দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার। ইহা গণতন্ত্রসম্মত নয়, প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থাও নয়। প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্য দলগুলি প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের সমালোচনা করে অথবা ইহার সহিত সহযোগিতা করে। কেননা, জাতীয় প্রগতি সাধন করাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেশ্য। বিরোধী দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে সরকারেরই উপকার হয়। কেননা, জনমতের মর্যাদা রাখিবার জন্য সরকার নিজের নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন করিতে পারে। বিরোধীদলগুলিও সর্বদাই বিকল্প সরকার গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। দলীয় শাসনব্যবস্থার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সোভিয়েত মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শুধু একটি রাজনৈতিক দলকেই স্বীকার করা হইয়াছে। হিটলারের আমলে জার্মানীতে নাৎসীদল এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল দেখাইয়াছে একদলীয় ব্যবস্থায় কিভাবে জনমতের কণ্ঠ রোধ করা হয়, কিভাবে

একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র সার্থক হয় না

বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলে সরকার নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে

১। "The citizen will argue best, and best understand the argument of others, when two main sides are engaged in debate." —Barker.

২। দ্বি-দলীয়ব্যবস্থার সপক্ষে লাস্কি বলেন, "a political system is the more satisfactory, the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties."

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করিয়া স্বাধীনতার আলোক হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য একাধিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হয়; কিন্তু বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলে সরকারের স্বৈরাচার বন্ধ হয়। বিরোধীদল সরকারের নীতির সমালোচনা করিতে পারে এবং সরকারও জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনও রেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদলীয় শাসনে দলীয় নেতার নেতৃত্ব সকলকে মানিয়া চলিতে হয় বলিয়া একদলীয় শাসনে একনায়কত্বের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে চীনে আমরা মাও-সে তুং-এর একনায়কত্ব দেখিতে পাই। চীনে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি মাত্র দলই দেশ শাসন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে কমিউনিস্ট দল সর্বহারা শ্রমিকদের লইয়া গঠিত, এবং ইহার নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। কিন্তু মূল কথা হইতেছে, শ্রমিকদের মধ্যে হয়ত এমন কেহ থাকিতে পারেন যিনি কমিউনিস্ট দলের আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে নিজের মতামত এবং বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা বা প্রচার করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং একদলীয় ব্যবস্থায় বিচার বিবেচনা এবং বিবেকের স্বাধীনতা থাকে না। ইহা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা

একদলীয় ব্যবস্থায় বিবেকের স্বাধীনতা নাই।

ভারতের দলীয় শাসনব্যবস্থা (Indian Party System): পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার পক্ষে দলীয় ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা তাহা আমরা ভারতে দেখিতে পাই। ভারতে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে। ১৯৬৯ সালে ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছিল ভারতের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া। আদি কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। বর্তমানে ভারতে দুইটি কংগ্রেস দল; একটি হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল এবং অপরটি হইতেছে পার্লামেণ্টে সরকারের অন্যতম বিরোধী দলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সংগঠন কংগ্রেস দল। তবে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলিয়া নিজেকে দাবি করে।

ভারতে অনেক রাজনৈতিক দল আছে

চৌদ্দটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক, সাধারণ বীমা ও সমুদয় কয়লাখনি জাতীয়করণ করার পর এবং একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করার পর কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল সংগঠন কংগ্রেসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কংগ্রেস দলকে বাদ দিলে ভারতে আরও তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইতেছে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি চরম দক্ষিণপন্থী দল; দ্বিতীয়টি হইতেছে মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট দল, ভারতের কমিউনিষ্ট দল, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট দল প্রভৃতি সাম্যবাদে বিশ্বাসী দল, এবং তৃতীয়টি হইতেছে বামপন্থীও নহে অথবা চরম দক্ষিণ পন্থীও নহে এই জাতীয় কয়েকটি দল, যেমন সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়াড ব্লক, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, প্রভৃতি। এই তিন শ্রেণীর দল ছাড়াও ভারতে কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আছে, যেমন, উড়িষ্যার জনকংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. দল, পাঞ্জাবে আকালী দল, অন্ধ্রে বিচ্ছিন্নতাকামী কংগ্রেসীগণের আলাদা দল, মেঘালয়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে আঞ্চলিক দল, প্রভৃতি। এই দলগুলির অধিকাংশ সদস্য অতীতে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। আঞ্চলিক স্বার্থে অথবা রাজ্য রাজনীতির পরিণতি হিসাবেই এই দলগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হইতেছে তৃতীয় কমিউনিষ্ট দল (মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট) এই দল নকশালপন্থী এবং চীনাপন্থী হিসাবে পরিচিত। এই দল সংসদীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচনে বিশ্বাসী নহে। এই দল মনে করে যে বিপ্লবের মধ্য দিয়াই সমাজব্যবস্থার রূপান্তর হইতে পারে, নির্বাচনের মাধ্যমে নহে। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে নিম্নকক্ষের বিভিন্ন দলের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কোন রাজনৈতিক দলকেই স্বাধীন ভারতে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় নাই বটে, তবে রাজ্যসরকারগুলির স্থায়িত্ব বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভারতে সরকার-বিরোধী দলগুলির ভূমিকা (Role of the Opposition Parties in India)**:** চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শুধু সরকারের সমালোচনা করিয়াই নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতীয় কংগ্রেস নিজেই এই নয়টি রাজ্যে বিরোধী দলে পরিণত হয়। ১৯৬৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির পতনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের

ভারতে সরকার বিরোধী দলগুলির ভূমিকা

বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের প্রবলতা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে মন্ত্রিত্বের লোভে বহু কংগ্রেস বিরোধী সদস্য দলত্যাগের উস্কানি পাইয়াছিলেন। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস ইহার হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে (১৯৬৮) খোলাখুলিভাবে অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটাইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও বিহারে সংখ্যালঘু সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল। ১৯৬৯ সালে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসে দলীয় বিবাদ তীব্র হয়, এবং তাহারই পরিণতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আদি কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কৃত হন। ইহার পরেই কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল কোন রাজ্যে বিরোধী দল লইয়া গঠিত সরকারের উচ্ছেদের জন্য আগ্রহী নহে বলিয়া দাবি করে। এই প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্রের ৩২তম সংশোধনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন কক্ষে দলত্যাগ বন্ধের প্রতিবিধান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সংশোধন অনুযায়ী যদি কোন সদস্য নির্বাচনের পর স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করেন অথবা দলের অনুমতি না লইয়া সংসদে বা বিধানসভায় ভোটদানে বিরত থাকেন তবে তাঁহার সদস্যপদ খারিজ হইতে পারে। তবে কোন রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন দেখা দিলে এবং সেক্ষেত্রে যদি কোন সদস্য দলের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন অথবা দলে ভাঙ্গনের দরুণ দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন তাহা হইলে তিনি সদস্যপদ হারাইবেন না। পার্লামেণ্টে এখন বৃহত্তম বিরোধী দল হইতেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির ভূমিকাও খুব সুখের নয়। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্টের বিরোধী দলগুলির কথা ধরা যাক। পার্লামেণ্টের বিরোধী দলগুলির মধ্যে আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র দল এবং জনসঙ্ঘ আদর্শ ও নীতির দিক দিয়া কমিউনিষ্ট দলের ঘোরতর বিরোধী। ইহার ফলে পার্লামেণ্টে সরকার বিরোধী কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সময় প্রায়ই মতৈক্যের অভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কয়েক বছর আগে স্বতন্ত্র দল ও জনসঙ্ঘ ভারতের কমিউনিষ্ট দলগুলিকে (ডান ও বামপন্থী) নিষিদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল।

কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্য

ভাষার ক্ষেত্রেও তামিলনাড়ুর ডি. এম্. কে. দল যেমন, হিন্দীভাষার বিরোধী, অপর দিকে জনসঙ্ঘ এবং সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল তেমনি হিন্দীভাষার উগ্র সমর্থক। দেখা যাইতেছে কোন ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্টের সরকার-বিরোধী দলগুলি একজোট হইয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে পারিতেছে না। পার্লামেণ্টে যে কোন বিল লইয়া অথবা

অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া যখনই ভোটাভুটি হইয়াছে তখনই বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্য প্রকট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে রাজ্যগুলিতে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছে সেইগুলির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শগত ও কর্মসূচীগত মতপার্থক্য এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। জোড়াতালি দিয়া চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলি গঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলিও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী অভিযান চালাইয়াছিল। যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলির মধ্যে এই অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ কংগ্রেস গ্রহণ করে, এবং ইহার ফলে সরকার ভাঙ্গা-গড়া এবং দলত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায়। দলত্যাগের কদর্য রূপ দেখা যায় হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবে। ইহার ফলে গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়।

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ভারতেই দেখা যায়, এই জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতের সেই সুনাম সাময়িকভাবে নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বহু রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হওয়ায় এবং তাহা অপেক্ষাও বড় কথা, মন্ত্রিত্বের লোভে দলীয় সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায়। তবে ১৯৭১ সালে পঞ্চম ও অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্থিতিশীলতা দেখা গিয়াছে। কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রেও এখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে যদিও উপদলীয় রাজনীতি কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয় আছে।

১৯৬৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই একটি অংশ বিরোধী দলে পরিণত হওয়ায় ভারতে রাজনৈতিক পটের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। পূর্বে যাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অথবা সমর্থক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিরোধী দলের প্রধান সারির নেতা হিসাবে গণ্য হন।

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঃ ভারতে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই ; তন্মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই প্রধান। ১৮৮৫ সালে এই দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৫ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা দেশ আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া ইহা পরিচালনা করিয়াছে। স্বাধীন হইবার সময় জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করিয়াছিল। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেদল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পূর্বতন অবিভক্ত কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নব কংগ্রেস

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

বা শাসক কংগ্রেস দলকে সংগঠিত করেন। ১৯৭১ সালে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। কমিউনিষ্ট দল বর্তমানে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত। ইহার পর স্থান হইতেছে যথাক্রমে স্বতন্ত্রদল, জনসঙ্ঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী দল। রাজনৈতিক দলগুলির যে কার্যসূচী থাকা উচিত, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সেই কার্যসূচী আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সরকার গঠন করা ও ইহা স্থায়ী রাখিবার চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই দিয়া থাকে, এবং প্রত্যেকটি দলেরই একটি অর্থ নৈতিক কার্যসূচী আছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির ভূমিকা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার কারণ হইতেছে এই যে ভারতের বিরোধী দলগুলি কখনই এক সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, এমন কোন শক্তিশালী বিরোধী দল ভারতবর্ষে নাই যাহা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিপক্ষে শক্তিশালী দল হিসাবে একক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পারে। সমুদয় বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নহে। তবে বিরোধী কংগ্রেস দল, স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসিবার চেষ্টা করিতেছে। বহুদল ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্প্রতি ভারতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল দলীয় সদস্যদের নিজেদের দলত্যাগের মাধ্যমে। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশের নাগরিকগণের দলীয় চেতনা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই সেইজন্য শৃংখলার গুরুত্ব, দলের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং দলের অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর বিশ্লেষণ অনুশীলন আমাদের দেশে এখনও সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাহা ছাড়া ভারতে আরও কতিপয় রাজনৈতিক দল আছে, যেমন, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, মুসলীম লীগ, তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে দল এবং আন্না ডি. এম. কে. দল ফরওয়ার্ড ব্লক, পশ্চিমবংঙ্গ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, পাঞ্জাবে আকালী দল প্রভৃতি। কয়েকটি রাজ্যে বহু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আছে। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এই দলগুলির প্রভাব নাই বলিলেই চলে; অন্যান্য দলগুলি কোন-না-কোন দলীয় জোটের সঙ্গে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ব্যতীত দুইটি জোট বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইতেছে দক্ষিণপন্থী জোট এবং অপরটি হইতেছে বামপন্থী জোট। ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল এখন পর্যন্ত সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সহযোগিতা করিতেছে। কেরালায় ভারতীয় কমউনিষ্ট

দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। বামপন্থী জোট বর্তমানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছে। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলই প্রধান। দক্ষিণপন্থী জোটে আছে সংগঠন কংগ্রেস দল, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি। ডি. এম. কে. দল হইতেছে মধ্যপন্থী।

ভারতের দলীয় ব্যবস্থা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের দলীয় ব্যবস্থার ন্যায় এত অনমনীয় নয়, বরং ইহা যথেষ্ট নমনীয়। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিও সেই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করে। পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে আমরা বহু বিরোধী দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। আইন পরিষদে বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্র কখনই সার্থক হয় না।

নমনীয় দলীয় শাসনব্যবস্থা

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যসূচী এবং ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিম্নে করা হইল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress): ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ। ১৮৮৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অক্লান্তভাবে এই দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। অবশ্য এই দলের মধ্যে যে উপদলের সৃষ্টি হয় নাই তাহা নহে। বর্তমানে কমিউনিষ্ট দল, সমাজতন্ত্রী দল এবং স্বতন্ত্রদলের সদস্যগণ এককালে কংগ্রেসেরই কর্মী ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের কর্মসূচীর পরিবর্তন হয় এবং ইহাতে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠনের ভার গ্রহণ করে। একমাত্র কেরালায় সামগ্রিক বিপর্যয় ব্যতীত তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসই কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার গঠন করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছিল। কংগ্রেস দলের সংগঠন মূলত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত; কিন্তু দলীয় নীতি নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বা ওয়ার্কিং কমিটি। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, প্রতি জেলায় জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং জেলা কমিটির অধীনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি আছে। কংগ্রেস দলের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে যাহা শান্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য এবং আন্তর্জাতিক

দ্বিধাবিভক্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

সৌহার্দ্যের উপর ভিত্তিশীল। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মসূচী হইতেছে দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া সরকার গঠনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। উপদলীয় বিবাদের খারাপ পরিণতিও এই রাজ্যগুলিতে দেখা গিয়াছিল। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বতন কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল বর্তমানে সুসংগঠিত হইয়াছে। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হইবার ফলে লোকসভায় শাসক কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়; ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করিয়া দেন এবং ১৯৭১ সালে পঞ্চম (মধ্যবর্তী) নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই নির্বাচনে লোকসভার মোট ৫১৫টি আসনের মধ্যে শাসক কংগ্রেস দল ৩৫০টি আসন লাভ করে। লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসন লাভ করিয়া শাসক কংগ্রেস দল দেশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে অবিভক্ত কংগ্রেস দল কখনই পার্লামেণ্টে এত বেশী আসন লাভ করে নাই। বর্তমানে কংগ্রেস দল বলিতে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলকেই বুঝায়। বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দল এখন ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশ দফা নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে প্রকৃতপক্ষে এই কংগ্রেস দলেরই ঘোষিত নীতি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। বর্তমানে সংগঠন কংগ্রেসের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল মাত্র ১৬টি আসন লাভ করে। যদিও সম্প্রতি শাসক কংগ্রেস দল বহু প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তবুও কংগ্রেসের দুইটি দলের (অর্থাৎ, শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস) কার্যসূচী বা আদর্শের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, উভয় দলই নিজেদের খাঁটি জাতীয় কংগ্রেস মনে করে এবং পূর্ব বিঘোষিত আদর্শের অনুগামী বলিয়া পরিচিত করে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র উভয় দলেরই আদর্শ এবং সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক জাতীয়করণ, আয় ও ধনের পুনর্বণ্টন, ভূমিহীনকে জমিদান, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিল্প জাতীয়করণ প্রভৃতি প্রগতিশীল নীতিগুলি উভয় দল কর্তৃকই সমর্থিত। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, সংগঠন কংগ্রেস দল স্বতন্ত্র দল, ভারতীয় লোকদল, ও জনসংঘের সহিত একটি সমঝোতা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে কোন কোন রাজ্যে

সংগঠন কংগ্রেসের সদস্যগণ দলে দলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলে যোগদান করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন কংগ্রেস দল ভারতীয় কমিউনিষ্ট দলের নিকট হইতে সমর্থন পাইতেছে।

ভারতের দুইটি কমিউনিষ্ট দল (Two Communist Parties in India) : ভারতের কমিউনিষ্ট দলের সূচনা হয় ১৯৪২ সালে। কিন্তু ইংরাজ আমলে ১৯৪৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দল স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই। পূর্বে এই দল মূলতঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট দলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কর্মসূচী অনুসরণ করিত। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের যে আদর্শ, ভারতের দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দলেরও সেই আদর্শ। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে ভারত সরকারের বিরোধ বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলকে খুবই বিপর্যস্ত করিয়াছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই কমিউনিষ্ট দল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় জয়লাভ করিয়া কমিউনিষ্ট দল সর্বপ্রথম দেশে একটি অকমিউনিষ্ট সরকার গঠন করে; কিন্তু সেই সরকার স্থায়ী করিয়া রাখা কমিউনিষ্ট দলের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সম্পূর্ণভাবে অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করাই ভারতের কমিউনিষ্ট দলের এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের কর্মসূচী।

কমিউনিষ্ট দল

বেশ কয়েক বৎসর আগে কমিউনিষ্ট দল তত্ত্বগত পার্থক্যের ভিত্তিতে দুইটি উপদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটি হইতেছে ভারতের কমিউনিষ্ট দল (Communist Party of India) এবং অপরটি হইতেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল (Communist Party of India —Marxist)—একটিকে রুশপন্থী এবং অপরটিকে সাধারণভাবে চীনাপন্থী বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলের মধ্যেই কয়েক বৎসর পূর্বে উগ্রপন্থী কয়েক-জন নেতা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের এবং তাহাদের অনুগামীদের কমিউনিষ্ট দল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং এই ঘটনা ঘটে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ী অঞ্চলে সশস্ত্র আন্দোলন হইবার পর। উগ্রপন্থীগণ কিছু-কাল পূর্বে একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল ভারতের কমিউনিষ্ট দল (মার্কস্‌পন্থী ও লেলিনপন্থী) (Communist Party of India,—Marxist,-Leninist)। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিষ্ট দলের বামপন্থী দল কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগদান করে। সম্প্রতি কেরালায় মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দলকে বাদ দিয়া ভারতের কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে একটি বিকল্প

যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় কমিউনিষ্ট দলগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দল মাত্র ১৪টি বিধানসভার আসন লাভ করে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এই দলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এই দল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাকে আপাততঃ বয়কট করিয়াছে। অপরদিকে ভারতের কমিউনিষ্ট দল ১৯৭২ সালে রাজ্য বিধান সভাগুলির নির্বাচনে এবং ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী দুই কমিউনিষ্ট দলেরই প্রধান কর্মসূচী হইতেছে শিল্প জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State Trading) প্রসার, বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ, একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ, পরোক্ষ করভার হ্রাস, আয় ও ধনের সমবণ্টন এবং ভূমিসংস্কারের আশু ব্যবস্থা প্রভৃতি সুনিশ্চিত করা। কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করিয়া। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট দল ভারতের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক ছিল। কিন্তু ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমানা বিরোধ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইলে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দল চীনকে নিন্দা না করিয়া ভারতের ত্রুটিই প্রচার করিতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই দল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে শোধনবাদী আখ্যা দেয় এবং তাহা সুরু হয় সেই দেশে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতায় আসীন হইবার পর হইতে। এই সব কারণে ভারতেও কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে দুইটি শিবিরে সৃষ্টি হয়। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ভারতের কমিউনিষ্ট দল ২২টি এবং মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দল ১৯টি আসন লাভ করে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট দল ২৫টি এবং ভারতের কমিউনিষ্ট দল ২৩টি আসন লাভ করিয়াছিল।

স্বতন্ত্র দল (Swatantra Party): ১৯৫৯ সালে রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এবং পরবর্তীকালে এ জি. রঙ্গ, মাসানী, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বতন্ত্রদল একটি সর্বভারতীয় দল হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল সর্বপ্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই দল রক্ষণশীল গণতন্ত্রের (Conservative Democracy) সমর্থক এবং শিল্পক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী। এক কথায় এই দলের কর্মসূচী হইতেছে অসমাজতান্ত্রিক। দেশে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির মধ্যে এই দল কিছু কাল পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্ত্রদলের অবস্থা কিছু ভাল

স্বতন্ত্র দল

হইয়াছিল, এবং স্বতন্ত্রদল উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিল। তখন লোকসভায় স্বতন্ত্রদলই দ্বিতীয় বৃহত্তর দল ছিল। কিন্তু পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্রদলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়াছে; লোকসভায় এই দল মাত্র ৮টি আসন লাভ করিয়াছে। স্বতন্ত্রদল ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নহে। এই দলের আভ্যন্তরীণ নীতি হইতেছে শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ না করা, বেসরকারী উদ্যোগে সব বিনিয়োগ ছাড়িয়া দেওয়া, করভার হ্রাস করা, যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কঠোরতা হ্রাস করা। এক কথায় এই দল ধনতন্ত্রের (Capitalism) সমর্থক।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল (The Samyukta Socialist Party): সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছিল প্রজাসমাজতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দলের সম্মিলনে। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের একাংশ এখনও আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল (Praja Socialist Party) এবং জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন অপেক্ষা অনেক ভাল। এই দুইটি দল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগদান করিয়াছিল। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল উত্তরপ্রদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তবে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সমাজতন্ত্রের আদর্শ এবং কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে যথেষ্ট অমিল দেখা যায়। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল জনসংঘের মত হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষা করিবার নীতির উগ্র সমর্থক।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী দল

আগেকার সমাজতন্ত্রী দলের পূর্বতন নেতা ছিলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীরামমনোহর লোহিয়া এবং শ্রীঅশোক মেহতা। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করেন। শ্রীঅশোক মেহতাও প্রথমে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলে এবং পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে কর্মসূচীর ক্ষেত্রে পার্থক্য খুবই কম ছিল এবং ইহার ফলেই উভয় দলের মধ্যে সম্মেলনের ফলে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি হয়। তবে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কিছুটা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রে (Evolutionary Socialism) বিশ্বাসী। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দল প্রথমে সমাজ-বিপ্লবের (Social Revolution) মাধ্যমে দ্রুততর পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের কর্মসূচী সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শের

উপর ভিত্তিশীল হইয়াছিল এবং এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করা। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ২১টি আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু, পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় মাত্র ৩টি আসন লাভ করিয়াছে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পর সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমান লোকসভায় এই দলের মোট ৪ জন সদস্য আছেন।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল (The Praja Socialist Party): এই দলের কর্মসূচী এবং দৃষ্টিভঙ্গী সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের মূলনীতি হইতে বিশেষ পৃথক নহে। এই দলেরও মূল উদ্দেশ্য হইতেছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করা। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ১৩টি আসন লাভ করে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই দল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশ যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমানে উড়িষ্যার প্রজা সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসেব সঙ্গে একত্রিত হইয়া গিয়াছে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় মাত্র ২টি আসন লাভ কবে।

জনসংঘ

ভারতীয় জনসংঘ (Indian Jana Sangha): প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে স্বর্গত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেন। মূলতঃ ইহা ছিল হিন্দুমহাসভার সংশোধিত সংস্করণ। তবে দলের নীতি অনুযায়ী ইহা হিন্দুমহাসভার অনুগামী নহে। এই দলে বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার পথে কোন বাধা নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে এই দলের সংগঠন কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইলেও চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই দলের সংগঠন অনেক ভাল হইয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর জনসংঘ দিল্লী রাজ্য পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, প্রভৃতি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারে যোগদান করিয়াছিল। লোকসভায়ও বর্তমানে জনসংঘের প্রতিনিধিত্ব অনেক বাড়িয়াছিল এবং চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ১৪টি আসন লাভ করিয়াছিল। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ২২টি আসন লাভ করিয়াছে। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষা নীতির সহিত জনসংঘ একমত নহে। হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষা করিবার নীতির উগ্র সমর্থক হিসাবেও জনসংঘ কাজ করিতেছে। এই কলের কর্মসূচী অনেকটা স্বতন্ত্র দলের অনুরূপ।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করাই এই দলের কর্মসূচী।

অন্যান্য সর্বভারতীয় দল হইতেছে **বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী** দল (Revolutionary Socialist Party) এবং **ফরওয়ার্ড ব্লক** (Forward Bloc)। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল মার্ক্সবাদ বিশ্বাস করে ; পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই দল মোটামুটিভাবে শক্তিশালী। ফরওয়ার্ড ব্লক পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ শক্তিশালী। এই দল গঠিত হইয়াছিল ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক। এই দল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

ডি. এম. কে. দল

মাদ্রাজের **ডি. এম. কে.** দল একটি স্থানীয় দল। প্রকৃতপক্ষে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার বিপক্ষে আন্দোলন করাই এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তামিলনাড়ু বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া তথায় সরকার গঠন করিয়াছিল এবং ভারতের লোকসভায় পঁচিশটি আসন লাভ করিয়াছিল। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল শাসক কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ২৩টি আসন লাভ করিয়াছে এবং রাজ্য বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশেরও অনেক বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। ভাষার প্রশ্ন বাদ দিলে এই দলের কর্মসূচীর সহিত জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীর পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. দলের একটি শাখা আলাদাভাবে আন্না ডি. এম. কে. দল গঠন করিয়াছে। সিকিম রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর সিকিম কংগ্রেস ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত (শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দল) মিশিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

Exercise

1. রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজগুলি বর্ণনা কর।

[What is a Political Party? Describe the essential functions of Political Parties in a democracy.]

2. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদান কর। সুসংগঠিত দলের অস্তিত্ব ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব হইত,"—আলোচনা কর।

[Define a Political Party. "Without the existence of the organised parties, the functioning of the Parliamentary Government would prove impossible." Discuss]

3. দলীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর। তুমি কি কোন বাস্তব কার্যকর বিকল্পব্যবস্থার সুপারিশ প্রদান করিতে পার?

[Discuss the advantages and disadvantages of Party Government. Can you suggest any practical working alternative?]

4. গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার ব্যবহার অপ-ব্যবহার এবং প্রকৃত ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the use, abuse and the true role of the party system in Democracy.]

5. গণতন্ত্রে দ্বি-দলপ্রথা বনাম বহু-দলপ্রথার সমস্যাটি আলোচনা কর।

[Discuss the problem of the two-party system vs. multiple-party system in democracies.]

6. একদলীয় শাসনব্যবস্থা কি গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।

[Is One-Party rule compatible with Democracy ? Give reasons for your answer.]

7. রাজনৈতিক দলগুলির স্বরূপ এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি কি অপরিহার্য ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Discuss the nature and functions of political parties. Are political parties indispensable in democracies ? Give reasons for your answer.]

8. ভারতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[Discuss the features of the Indian Party System.]

9. ভারতে সরকার বিরোধী দলগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of the Opposition Parties in India.]

10. ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও কর্মসূচী আলোচনা কর।

[Discuss the role and programme of the Indian Political Parties.]

উনবিংশ অধ্যায়

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার
(Adult Franchise)

ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of Suffrage) : গত শতাব্দীতে যখন নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকগণকে ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং শ্রেণী বৈষম্যের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করিবার দাবি গৃহীত হইতে থাকে। অনেকের মতে আবার শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান করিবার অধিকার লাভের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে না। যাঁহার সম্পত্তি আছে এবং যিনি কর প্রদান করেন, তাঁহার হয়ত প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা নাই অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা নাও থাকিতে পারে। যাঁহাদের মতে সম্পত্তির মালিকানা ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত, তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে কেহ যদি সম্পত্তির অধিকারী না হন, তবে রাষ্ট্রের উপর তাঁহার দরদ থাকিতে পারে না। সুতরাং সম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও যদি কেহ ভোটাধিকারী হন, তবে তাঁহাদের ভোট প্রদান সর্বদা রাষ্ট্রের অনুকূলে না-ও যাইতে পারে। যাঁহাদের সম্পত্তি নাই তাঁহারা কর প্রদান করেন না। যাঁহারা কর প্রদান করেন না তাঁহাদের অমিতব্যয়ী অথবা অপচয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং তাহাদের হাতে ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। আধুনিককালে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হয় না। সামন্ততান্ত্রিক (Feudal) যুগে সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। দেখা গিয়াছে, সম্পত্তির অধিকারী না হইলেও কাহারও রাষ্ট্রের প্রতি দরদের অভাব হয় না।

ভোটাধিকারের বিভিন্ন ভিত্তি—সম্পত্তি, করপ্রদান, শিক্ষা

সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির অধিকারীগণ প্রত্যক্ষ কর প্রদান করিতেন; তখন পরোক্ষ করের প্রচলন ছিল না। বর্তমানকালে সব দেশেই পরোক্ষ কর প্রচলিত আছে এবং সম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও যে কোন নাগরিককেই পরোক্ষ কর প্রদান করিতে হয়। সুতরাং শুধু সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কর প্রদান করিতে হয়

সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার বিপক্ষে যুক্তি

এবং কর প্রদান করিলেই ভোট দিবার অধিকার থাকা উচিত এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না এবং যুক্তির ভিত্তিতে দেশের অধিকাংশ লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। আবার যাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সরকারের দৃষ্টিতে যাঁহারা শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাঁহারা প্রকৃতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই মানুষকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভোটাধিকারের উপযুক্ত করে। তাহা ছাড়া সম্পত্তি কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

অভিজ্ঞতার যুক্তি

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of adult franchise)**:** গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে সম্পত্তি অথবা অর্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য করা উচিত নহে। সাম্যের যুক্তির পক্ষে বলা যায়, মানুষে মানুষে সাম্য না থাকিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। এমন অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী এবং যাঁহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে। তাঁহাদের নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করা উচিত। সেজন্য অনেকে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকা উচিত। ইহাকেই সার্বজনীন ভোটাধিকারনীতি (Universal Suffrage) বলে। আধুনিককালে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলিতে প্রকৃতপক্ষে বুঝায় প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার। এই নীতির সমর্থনে বলা হয়, "যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত" ("What touches all, should be decided by all.") সুতরাং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তিকে বা দলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা। কেননা, সেক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার গণতন্ত্রকে সফল করে। জন

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে সাম্যের যুক্তি

ইহা গণতন্ত্রকে সফল করে

স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোনও একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইন পরিষদে অবহেলিত হয়।

নৈতিক যুক্তি

নীতির দিক হইতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার না হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক। ভোটাধিকার প্রদান না করিলে নাগরিকের চরিত্র গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের এই নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝায় তাহা সর্বদা সুস্পষ্ট থাকে না। ভোটাধিকার প্রদান করার আগে এবিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা উচিত। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলণ্ড, ভারত এবং আমেরিকায় ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারেও ব্যতিক্রম হয়

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against universal adult suffrage): কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে অনেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে) অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে। সেক্ষেত্রে তাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সার্বিক ভোটাধিকারের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা বলেন, ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার নহে। যদি তাহাই হইত তবে সমাজবিরোধী অথবা উন্মাদ নাগরিকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত না। ভোটাধিকার হইতেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রদত্ত একটি অধিকার। যাহারা কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম শুধু তাহাদেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত। জনসাধারণের যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনে কতটা বিবেচনাশক্তি আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা এই

সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি

সার্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন

অভিমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। অবশ্য জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে "সার্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত"।[১] কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, সার্বজনীন শিক্ষা না থাকিলেও সার্বজনীন ভোটাধিকারে উদ্দেশ্য মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। দেখা গিয়াছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক ক্ষেত্রেই বেশী হইতে পারে। সুতরাং ভোটাধিকার ভালভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে শিক্ষাই ভোটাধিকারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রেরই উচিত, নাগরিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা। তবে ইহাও ঠিক যে উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে ভোটাধিকার উপযুক্তভাবে এই মূল্যবান অধিকার প্রয়োগ করিতে সমর্থ না-ও হইতে পারেন। এজন্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রদান করিবার আগে ভোটধাতাগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ভারতে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ভোটদাতা যে-উপযুক্ত প্রার্থীকেই সর্বদা ভোট দিতে পারিয়াছেন এই কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু এইজন্য যে সার্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করা যায় না তাহাও নহে। শুধু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে সমাজে ধনী কর্তৃক গরীবদের শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে। সুতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনই সার্থক হইতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Woman suffrage) **:** জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে কতিপয় যুক্তির অবতারণা করেন। বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে ১৮৯৮ সালে ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। পরে ১৯২৮ সালে পূর্বতন নীতির সংশোধন করিয়া স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স পুরুষদের সমান করা হয়। ইটালী এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং জাপানে ১৯৪৭ সালে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতে ২১ বৎসর বয়স্ক সব

১। "Universal education must precede universal enfranchisement"—
John Stuart Mill

স্ত্রীসুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে। স্ত্রীলোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে ভোটাধিকার লাভ; স্ত্রীলোকেরা যদি ভোটাধিকার না-ও চায়, তবুও স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এই যুক্তির ভিত্তিতেই তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কারণ, দুর্বলেরই নিরাপত্তার বেশী প্রয়োজন। স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার লাভ করিলে নিজেদের পরিবারে তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। স্ত্রীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং স্ত্রীলোকের মৌলিক অধিকার খর্ব করিবে। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম নয় বলিয়া তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত নয়, এই যুক্তি আমরা কখনই সমর্থন করিতে পারি না। স্ত্রীজাতি হয়ত যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেবিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। বর্তমানে যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, স্ত্রীলোকেরাও তখন ঘরের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরের আহ্বানে বিভিন্নকর্মে যোগদান করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন পেশায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে। এমনকি দৈহিক পটুতাও নারীজাতির মধ্যে দেখা যায়। অনেক দেশেই আমরা নারী রক্ষীবাহিনী এবং নারী পুলিশ দেখিতে পাই। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মিলের মতে স্ত্রীলোককে ভোটের অধিকার দিলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হইবে। পুরুষরা যতবেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে পারে, নারীজাতির পক্ষে হয়ত ততটা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, নারীজাতির মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলিই তাহাদের সত্য ও সৌন্দর্যের উপাসক হইতে এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতি হইতে দূরে থাকিতে সাহায্য করে। অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের স্ত্রীলোকেরাও ভোটের অধিকারী হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে মিলের যুক্তি

অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারে শাসন-ব্যবস্থার মান উন্নত হইতে পারে

ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কি সফল হইয়াছে? (Has the universal adult suffrage been successful in

India ?) : ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ না হইলেও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। কারণ, পৃথিবীর অপর কোন কোন দেশে প্রায় ২৮ কোটি নির্বাচক নাই। কিন্তু বিগত পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২ সাল, ১৯৫৭ সাল, ১৯৬২ সাল, ১৯৬৭ সাল এবং ১৯৭১ সাল) অভিজ্ঞতা হইতে স্বতঃই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে আসে— তাহা হইতেছে, ভারতে কি সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল হইয়াছে ?

যাহারা সাধারণভাবে সার্বিক ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করেন না, তাঁহাদের মতে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের বিগত পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনে দেখা গিয়াছে যে নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহত্তম অংশ (যাঁহারা আদৌ শিক্ষিত নহেন অথবা অল্পশিক্ষিত) জানিতেন না যে ভোটপ্রদানের মূল্য কতটুকু। ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে এইরূপ অনেকেই নিজেদের ভোট প্রদান করেন নাই। কোন কোন নির্বাচনকেন্দ্রে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৬০ ভাগ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, কোন্ নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা উচিত অথবা কোন প্রার্থী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, কোন্ রাজনৈতিক দলের কিরূপ কর্মসূচী, কোন রাজনৈতিক দল জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে,—ইত্যাদি অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় (যেগুলি সব নির্বাচকেরই নির্বাচনের পূর্বে জানা উচিত) সম্বন্ধে অধিকাংশ নির্বাচক অজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই না জানিয়া ভোট প্রদান করিয়াছে অথবা ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হইয়াছে। রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্ণ বিকাশ নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় নাই। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন যে ভারতের জনসংখ্যার যেখানে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ লোক শিক্ষিত সেইক্ষেত্রে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া, যেখানে ভারতে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এবং তপশীলভুক্ত নাগরিকদের জন্য সব নাগরিকদের ন্যায় নির্বাচন প্রার্থী হইবার সমান অধিকার আছে, সেইক্ষেত্রে এই আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা থাকে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কতটা সফল হইবে সেই সম্বন্ধে শাসনতন্ত্র-প্রণেতাগণও সন্দিহান ছিলেন। সেইজন্য যাঁহারা মনে করেন যে ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল হয় নাই, তাঁহাদের মতে শুধু সেই সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত যাঁহারা

অনেকে মনে করেন সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ভারতে সফল হয় নাই

অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এবং তপশীলভুক্ত নাগরিকদের জন্য আসন সংরক্ষিত

কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম। এই মতের সমর্থকগণ অনেকক্ষেত্রে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তির নজির দেখাইয়া থাকেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে "Universal education must precede universal enfranchisement।" অর্থাৎ, সার্বিক ভোটাধিকারের আগে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। তাঁহারা মনে করেন যে অশিক্ষিত নির্বাচকগণ অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের লোভে নিজেদের ভোট বিক্রয় করিতে পারেন।

সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ভারতে একেবারে বিফল হইয়াছে ইহা বলা চলে না

কিন্তু ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই যে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী, সরকার গঠন এবং আইন প্রণয়নে সকল নাগরিকেরই যে পরোক্ষভাবে একটি ভূমিকা আছে, অর্থাৎ সরকারকে যে সকল নাগরিককেই সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তৎপর থাকিতে হয়,—ইহাই সরকারকে গণতন্ত্রের পথে চলিতে প্রেরণা দেয়। সরকারও জানেন যে ঠিকপথে না চলিলে উহাকে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নিকট সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাবদিহি করিতে হইবে। হয়ত আমাদের দেশের নির্বাচকদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত। কিন্তু নিজেদের ভালমন্দ বুঝিবার মত চেতনা তাহাদের নাই অথবা কোন্ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হইলে দেশের কল্যাণ হইবে ইহা বুঝিবার মত ক্ষমতা তাহাদের নাই একথা বলা চলে না। যাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সাধারণ অর্থে যাঁহারা শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বিগত পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনে এবং বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা এবং তৎপরতা আমরা দেখিয়াছি তাহাতে একথা বলা চলে না যে ভোট প্রদান করিবার প্রকৃত মর্ম ভারতের অশিক্ষিত নির্বাচকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিবার চেষ্টা নির্বাচকগণ করিয়াছেন। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সব দেশেই থাকে; আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু যে অনুপাতে আমাদের দেশের নির্বাচকগণ অশিক্ষিত, সেই অনুপাতে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দেশে কমই দেখা গিয়াছে। ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এই কথা বলা চলে না। দুইশত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার জ্বালা ভোগ করিবার পর ভারতের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং যতই দিন যাইবে ততই ভারতীয়

াগরিকগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। শুধু াক্ষিত নাগরিকগণের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমিত রাখিলে গণতন্ত্র বজায় থাকিবে া—মনে রাখা উচিত প্রকৃত গণতন্ত্রে অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কান তারতম্য করা হয় না; নাগরিকগণও অধিকার লাভ করিলেই কর্তব্য সম্পাদনে ৎপর হইতে আগ্রহশীল হন।

Exercise

ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষা কর। তুমি কি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভ টাধিকার সমর্থন কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Examine the different views regarding the basis of suffrage. Do you support universal adult suffrage? Give reasons for your answer.]

2. স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি বর্ণনা কর।

[State the case for and against woman suffrage.]

3. "সার্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত,"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

["Universal education must precede universal enfranchisement."

—Explain the statement.]

পরিশিষ্ট—১

ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of amending the Indian Constitution) **:**

শাসনতন্ত্র ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় (Flexible) এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনমনীয় (Rigid) হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় করার পক্ষে যুক্তি হইতেছে এই যে ইহাতে যখন তখন কর্তৃপক্ষের খুশীমত শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায় না বলিয়া সরকারের ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্রের বিধান দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময়ে ইহার পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অতিরিক্ত অনমনীয় শাসনতন্ত্রেরও একটি অসুবিধা আছে; তাহা হইতেছে এই যে দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত দেশের শাসনতন্ত্র সর্বদা সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এজন্য অনেকে মনে করেন, কোন শাসনতন্ত্রই একেবারে অনমনীয় হওয়া উচিত নয়; ইহার সংশোধন মোটামুটিভাবে সহজসাধ্য হওয়া উচিত।

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার সময় শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে শাসনতন্ত্রটিকে একেবারে অনমনীয় করা উচিত নয়।[১] ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহা খুব নমনীয়ও নহে, খুব অনমনীয়ও নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত ইহা অনমনীয় (rigid) নহে; আবার ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের ন্যায় ইহা একেবারে নমনীয়ও (flexible) নয়। নিম্নে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের যে তিনটি পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটি শাসনতন্ত্রকে বহুলাংশে নমনীয় করিয়াছে; আবার পরবর্তী পদ্ধতিগুলি শাসনতন্ত্রকে কিছু পরিমাণে কঠোর করিয়াছে। এইজন্যই বলা হয়, ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি কঠোরতা এবং নমনীয়তার সংমিশ্রণ। নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ভারতের শাসনতন্ত্রটি সংশোধন করা যায়।

১। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: **"While we want this Constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in constitution. There should be a certain flexibility. If you make any thing rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of a being. vital organic people."**

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিষয়ের পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা সম্ভবপর। নূতন রাজ্যের সৃষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন (সংবিধানের ৪নং ধারায় বর্ণিত), রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলের দ্বি-কক্ষের বিলোপসাধন বা দ্বি-কক্ষের প্রবর্তন, তপশীলভুক্ত জাতি সম্পর্কে ব্যবস্থা, প্রভৃতি এইরূপ সংশোধন পদ্ধতির অন্তর্গত।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং তখন পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক ইহা গৃহীত হইতে হইবে। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেন্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদস্যসংখ্যার অর্ধেক হওয়া চাই। এইভাবে বিলটি গৃহীত হইলে ইহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়, এবং রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। শাসনতন্ত্রের যদি এমন কোন সংশোধন করিতে হয় যাহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মূলরাজ্যগুলি জড়িত তাহা হইলে বিভিন্ন মূলরাজ্যের আইনসভার অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ, যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষমতা বণ্টন, পার্লামেন্টে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব, শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি, প্রভৃতির সহিত জড়িত থাকে, তবে উপরোক্ত সংশোধন পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও দেখিতে হইবে যেন উক্ত বিলটি বিভিন্ন মূল রাজ্যের অন্ততঃ অর্ধেক আইনসভার দ্বারা সমর্থিত হয় এবং উক্ত সমর্থনের সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। তখন পার্লামেন্টে উপরোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিলটি অনুমোদিত হইলে এবং ইহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া গেলেই শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বর্তমানে শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সহ শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে কেরল ভূমি সংস্কার আইনের বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা দায়ের [করা] হয় সেই প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্রের ২৪, ২৫ ও ২৯তম সংশোধনের বৈধতা সম্পর্কেও [সু]প্রীম কোর্টে রিট (writ) আবেদন পেশ করা হয়। সুপ্রীম কোর্টও ১৯৭৩ সালের [শে]শে এপ্রিল ইহার রায়ে শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধনের বৈধতা স্বীকার [ক]রিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্রকে

আরও নমনীয় করা হইয়াছে। তবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এই অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে যে শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নম্বর ধারা শাসনতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ বা কাঠামো বদলের ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেয় নাই।

মন্তব্য ঃ—ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীংকালে পার্লামেণ্টের এই ক্ষমতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলার রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন যে ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, তবে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহের সংশোধন করা অথবা সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পার্লামেণ্টের নাই। ইতিপূর্বে পার্লামেণ্ট সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া অসঙ্গত কাজ করিয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ হস্তক্ষেপ করা বিধিসম্মত হইবে না। সুপ্রীম কোর্টের মতে শাসনতন্ত্রের ১৩(২) ধারায় ব্যবহৃত 'আইন' (Law) শব্দটির দ্বারা সাধারণ আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইন বা সংশোধন উভয়ই বুঝায়, সুতরাং শাসনতন্ত্রের ১৩(২) ধারায় যখন নিষেধ করা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না, তখন পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াও কোন মৌলিক অধিকার হরণ অথবা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় সম্প্রতি বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অনেকেই মনে করেন যে এইভাবে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হরণ করা হইয়াছিল। সুপ্রীম কোর্টের মতে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সংশোধন করিতে হইলে একমাত্র এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি গণপরিষদই তাহা করিতে পারে। ব্যাংক জাতীয়করণ আইন (১৯৬৯) বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের ১৪, ১৯, এবং ৩১(২) নম্বর ধারা একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে আইনটিতে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছিল; কিন্তু ব্যাংক জাতীয়করণ করিয়া আইন প্রণয়ণ করিবার অধিকার যে পার্লামেণ্টের আছে তাহা সুপ্রীম কোর্ট স্বীকার করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় প্রকাশিত হইবার পর শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সম্বলিত বিধানগুলি সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নিজের হাতে রাখিবার জন্য আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ১৯৫৭ সালে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের **২৪তম সংশোধন** করে। এই সংশোধন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদ সহ যে কোন ধারা বা অনুচ্ছেদ সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। নাগরিকদের

মৌলিক অধিকার সহ শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের থাকা উচিত কিনা, এই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে ১৯৭৭ সালে একটি মামলা আনা হইয়াছিল। ১৯৭৭ সালের ২৪শে এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে কোন ধারা সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতেও ভারতের শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট প্রসঙ্গত এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পার্লামেন্টের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা থাকায় পার্লামেন্ট অবশ্যই শাসনতন্ত্রের মৌল কাঠামো পরিবর্তন করিতে পারে না; কারণ শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদ শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো বদলের ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেয় নাই।

পরিশিষ্ট—২

ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল* (The Forty-Fourth Amendment Bill to amend the Indian Constitution.)

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা কিছুকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছিল। কিভাবে শাসনতন্ত্রের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা যায় তাহা বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং-এর সভাপতিত্বে একটি শাসনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল প্রণীত হইয়াছে। এই সংশোধনী বিল অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্রের মোট ৫৯টি সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথমেই শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা বা ভূমিকার (Preamble) কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে। যখন শাসনতন্ত্রটি প্রথম প্রণীত হয় তখন প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছিল যে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক

* এই বইয়ে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ৪৪তম সংশোধনী বিল লোকসভায় উত্থাপিত হইবার পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের ব্যাপক সংশোধনের জন্য ৪৪তম সংশোধনী বিল ১৯৭৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর লোকসভায় উত্থাপিত হইয়াছে। এই সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হইলে ভারতের শাসনব্যবস্থার যা যা পরিবর্তন হইবে তাহা এই পরিশিষ্টে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্র (Sovereign, Democratic Republic) হইবে। ৪৪তম সংশোধনী বিলে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" কথাটির পরিবর্তে বলা হইয়াছে "সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic)। অর্থাৎ, এই সংশোধনী বিলটি আইনে পরিণত হইলে ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে পরিচিত হইবে। তাহাছাড়া মূল প্রস্তাবনার মধ্যে যেক্ষেত্রে "ঐক্য" (Unity) কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে "ঐক্য ও সংহতি" (Unity and integrity) কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) সম্পর্কেও ৪৪-তম সংশোধনী বিলে কিছু পরিবর্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতিতে বিনা খরচে আইন বিষয়ক সাহায্য, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, আবহাওয়া ও বন্য জীবন সংরক্ষণ এবং স্বাধীনভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে শিশুদের বিকাশের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

রাষ্ট্রের নূতন নির্দেশাত্মক নীতি

শাসনতন্ত্রের ৩৯ নম্বর ধারার সঙ্গে ৩৯ (ক) নামে একটি নূতন অনুচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে আইন ব্যবস্থা যাহাতে সমান সুযোগের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে রাষ্ট্র তাহা সুনিশ্চিত করিবে এবং উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রবর্তন করিয়া বিনা খরচে গরীবদের আইনের সুযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করিবে যাহাতে আর্থিক অসুবিধা অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য কাহাকেও ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত করা না হয়। অনুরূপভাবে শাসনতন্ত্রের ৪৩ নম্বর ধারার পর একটি নূতন অনুচ্ছেদ যোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যেন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় শ্রমিকগণ কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

নির্দেশাত্মক নীতির রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ

মূল শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উল্লেখ করা আছে সেগুলির সব কয়টি অথবা যে কোন একটি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই ধরণের আইনের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত-মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করা হইয়াছে এই যুক্তিতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না। মূল শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সেই নীতিগুলি পালন করা বা না করা সরকারের ইচ্ছাধীন ছিল, এবং এইগুলি এতদিন আদালতগ্রাহ্য ছিল না। কিন্তু যেহেতু বর্তমান সংশোধনের উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে চালিত

করা, সেজন্য ৪৪তম সংশোধনী বিলে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এই ধরণের আইন-প্রণয়নের ফলে যদি মৌলিক অধিকার খর্বও হয় তবুও নির্দেশাত্মক নীতির রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন-ই কার্যকর হইবে। সংশোধনী বিলে একটি নূতন অনুচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে [৩১ (খ)]; ইহাতে বলা হইয়াছে, যে-সব আইনের দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন বা দেশদ্রোহী তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই আইনগুলিকে মৌলিক অধিকারের দাবিতে সঙ্কুচিত বা নস্যাৎ করা চলিবে না। রাষ্ট্র বা জাতি-বিরোধী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও নূতন সংশোধনী বিলে রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্র বা জাতি-বিরোধী সংগঠন বা কাজ বলিতে কী বুঝায় তাহাও এই সংশোধন প্রস্তাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারতের যে কোনো অঞ্চলে অচল অবস্থার সৃষ্টি করা অথবা কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সংহতি বা নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করিবার চেষ্টা, বলপ্রয়োগের দ্বারা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার তৎপরতা, দেশের অভ্যন্তরে গোলোযোগ সৃষ্টি বা সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি, কিংবা ধর্ম, জাতি, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে হাঙ্গামা বাধানো ইত্যাদিকে জাতি-বিরোধী কাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যে-সব সংগঠন এই ধরণের জাতি-বিরোধী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে সেগুলিকে নিষিদ্ধ করা হইবে।

শাসনতন্ত্রের ৪৪-তম সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হইলে আমাদের শাসনতন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সংযোজিত হইবে, তাহা হইতেছে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আমরা নাগরিকদের অধিকারের বিল (Bill of Rights) দেখিতে পাই, ব্রিটেনে আছে আইনের অনুশাসন (Rules of Low); ভারতের মূল শাসনতন্ত্রে আছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য। ভারতে ১৯৫০ সাল হইতে এই পর্যন্ত নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে। আলাদাভাবে মৌলিক কর্তব্যের কথা মূল শাসনতন্ত্রে বলা হয় নাই। কারণ অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকার ভোগ করিলেই পরোক্ষভাবে কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলে আলাদাভাবে নাগরিকদের জন্য দশদফা মৌলিক কর্তব্যের বিধান রাখা হইয়াছে এইগুলি হইতেছে,

নাগরিকদের দশদফা মৌলিক কর্তব্য

(১) শাসনতন্ত্র মানিয়া চলা এবং ইহার আদর্শ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয়

ীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা (To abide by the Constitution ıd respect its ideals and institution, the national flag and the ıtional anthem.)

(২) আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের মহান আদর্শগুলি সযত্নে পালন রা ও অনুসরণ করা (To cherish and follow the noble ideals which spired our national struggle for freedom.)

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও সংহতিকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা এবং রক্ষা করা ; To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity : India.)

(৪) দেশকে রক্ষা করা এবং যখনই ডাকা হইবে তখন জাতীয় সেবার কাজে াত্মনিয়োগ করা , (To defend the country and render national ·rvice when called upon to do so.)

(৫) ভারতের সমস্ত জনগণের মধ্যে ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিক অথবা গোষ্ঠীগত ৎষম্য অতিক্রম করিয়া ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ করা , নারীর মর্যাদা হানিকর প্রথার ়লোপ করা , (To promote harmony and the spirit of common rotherhood among all the people of India transcending religious, ıguistic and regional or sectional diversities , to renounce ractices derogatory to the dignity of women)

(৬) জাতির মিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে মূল্য প্রদান করা ও ইহা সংরক্ষণ করা ; To value and preserve the rich heritage of our composite culture.)

(৭) বন, হ্রদ, নদী, বন্যজীবন প্রভৃতি সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি ও ংরক্ষণ করা, এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ বজায় রাখা ; (To protect ınd improve the natural environment including forests, lakes, ·ivers, wild life, and to have compassion for living creatures.)

(৮) বৈজ্ঞানিক মানবিকতা, মানবিকতাবোধ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের ানোভাব জাগাইয়া তোলা , (To develop the scientific temper, humanism ınd the spirit of inquiry and reform.)

(৯) জনসম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসার পথ পরিহার করা ; (To safeguard ›ublic property and to abjure violence.)

(১০) ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সমস্ত কার্যকলাপে উৎকর্ষের জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাওয়া

যাহাতে জাতি আরও উন্নত ধরণের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের পথে অবিরত অগ্রসর হই পারে ; (To strive towards excellence in all spheres of individu and collective activity, so that the nation constantly rises higher levels of endeavour and achievement.)

শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি কাজে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করি বাধ্য থাকিবেন। মূল শাসনতন্ত্রের ৭৪ নম্বর ধারার (ক) অনুচ্ছে [Article 74, Clause (1)] বলা হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিে

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন

নূতন সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে, "There shall be a council Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advi the President who shall, in the exercise of his functions, a in accordance with such advice"—নূতন সংশোধনী বিলের এই ধার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাই সরকা শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিয়া থাকে এবং যদিও রাষ্ট্রপতি সেক্ষে নামেমাত্র রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে কাজ করেন, তবুও ভারতের মূল শাসনতন্ত্রে এ ব স্পষ্টভাবে লিখিত নাই যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশ সর্বদা গ্রহণ করি বাধ্য। রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন কিনা সম্পর্কেও ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ও আইনজীবীদের ম বিতর্কের অবকাশ ছিল। তবে ইহাও ঠিক, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী (যে হইতে আমাদের শাসনতন্ত্র বার্যকর হয়) হইতে এখন পর্যন্ত কখনই রাষ্ট্রপতি প্রধানম বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নাই ; অথবা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত দেখা দেয় নাই। তবুও নূ সংশোধনী বিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সব কাজেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃ গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাহায্য ও উপদেশ অনুযায়ী চলি বাধ্য থাকিবেন। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা হইতে এই সিদ্ধ গ্রহণ করা যায় যে ভারতে রাষ্ট্রপতি কোন অবস্থায়ই একনায়কের ভূমিকা গ্র করিতে পারিবেন না। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানম সাহায্য ও উপদেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইতে পারিবেন না

শাসনতন্ত্রের নূতন সংশোধনী বিলে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগু

আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসর হইতে বাড়াইয়া ছয় বৎসর করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়িবে। পার্লামেন্টের কোন সভার সদস্য যদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুযায়ী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন তবে তিনি কতদিনের জন্য পার্লামেন্টের কোন সভার সদস্য হইবার যোগ্যতা হারাইবেন তাহা রাষ্ট্রপতি স্থির করিবেন। তবে এই ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) সঙ্গে পরামর্শ করিবেন, এবং নির্বাচন কমিশনও এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবেন।

রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যে জরুরী আইন প্রণয়ন করিবেন তাহা উপযুক্ত আইনসভা বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিবর্তিত বা পরিবর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

মূল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার প্রয়োজন হইলে সমগ্র দেশেই তাহা ঘোষণা করিতে হয়। আংশিকভাবে দেশের কোন অঞ্চলে বা অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা চলে না। কিন্তু সংশোধনী বিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনবোধে দেশের যে কোন অঞ্চলে আংশিকভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সংশোধনী বিলের নূতন একটি ধারায় বলা হইয়াছে, দেশের যে কোনো রাজ্যে আইন-শৃংখলার গুরুতর অবনতি ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যে কোনো ধরণের সশস্ত্র বাহিনী সেই রাজ্যে পাঠাইতে পারিবেন। এই সশস্ত্র বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কাজ করিবে, তাহাদের উপর রাজ্য সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। বর্তমান অবস্থায় পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে যে কোন রাজ্যে প্রাথমিকভাবে ছয় মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিবার ছয়মাস করিয়া বাড়াইয়া সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য জরুরী অবস্থা চালু রাখা যায়। নূতন সংশোধনী বিলে ছয় মাসের এই সময়কে বাড়াইয়া এক বৎসর করা হইয়াছে।

নূতন সংশোধনী বিলে আইন সভার ক্ষমতা বাড়ান হইয়াছে এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে খর্ব করা হইয়াছে। অবশ্য সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকাই স্বাভাবিক। ৪৪তম সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে ভারতীয় জনগণের স্বার্থে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনকে কোন

আদালত সমালোচনা বা চ্যালেঞ্জ করিতে পারিবে না। সাতজন বিচারক দ্বারা গঠিত কনষ্টিটিউশন বেঞ্চের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো কেন্দ্রীয় বা রাজ্যগত আইনকে অসাংবিধানিক (Uncostitutional) বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না। কোনো হাইকোর্ট যদি রাজ্যের কোন আইনকে অচল বলিয়া ঘোষণা করিতে চায় তবে অন্ততঃ পাঁচজন বিচারককে লইয়া গঠিত কনষ্টিটিউশন বেঞ্চের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্বারাই তাহা করা যাইবে।

সরকারী কর্মচারিদের চাকুরিগত বিরোধকে মীমাংসা করিবেন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুন্যাল, এইসব বিরোধ আর আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত থাকিবে না। কর, আমদানি ও রপ্তানি, শ্রম, ভূমি সংস্কার, শহর সম্পত্তির সীমা নির্বাচন এবং সরবরাহ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসাও এখন হইতে ট্রাইবুন্যালের হাতে থাকিবে।

আদালতগুলি দেশের আইন ব্যবস্থার যে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা করিবে তাহাতেও পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বকে তুলিয়া ধরিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। যদি রাজ্যের হাইকোর্টগুলি কোন আইনের ব্যাখ্যা লইয়া একমত না হয় অথবা অ্যাটর্নী জেনারেল যদি কোন কেন্দ্রীয় আইন অথবা কোন রাজ্য আইনের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে চাহেন তবে তিনি সুপ্রীম্ কোর্টের মতামত জানিতে চাহিতে পারিবেন। হাইকোর্টগুলিও আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্ক প্রশ্নগুলির নিজে মীমাংসা না করিয়া সুপ্রীম কোর্টের নিকট সেগুলি পাঠাইতে পারিবে। তবে ৪৪তম সংশোধনী বিল যে আইন কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার প্রণয়ন করিবেন তাহা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। জেলা জজ এবং উপর আদালতের জজদের নিয়োগের জন্য একটি সর্বভারতীয় বিচার কৃত্যক (All India Judicial Service) প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব ও এই সংশোধনী বিলে রাখা হইয়াছে।

গণপরিষদ (Constituent Assembly) কর্তৃক শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর গত ২৫ বৎসরে আমাদের শাসনতন্ত্র ৪০ বার সংশোধিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া আরও চারিটি সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত রূপ পাইবার অপেক্ষায় আছে। ইহার ফলে মূল শাসনতন্ত্রে যেখানে ৩৯৫টি ধারা এবং আটটি তপশীল ছিল সেখানে বর্তমানে ৩৯৪টি ধারা এবং নয়টি তপশীল আছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ২৩টি নতুন অনুচ্ছেদ শাসনতন্ত্রে যুক্ত করা হইয়াছে এবং অপরদিকে ২৪ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হইয়াছে। মোট ১০১টি ধারার কম-বেশী পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের শাসনতন্ত্রটি খুব অনমনীয় নয়। অবশ্য ইহা যে খুব নমনীয় তাহাও নহে।

শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলটি যখন লোকসভায় উত্থাপিত হয়, তখন পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুলেন যে শাসনতন্ত্রের এইরূপ ব্যাপক সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী শ্রী এইচ আর গোখলে বলেন, শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি ধারা সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট একবার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো সংশোধন করিতে পারে গণপরিষদ, সংসদ নহে। কিন্তু আইনমন্ত্রীর মতে শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামোর উপর ৪৪তম সংশোধনী বিল আঘাত করে নাই। তাহা ছাড়া শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বলিতে সুপ্রীম কোর্ট কী বুঝাইয়াছেন তাহাও স্পষ্ট নহে।

Exercise

১। ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

[Discuss the different methods of amending the Indian Constitution.]

২। শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল অনুযায়ী ভারতের শাসনব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হইবে তাহা বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the charges that will take place in the Indian constitutional system consequent up on the 44th Constitution (Amendment) Bill]

পরিশিষ্ট—৩*

রাজ্যের শাসনবিভাগ (Executive in a State)

ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যপাল (Governor of an Indian State) **:** যে কোন ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত, রাজ্যপালকেও সেই যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয় এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। রাজ্যপালের কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইলেও রাষ্ট্রপতি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিন রাজ্যপালকে স্বীয় পদে বহাল রাখিতে পারেন অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজ্যপাল নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী হন না অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ফৌজদারী মামলার পরোয়ানা বাহির করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণকে নিযুক্ত করেন না ; তাঁহারা নির্বাচিত হন। কিন্তু ভারতে রাজ্যপালগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই বিধান আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র-প্রবণতা নির্দেশ করে।

রাজ্যপালের মর্যাদা, ক্ষমতা ও কাজ (Position, Powers and Functions of a Governor) **:** রাজ্যপাল কোন রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধান। রাষ্ট্রপতি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন সেই প্রকার রাজ্যপালও রাজ্যসরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হন। অবশ্য রাজ্যপালের কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) আছে। সেইগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে উপজাতি অঞ্চল সংক্রান্ত শাসন পরিচালনা প্রধান। তাহা ছাড়া, যদি রাজ্য বিধানমণ্ডলে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে এবং বিভিন্ন দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন উঠে সেইক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

---

* সিলেবাসে রাজ্যের শাসন-বিভাগের কাঠামো অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং বইটির ২৪৩ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু রাজ্যের শাসনবিভাগের ক্রিয়া-কলাপের বিস্তৃত বিবরণ, বিশেষতঃ, রাজ্যপাল ও রাজ্য মন্ত্রিসভার ভূমিকা আলোচনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ সিলেবাসে নাই। সেজন্য এইগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। যদি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যে বিধানসভা ভাঙিয়া না দিয়া নিজের শাসন চালু করেন তবে রাজ্যপালকে সেইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে হয় এবং তখন তিনি কিছু পরিমাণে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান। যখন রাজ্যপাল মনে করেন যে বিধান সভায় কোন দল অথবা কতিপয় দলের একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে, তখন রাজ্যপাল সেই রাজ্যে যাহাতে একটি স্থায়ী সরকার গঠিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলিয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। এই অবস্থায় কে মুখ্যমন্ত্রী হইবেন, তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যে যথেষ্ট স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল কর্তৃক যথাক্রমে শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই এবং শ্রীচরণ সিং-কে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আমন্ত্রণের মাধ্যমে।

এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার (executive powers) মধ্যে প্রথম হইল, তিনি রাজ্যবিধানমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। তাহা ছাড়া, তিনি রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General), রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য সিভিল সার্ভিসের সরকারী কর্মচারীগণকে নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা

রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলের একটি অঙ্গ; তিনি ইহার সদস্য নহেন। রাজ্যপাল তাঁহার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার (legislative power) বলে রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া যে সকল রাজ্যে রাজ্যবিধানমণ্ডলের উচ্চকক্ষ আছে, সেগুলিতে তিনি কয়েকজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। সেই সদস্যগণকে অবশ্যই বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা হইতে হইবে। এই সদস্য মনোনয়নে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হন। ১৯৫৭ সালে বিহারের রাজ্যপাল ২ দিনের জন্য নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসতীশপ্রসাদ সিংহের পরামর্শে শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলকে বিধান পরিষদে মনোনীত করেন যদিও শ্রীমণ্ডল বিজ্ঞান,

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সাহিত্য, সমাজ সেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির যে কোন একটির ক্ষেত্রে এমন কিছুই কৃতিত্ব দেখান নাই যাহাতে তাঁহাকে বিধান পরিষদে মনোনীত করিলে শাসনতন্ত্রের এই বিধানের সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য শ্রীমণ্ডলকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরূপে বরণ করিবার জন্যই এইভাবে বিধানপরিষদের সদস্যরূপে তাঁহাকে মনোনীত করা হয়। দেখা যাইতেছে, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল এমন কাজও করিতে বাধ্য হইতে পারেন যাহা জনসাধারণের পছন্দ না-ও হইতে পারে।

রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক কোন বিল অনুমোদিত হইয়া রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে রাজ্যপাল উহাতে নিজের সম্মতি প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অবশ্য রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলেই রাজ্য বিধান-মণ্ডলের অনুমোদিত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে। রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতীত রাজ্যবিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। পরে বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাহা বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। শাসনতন্ত্রের ৩৮-তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আওতার বাইরে রাখা হইয়াছে। রাজ্যপালের আর্থিক ক্ষমতা (financial powers) অনুযায়ী তিনি সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বাজেটের আকারে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়া বিধানসভায় উত্থাপিত করিতে পারেন। যে কোন প্রকার অর্থ-সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত বিধানসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি বিধানমণ্ডলের উভয়কক্ষের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তবে রাজ্যপাল উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

আর্থিক ক্ষমতা

রাজ্যপালের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সহিত জড়িত। যুগ্মতালিকাভুক্ত (concurrent list) বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাজ্যপালের যে ক্ষমতা তাহার সহিত যদি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পার্থক্য হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতিই গৃহীত হইবে এবং রাজ্য সরকারের নীতি বাতিল হইয়া যাইবে।

যদি আদালতের বিচারে দোষী কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন মামলায় হারিয়া যায়, যাহার উপর রাজ্যের শাসন বিভাগ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে, তবে রাজ্যপাল সেইক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া দিতে পারেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য—দেখা যাইতেছে, রাজ্যের প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তবে সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা না গেলে তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তবে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা চলে না। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ না লইয়াও যে রাজ্যপাল কাজ করেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের আপত্তি সত্ত্বেও রাজ্যপাল কেরালা বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৭) বিধানসভার অধিবেশন ডাকিতে রাজী না হইয়া রাজ্যপাল আরও তাড়াতাড়ি বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ জানান এবং মন্ত্রিসভা ইহাতে রাজী না হওয়ায় রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং পদত্যাগ করার সময় রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য। কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া না দিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার জন্য সুপারিশ করেন এবং রাষ্ট্রপতিও সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দেখা যাইতেছে, রাজ্যপাল যে সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চালিত হন তাহা নহে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপালের কার্যকাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর।

রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভা (Council of Ministers of the State): শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যবিধানমণ্ডলে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণকে রাজ্যবিধানমণ্ডলে যে কোন কক্ষের সভ্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রী হইবার পর ছয়মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী বিধানমণ্ডলের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত না থাকেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী পদত্যাগ করেন, কারণ, মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যে তিনি বিধান সভার সদস্য হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ উঠিয়া যাইবার পর উহার সদস্য দুইজন মন্ত্রী (শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী ও

শ্রীআব্দুল রসুল) ছয় মাসের মধ্যে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারায় পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজ্য-মন্ত্রিসভায়ও আমরা ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী দেখিতে পাই, যদিও শাসনতন্ত্রে শুধু মন্ত্রিসভার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রিগণ সমষ্টিগতভাবে রাজ্যবিধানসভার নিকট দায়ী। যদি বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রস্তাব অনুমোদন করেন অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্যগণের নিকট সরকারের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সমুদয় প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ঃ (Relation between the Governor and the Council of Ministers) **ঃ** রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন বজায় রাখেন অথবা উহা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সর্বদাই যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে ; যদি মন্ত্রিসভা কখনও পদত্যাগ করে তখন বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করার দায়িত্ব রাজ্যপালের হাতে আসে। বিশেষতঃ, যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলে কোনও রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে, তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) প্রয়োগ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনকালেও রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, এমন কি বিধানমণ্ডলে রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেন তাহাও মুখ্যমন্ত্রীই তৈয়ারী করিয়া দেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তুত ভাষণের কিয়দংশ বাদ দিয়া তাহা বিধানসভায় পাঠ করেন। এজন্য বিধানসভায় রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবে সেই সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন বলিয়া শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সমুদয় ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন।

রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন ? (Can The Governor dismiss the Council of Ministers) **ঃ** রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে

বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা তাহা লইয়া সমগ্র ভারতে ১৯৫৭ সালে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করিবার পর এই বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে "The Council of Ministers shall hold their office under the *pleasure* of the Governor।" কিন্তু এই ধারায় এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে, রাজ্যপাল নিজের ইচ্ছায় যখন খুশী তখন তাঁহার অভিরুচি প্রত্যাহার করিয়া মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বরং সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যের মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত বিধানসভায় মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিবে ততক্ষণই ইহা নিরাপদে সমাসীন থাকিতে পারে। মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার পিছনে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর কারণ দেখাইয়াছিলেন যে ২৮৪ জন সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য ছিল ১৩০ জন এবং আরও ১৭ জন যুক্তফ্রণ্ট হইতে দলত্যাগ করায় এবং লিখিতভাবে রাজ্যপালের নিকট তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় রাজ্যপাল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে,—সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রিসভাকে একদিনের জন্যও বজায় রাখা উচিত নহে। সেইজন্য তিনি সংবিধানের ১৬৩ (১) ধারা অনুযায়ী এক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য এমন একজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন যিনি রাজ্যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্থিতিশীল মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যপাল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং এই অনুরোধ জানান হইয়াছিল ১৯৫৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে। এই অনুরোধ অনুযায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৫৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভায় অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু রাজ্যপালের ঐ তারিখ মনঃপূত না হওয়ায় (কারণ তাঁহার মতে বিধানসভার অধিবেশন অনেক দেরীতে ডাকা হইয়াছিল) এবং তিনি এই মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘিষ্ঠতা সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত হওয়ায় সংবিধানের ১৬৪ (১) নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। এখানে স্বভাবতঃই কতিপয় সাংবিধানিক প্রশ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। যথা, (১) যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা

রাজ্যপালের কাজের পক্ষে যুক্তি

রাজ্যপালের কাজ সম্পর্কে সাংবিধানিক প্রশ্ন

স্বপদে বহাল আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিনা। (২) মন্ত্রিসভা যদি রাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট দিন হইতে আরও আগে ধার্য না করিতে চাহেন তবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৩) বিধানসভার অধিবেশনে মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইয়াছে তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা, (৪) বিধানসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপালের এমন কোন ধারণা করা উচিত কিনা যে মন্ত্রিসভ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভ বজায় রাখিবার অভিরুচি (Pleasure) প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত কিনা।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্টের এবং এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের মতামত অথবা উপদেশ চাওয়া হইলে সেই মতামত ব উপদেশ সর্বজনগ্রাহ্য এবং চূড়ান্ত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবিধানের ধারা সংক্রান্ত বিতর্কের সৃষ্টি হইবার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে উপদেশ চাওয়া হয় নাই।

সাংবিধানিক অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তদানীন্তন স্পীকার মনে করে যে মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন থাকিবেন কি থাকিবেন না সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহ করিবার একমাত্র এক্তিয়ার বিধানসভার। মন্ত্রিসভা যদি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থ হারান তবে সংবিধানের ১৬৪ (২) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য থাকেন স্পীকার তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভা

মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি সম্পর্কে স্পীকারের রুলিং

স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলীর নিম্নলিখিত মন্তব্যটির উল্লে করেন। "মন্ত্রিসভা আইনসভার সৃষ্টি। এই সভা (আইনসভা মন্ত্রিসভা তৈয়ার করিতে পারেন, ভাঙ্গিতেও পারেন। গভর্ণর শু সভার "Registering authority" ; আমার আশঙ্কা অন্য কোন পথ গ্রহণ করিতে তাহা গণতন্ত্রের মূলে আঘাত হানিবে।" স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "সংবিধানের ধারা এবং পূর্বোক্ত নজির উভয়েই মন্ত্রিসভা নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালে বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত হইতেছে না।" স্পীকার বলেন, "সংবিধানের ১৬৪ (১ ধারা সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা খারিজের এইরূপ কো ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলিয়া প্রকটিত হয় না।" সুতরাং রাজ্যপাল কর্তৃক সংবিধানে ১৬৪ (১) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার কোন আইনসম্মত ভিত্তি স্পীকার খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য স্পীকার মনে করিয়াছিলেন, বিধানসভা

এই অধিবেশন রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অজ্ঞাতসারে গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী আহূত হইয়াছিল বলিয়া বে-আইনী ও সংবিধান বিরোধী। স্পীকার বিধানসভার অধিবেশনের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত রুলিং প্রদান করিবার আগে ইহার বৈধতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় উক্ত আপাত রুলিং প্রদান করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। স্পীকার ইহাও বলেন যে সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। অবশ্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের চেয়ারম্যান রুলিং প্রদান করেন যে রাজ্যপাল সংবিধানবিরোধী কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল স্পীকারের রুলিংকে কেন্দ্র করিয়া। স্পীকারের এই রুলিং সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য করা হইয়াছিল। কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার তাঁহার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ভারত সরকারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, এই মহলের মতে রাজ্যপালের কোন কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা স্পীকারের এক্তিয়ারের মধ্যে নহে। স্পীকার শুধু বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিজের ক্ষমতা সীমিত রাখিবেন। কিন্তু কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার ঠিক কাজই করিয়াছিলেন এবং বিধানসভার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই জাতীয় যে কোন কাজ (তাহা যে কোন লোকেরই হোক না কেন) সম্পর্কে রুলিং প্রদান করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্পীকার সংবিধান হইতে পাইয়াছেন।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে নিজের 'অভিরুচি' অনুযায়ী পদচ্যুত করিয়া সংবিধান-বহির্ভূত কাজ করেন নাই, এই মর্মে কলিকাতা হাইকোর্ট একটি রায়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীপূরণলাল লক্ষণ পাল এবং শ্রীমহাবীর প্রসাদ শর্মার তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী ডঃ পি. সি. ঘোষ এবং আরও দশজন মন্ত্রী নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া "কুয়ো ওয়ারেনটো" (Quo Warranto) ধরনের হুকুমনামা জারির জন্য দুইটি আবেদন পেশ করা হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি

রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়—রাজ্যপালের "অভিরুচি"র কোন শর্ত নাই

শ্রী বি. সি মিত্র এই আবেদন নাকচ করিয়া বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপিত হয় নাই। রাজ্যপালের "অভিরুচি" (pleasure) সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ। এই আবেদন সম্পর্কে বিচারপতি বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী

নিয়োগ ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ এবং অভিরুচি (pleasure) প্রত্যাহার করিয়া লইয়া মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র রাজ্যপালকেই দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যপালের এই "অভিরুচি" প্রত্যাহারের ক্ষমতাও নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ। এক মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সংবিধানসম্মত কাজ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া আদালতে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নাই বলিয়া বিচারপতি অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের এই রায় অনেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের এই রায় পশ্চিমবঙ্গের স্পীকারকে তাঁহার রুলিং পরিবর্তনে বাধ্য করে নাই। ১৯৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আহূত হইলে স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৫৭ সালের ২৯শে নভেম্বর বিধাসসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অগোচরে রাজ্যমন্ত্রিসভাকে বাতিল করা সংবিধানবিরোধী হইয়াছে বলিয়া তিনি যে আপাত রুলিং দিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্তন করার কোন কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সুতরাং ১৯৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও তিনি তাঁহার পূর্বেকার আপাত রুলিং-ই বহাল রাখিয়াছিলেন।

স্পীকারের পরবর্তী রুলিং

আমাদের শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হইতেছেন সুপ্রীম কোর্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না দিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সংবিধানের বিধান সম্পর্কে কোন বিতর্কেরই চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে না।

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers of the Governor) ঃ রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু, ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীনভাবে কার্য সম্পাদনের কিছু ক্ষমতা (to act in his discretion) দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানে ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। একথাও উক্ত ধারায় বলা আছে যে, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলির নির্বাচনে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম এবং চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহার বৈধতা লইয়া কোনরূপ প্রশ্ন করা চলিবে না।

স্পষ্টরূপে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমূহের কথা সংবিধানে কয়েকটি ক্ষেত্রেই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের "খ" বিভাগে বর্ণিত উপজাতি এলাকার শাসন পরিচালনার ব্যাপারে আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি

(Agent) হিসাবে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারা অনুসারে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে প্রদান করিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় (discretion) উক্ত ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনকার্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াই পরিচালনা করিতে পারেন।

উপরের আলোচনা হইতে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। রাজ্যপালের পরিপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির নিকট। ইহা ছাড়া, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নির্ধারণ ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে একথা স্পষ্ট হইবে যে, সংবিধানে বর্ণিত না থাকিলেও রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত আরও কিছু ক্ষেত্রে আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমত, সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে চলিতেছে না বলিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যাইতে পারে। সুতরাং মন্ত্রিসভার বিপক্ষে দেওয়া রিপোর্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক সমর্থিত হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের ১৬৪(১) নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা কতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে তারা রাজ্যপালের "অভিরুচির"র (pleasure) উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীপূরণলাল লক্ষণ পাল এবং শ্রীমহাবীর প্রসাদ শর্মার তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক ডঃ পি. সি. ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা (২১শে নভেম্বর, ১৯৫৭) বৈধ হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে *Quo Warrranto* ধরনের যে আবেদন করা হয়, সেই সম্পর্কে রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি শ্রী বি. সি মিত্র ১৯৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপিত হয় নাই। (এখানে উল্লেখযোগ্য, এই ক্ষমতাবলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৯৫৭ সালের ২১শে নভেম্বর তৎকালীন ক্ষমতায় আসীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন; কারণ রাজ্যপালের ধারণা হইয়াছিল যে বিধানসভা না চলিতে থাকিলেও মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছিলেন।) রাজ্যপালের "অভিরুচি" (pleasure) সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই রুলিং দেন যে বিধানসভার

কোন মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সম্পর্কে "অভিরুচি" প্রত্যাহার করা সংবিধানবিরোধী। অবশ্য এই বিতর্কের এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তবে আইনসভায় একের অধিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেই এইরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিচালনা প্রকট হয়। একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে রাজ্যপালের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না।

ইহা ছাড়া, রাজ্যের কোন বিল রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও তাহা আইনে পরিণত হইবার পূর্বে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান না-ও করিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ২০০ নং ধারা অনুযায়ী এই বিষয় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য বিলটি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার (discretionary power) প্রয়োগ করিতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদ একদলীয় না হইলেও সাধারণতঃ রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক হয়। কেননা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির অভিরুচির উপর নির্ভরশীল রাজ্যপালের নিজের পদের স্থায়িত্ব কখনই বজায় থাকে না যদি না রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শানুযায়ী গৃহীত বা পরিচালিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির উক্ত ইচ্ছার সহিত একমত নাও হইতে পারেন। সেজন্য রাজ্যপাল এইসব ক্ষেত্রে নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, রাজ্যপাল অংশতঃ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির 'এজেন্ট' বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে হয়। যদি বিধানসভা ভাঙিয়া না দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়, তবে রাজ্যপালকে স্থির করিতে হয় কখন পুনরায় একটি মন্ত্রিসভাকে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে কোন দলের পক্ষে অথবা একাধিক দলের পক্ষে সম্মিলিত ভাবে রাজ্যে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসন তুলিয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠাইতে পারেন। তখন কাহাকে মুখ্যমন্ত্রী হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন

ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বিহার এবং উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল যথাক্রমে শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই এবং শ্রীচরণ সিং-কে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তাহাতেই রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ প্রতিভাত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক হইলেও রাজ্যপালকে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু অনেকে মনে করেন, রাজ্যপালের দায়িত্ব হইতেছে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করা এবং সেজন্য সকলের অভিযোগ শুনিয়া সব কিছু লক্ষ্য করা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া।

রাজ্যপাল পদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে. রাজ্যপাল পূর্বের ন্যায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উপর অধিক দৃষ্টি রাখেন না এবং শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রপতির মর্যাদার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন। রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা এবং সেই অনুসারে তাঁহার রিপোর্ট তৈয়ারী করার দিকে তাঁহাকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। রাষ্ট্রপতির কোনরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা না থাকায় তাঁহার পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ সৃষ্টি না করিয়া উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। এই দিক হইতে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল পদের প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। রাজ্যপাল এই দিক হইতে কিছুটা মন্ত্রিসভার শাসনমুক্ত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শানুক্রমে রাজ্যপালকে রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী প্রধান করিয়া তুলিতে পারেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা অপেক্ষাও রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্কের জন্য রাজ্যপালকে বিশেষভাবে যত্নবান হইতে হয়। তবে যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও রাজ্য মন্ত্রিসভা একই দলভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে কোনরূপ গোলযোগ হওয়ারই সুযোগ ঘটে না, কেননা রাজ্য বিধানমণ্ডলের নিকট দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শানুক্রমে কার্যতঃ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রধানমন্ত্রী একই দলভুক্ত বলিয়া নীতির দিক হইতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা দেয় যাহার ফলে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে রাজ্যপালের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সব সময়ই অবহিত থাকিতে পারেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister of a State): কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেমন মন্ত্রিপরিষদের প্রধান, রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রকার রাজ্যসরকারের মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। রাজ্যের বিধানসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাই মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী

ন্যান্য মন্ত্রিদের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে হইলে সেই পদের প্রার্থীকে বিধানমণ্ডলের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে হইবে; তবে রাজ্যপাল যদি বিধানমণ্ডলের সদস্য নহেন এইরূপ োন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজপদে অধিষ্ঠিত হইবার র ছয় মাসের মধ্যে বিধানমণ্ডলের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইবে।

মন্ত্রীর নিয়োগ

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রিদের মধ্যে কোন ব্যাপারে তভেদ হইলে নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি সেই মতভেদ দূর করেন, অথবা যদি ন্ত্রিদের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটা- ট হয়, তবে তিনি নিজের নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিতে ারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের শাসনবিভাগের সব কাজ পরিচালনা রেন। রাজ্যপালের হস্তে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে সেইগুলি রাজ্যপাল খ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যকর করেন। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary owers) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন, এই প্রকার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। শাসনতন্ত্রের ২০০ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যে ধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে রাজ্যপাল নিজে সম্মতি না দিয়া তাহা াষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালা ধানসভা শিক্ষাবিল অনুমোদন করিলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ রাজ্যপালকে ক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজ্যপাল সেই বিলে ম্মতি প্রদান না করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা প্রেরণ রেন। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট ন্ত্রিসভা ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ েম। কিন্তু রাজ্যপাল সেই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যা- রিষ্ঠতা হারাইয়াছে এই ধারণার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। অনুরূপ ারেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে। ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের াষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ িং রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য রামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন,

জ্যপালের সহিত মন্ত্রীর সম্পর্ক

২। রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক লইয়া মন্তব্য কর।

[Comment on the relation between the Governor and the Council of Minist

৩। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আলোচনা কর।

[Discuss the discretionary powers of the Governor]

৪। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা এবং ক্ষমতা আলোচনা কর।

[Discuss the position and powers of the state Chief Minister.]